ভূমিকা

গান্ধীজীর মতবাদের সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে লেখা প্রবন্ধগুলি সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে। স্বতন্ত্র পত্রিকায় এবং বিভিন্ন কালে প্রকাশিত বলিয়া কোথাও কোথাও পুনরুক্তি-দোষ ঘটিয়াছে এবং ক্ষেত্রবিশেষে দৃষ্টিভঙ্গিরও সামঞ্জস্যহানি দেখা দিয়াছে। সকলের চেয়ে পুরানো এবং সকলের চেয়ে নূতন প্রবন্ধের মধ্যে বয়সের ব্যবধান প্রায় সতর বৎসর। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে লেখকের চিন্তা এবং অভিজ্ঞতার মধ্যে যথেষ্ট পরিণতি হওয়া স্বাভাবিক। সেইজন্য একত্র পড়িবার সময়ে পাঠকের পক্ষে নানাবিধ অসুবিধা, এমন কি অসন্তোষ পর্যন্ত ঘটা বিচিত্র নয়। তবু আশা করি তাঁহারা সহৃদয়তার সহিত এই সকল ত্রুটি মার্জনা করিয়া প্রবন্ধগুলি পাঠ করিবেন। মহাত্মা গান্ধীর মত এবং পথ সম্বন্ধে তাঁহারা যদি কিছু নূতন তথ্য সংগ্রহ করিতে পারেন তাহা হইলেই আমি কৃতার্থ বোধ করিব।

৩৭, বোসপাড়া লেন
কলিকাতা - ৩
১৮ই বৈশাখ, ১৩৫৩

নির্মলকুমার বসু

সূচীপত্র

সূচনা

আমরা বাঙালী জাতি বুদ্ধিকে খুব উচ্চ স্থান দিই। যাহা তর্কের দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা যায় না তাহার দ্বারা আমরা কখনও বিচলিত হই না। রাশিয়ার কম্যুনিজম হউক, ভারতবর্ষের গান্ধীবাদ হউক, যাহা কিছু চোখে লাগে তাহাকেই আমরা বুদ্ধির দ্বারা যাচাই করিয়া লইতে চাই। কিন্তু শত্রুপক্ষ বলিয়া থাকেন যে বুদ্ধির দ্বারা কোন জিনিষকে যাচাই করিয়া লইতে হইলেও সে বুদ্ধির সম্বন্ধে কতকগুলি লক্ষণ দেখা দরকার। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে যখন আমরা কোনও পদার্থকে মাপি তখন সে যন্ত্রটি ঠিক মাপ দিতেছে কিনা তাহা জানা দরকার। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে ভাল বুদ্ধির একটি লক্ষণ হইল তাহা শান্ত, এবং যিনি মাপিতেছেন তাঁহার ব্যক্তিগত মতামতের দ্বারা রঞ্জিত নহে। অতএব কোন বিষয়কে বিচার করিতে হইলে যদি আমরা বিচলিত হইয়া পড়ি অথবা যে মত আমাদের পছন্দ নহে তাহাকে বিচার করিতে গিয়া অবিরত ব্যক্তিগত সংস্কারের প্রভাবে বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ হই তাহা হইলে সে বিষয়টির যথার্থ বিচার আমাদের দ্বারা হইয়া উঠিবে না। অবশ্য যদি বিচার করিয়া কোনও বিষয়কে আমরা ভ্রান্ত বা অনিষ্টকর বলিয়া মনে করি তখন তাহা ভাঙিবার বেলায় আমরা উত্তেজিত হইতে পারি কিন্তু ভাঙার কাজ ও বিচার করিয়া বুঝিবার কাজ একসঙ্গে সম্ভব নহে, দুটিকে পৃথকভাবে করিতে হয়

আমাদের মনে হয় যে গান্ধীবাদের সম্বন্ধে বিচার করিতে গিয়া অনেক সময়ে আমাদের বুদ্ধি অবৈজ্ঞানিকের মত অতিমাত্রায় রঞ্জিত হইয়া উঠে, সেইজন্য প্রথমতঃ আমরা গান্ধীজীর কাজকে টুকরা টুকরা

করিয়া বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করি এবং দ্বিতীয়ত কাজের বিচারের সময়েও তাঁহার মতামত সম্পূর্ণভাবে দেখিয়া লই না। কথায় বলে, মা দুর্গার দশভুজা মূর্তিকে দেখিতে হইলে পিছনে চালচিত্রটিকে রাখিতেই হইবে। যদি তা' না করিয়া দশ হাতশুদ্ধ একটি মানুষকে মাঠের মাঝখানে বা হাটের মধ্যে অন্য দশজন মানুষের সঙ্গে রাখিয়া দেখি, চালচিত্রটির কথা ভুলিয়া যাই, তবে দেবী আর দেবী থাকেন না, একটি কিম্ভূত কিমাকার জীবে পরিণত হন। লেনিন মুখে বলিতেন জমির উপর কাহারও খাস স্বত্ব স্বীকার করা হইবে না, অথচ রাশিয়াকে উপস্থিতের জন্য তাহা স্বীকার করিতে হইয়াছে, তিনি সকলের পক্ষে সমান আয়ে বিশ্বাস করিতেন, অথচ লোকবিশেষে আয়ের পার্থক্য বর্তমান রাশিয়ায় করিতে হইয়াছে—এইটুকু মাত্র দেখিয়াই যদি আমরা বলি লেনিন যাহা বলেন তাহা করেন না তাহা হইলে এমন বাতুলকে সকলেই বলিবে, "দয়া করিয়া লেনিনের সবটা একসঙ্গে বুঝিবার চেষ্টা কর, কোথাও অসঙ্গতি পাইবে না। আর যদি তাহা না পার, তবে লেনিনের নাম মুখে আনিও না।" গান্ধীজীর সম্পর্কেও এমনি একটি কথা সময়ে সময়ে আমাদের মনে হইয়াছে, এব' তাই যথাসাধ্য আমাদের বুদ্ধিকে শুদ্ধ করিয়া অর্থাৎ ব্যক্তিগত সংস্কার হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহার লেখা বুঝিতে চেষ্টা করা দরকার। গান্ধীজীর সকল মত সকল লেখা যে ভাল লাগে তাহা শপথ করিয়া বলা চলে না, কিন্তু মোটের উপর গান্ধীজীর মতামত আমাদের খুব আকৃষ্ট করে। গান্ধীজীর কোন কোন কার্যের অর্থ আমরা বুঝি না, ধনিক সম্প্রদায় অথবা ইংরেজের সদ্বুদ্ধির উপর আস্থা স্থাপন করা সব সময়ে হয়ত আমাদের ভাল লাগে না, তবু ধীরভাবে বিচার করিলে মনে হয়, যদি তাঁহার অহিংস আন্দোলন কার্যকরী হইবে বলিয়া মনে হয় তবে এই টুকরা

কাজটিকে অসঙ্গত বলা চলে না। অতএব শেষ তর্ক আসিয়া পড়ে অহিংসা-নীতির মূল সার্থকতার উপর। তাহা পরে বিচার করা যাইতে পারে। গান্ধীজী যেমন বলিয়াছেন, যেমন বুঝিয়াছেন তাহাই লিখিবার চেষ্টা করিব। গান্ধীজীর মত মানিয়া লই বা না লই, স্বতন্ত্র কথা কিন্তু ইহার দ্বারা অন্তত সত্যের মর্যাদা রক্ষা হইবে, এবং হয়ত তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের দু' একটি ভ্রান্ত ধারণা দূর হইতেও পারে।

ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর দান

কর্মীর মনোভাব

কেহ যদি রাগিয়া উঠে, তবে রাগের মাথায় কিছু করিয়া বসা তাহার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু একজন লোককে যদি আমরা মুখে রাগ করিতে দেখি অথচ কাজের বেলায় তিনি যদি নিতান্ত চুপচাপ থাকেন, তাহা হইলে স্বভাবত আমাদের মনে হয় যে, ইহার রাগ হয় মিথ্যা, নয়ত' ইহার কর্মশক্তি কিছু নাই। আমার জনৈক বন্ধুর সহিত এই কথা লইয়া সেদিন আলোচনা হইতেছিল। তিনি দুঃখ করিয়া বলিতেছিলেন যে, বাঙালী প্রতিনিয়ত খবরের কাগজে অথবা বক্তৃতামঞ্চে যে পরিমাণ বিদেশী-শাসনের দোষ উদ্গীরণ করে, যদি তাহার কর্মচেষ্টা সেই অনুপাতে থাকিত, তাহা হইলে কবে আমাদের দাসত্বের শৃঙ্খল খসিয়া পড়িত তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু মনে বচনে ও কর্মে অসঙ্গতি সহ্য করা বাঙালীর অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই জন্য কর্মে কিছু না করিয়াও বাঙালী ইংরেজকে মনে মনে, এবং ততোধিক বচনে, দোষ দিয়া স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে। হয়ত সে শান্তিতে বসিয়া থাকে না সত্য, কিন্তু যে ক্ষীণ আন্দোলনটুকু সে করে তাহার মধ্যে তাহার কর্মশক্তির দুর্বলতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

এ অবস্থা শুধু বাঙালা দেশে নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটি বৈশিষ্ট্য দাঁড়াইয়াছে। দেশের রাজনৈতিক অবস্থার সম্বন্ধে পূর্বে যাঁহারা চিন্তা করিতেন, তাঁহাদের অধিকাংশের মধ্যে

যেন কেমন একটা ধারণা ছিল যে, দেশের দাবী স্পষ্ট করিয়া ভাবিতে পারিলে এবং অপর পক্ষের দোষ স্পষ্টভাবে দেখাইতে পারিলেই একটা কিছু করা হইল। সেই জন্য ইংরেজদের দোষের সম্বন্ধে পূর্বের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ দেশবাসীকে সচেতন করিয়া তুলিতেন এবং তাহার ফলে দেশময় অসন্তোষের বহ্নি অল্পে অল্পে ধূমায়িত হইতেছিল।

কিন্তু শুধু অসন্তোষের ভাবকে জাগাইলেই ত' হয় না। যদি উপযুক্ত কর্মপন্থার মধ্যে সেই শক্তিকে প্রয়োগ করা না যায়, তবে বয়লারের মধ্যে আবদ্ধ বাষ্পের মতই তাহা নিষ্ফল হইয়া যায়। বাষ্পের শক্তিকে ইঞ্জিনের সঙ্গে যুক্ত করিলে তবেই তাহার সার্থকতা আসে, নতুবা বয়লারের মধ্যে অত্যধিক চাপের সৃষ্টি হইয়া তাহা ফাটিয়া যাইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। লোকের মনে প্রচারের ফলে স্বাধীনতার স্পৃহা যেমন বাড়িতে লাগিল, তেমনি সেই শক্তিকে কর্মে প্রকাশ করিতে না পারায়, ক্রমে মানুষের মন অবসাদক্লিষ্ট হইয়া কর্মশক্তিহীন হইয়া পড়িতে লাগিল। সমস্ত দেশের মধ্যে বয়লার ফাটার মত ইতস্ততঃ সন্ত্রাসবাদের সূচনা দেখা যাইতে লাগিল। তাহাতে ক্ষতিই শুধু হইল, দেশের রথ এক পদও অগ্রসর হইতে পারে নাই। রাজনীতির ক্ষেত্রে যাঁহাদের স্থায়ী কিছু করিবার ইচ্ছা অবশিষ্ট ছিল তাঁহারা দেশে শিক্ষাবিস্তারের ও আত্মবিশ্বাসের ভাব প্রচার করিবার কাজে রত হইলেন। কিন্তু ইঁহাদের সংখ্যা বেশি ছিল না এবং চারিদিকে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়িয়া তাঁহারা লোকচক্ষুর অন্তরালে দারিদ্র্যক্লিষ্ট অবস্থায় এবং অনেকক্ষেত্রে হতাশার আচ্ছাদনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে করিতে দিনযাপন করিতেছিলেন।

কিন্তু এরূপ কর্মচেষ্টা বহুলোকের পক্ষে গ্রহণযোগ্য ছিল না। দেশের জনসাধারণের মনে অল্পে অল্পে যে ক্রোধ ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছিল

এই কর্মপ্রকাশ তাহার পক্ষে পর্যাপ্ত ছিল না। সেই জন্য দেশবাসীর মনে আত্মপ্রত্যয়ের পরিবর্তে হতাশার ভাবই কায়েমী হইয়া রহিল। এই অবস্থা হইতে মহাত্মা গান্ধী প্রথম জনসাধারণকে মুক্তি দিলেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

মহাত্মা গান্ধী হরতালের ভিতর দিয়া অসহযোগ এবং আইন-অমান্যের ব্যবস্থা করিয়া বিদেশী বর্জন ও খদ্দর প্রচারের দ্বারা সমগ্র জনগণের ভিতরে পরাধীনতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভকে কর্মের পথে একটি রূপ দিয়াছিলেন। কেহ কেহ গান্ধীজীর পক্ষে উল্লিখিত কর্মের সারবত্তা স্বীকার করেন না কিন্তু আমাদের ভাবা উচিত যে এগুলির স্থায়ী ফল দেশে আর কিছু না হইলেও এইটুকু ছিল যে, চিন্তার রাজ্যে বিক্ষোভের ব্যাপারটিকে এইরূপে অন্তত কর্মে প্রকাশ করিয়া ফেলা হইতেছিল। ভারতবাসীর ভিতরে চিন্তা ও কর্মের মধ্যে একেবারে ছাড়াছাড়ি হইয়া গিয়াছিল, তাহা পুনরায় মেরামত করিবার ব্যবস্থা এইরূপে করা হইল।

গান্ধীজী কাহাকেও শুধু মনের মধ্যে বিক্ষোভ অনুভব করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেন না। তাহাকে কোন না কোন কর্মে তাহা প্রকাশ করিয়া ফেলিবার ইঙ্গিতও সঙ্গে সঙ্গে দিয়া থাকেন। কেহ স্বাধীনতার দাবী করিলে তিনি তাহার সহিত সমস্বরে তৎক্ষণাৎ যোগদান করেন না। বরং দাবী আদায় করিবার পূর্বে আমাদের যে সকল দায়িত্ব ঘাড়ে লওয়া উচিত, তাহারই কথা বেশি করিয়া স্মরণ করিতে বলেন। এক কথায় গান্ধীজী মন, বচন ও কর্মের মধ্যে সুসঙ্গতি আনিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। অর্থাৎ তিনি শুধু ভাবুক নন, তিনি আদতে কর্মী। কর্মের মধ্যে প্রকাশিত করিতে পারিলে তবেই তিনি ভাবের সত্যতা স্বীকার করেন। অন্যথা নহে।

সেইজন্য গান্ধীজী বহুবার কংগ্রেসে স্বাধীনতার দাবীকে ঠেকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কেহ কেহ গান্ধীজীর সম্পর্কে অপবাদ দিয়াছিলেন যে, গান্ধীজী আসলে স্বাধীনতা চানই না কিন্তু যাঁহারা গান্ধীজীর ঐ সম্পর্কে লেখা পড়িয়াছেন তাঁহারা জানেন যে গান্ধীজী শুধু স্বাধীনতার দাবী করিতে নারাজ ছিলেন, তাহার কারণ, দাবী করিবার পরই দাবী আদায় করিবার জন্য কোন্ কর্মপন্থা অবলম্বন করা যায়, তাহা তিনিও দেখিতে পাইতেছিলেন না। এমন অবস্থায় নিষ্ফল স্বাধীনতার দাবী করিয়া হাস্যাস্পদ হইবার মত ইচ্ছা তাঁহার আদৌ ছিল না। কিছুদিন পূর্ব্বে কংগ্রেসের কয়েকজন সাম্যবাদী কর্ম্মী তাঁহাকে বলেন যে, ধনিক ও জমিদারগণের উচ্ছেদ সাধন করা হউক, আপনি এই মর্ম্মে স্পষ্ট উক্তি দেন না কেন? তাহার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমরা যে ইহা চাহ, কিন্তু তোমাদের হাতে কত বল আছে? জমিদারদের উপর কোনও জোর খাটাইবার মত শক্তি তোমাদের নাই, দেশের জনগণ এত শিক্ষিত ও সুসংবদ্ধ হয় নাই যে তোমাদের নির্দ্দেশমত ধনিকদের উচ্ছেদ সাধন করিবে, এমন অবস্থায় শুধু কথার কথা বলিয়া লাভ কি? সে শক্তি তোমার আছে, যতদূর তুমি পার, সেইটুকুই মুখে বল। শক্তি বাড়িলে বচনের মাত্রাও বাড়াইতে পার। নচেৎ তোমার আদর্শই বল আর ইচ্ছাই বল, তাহার কোনও মূল্য থাকে না।"

এই যে কর্মপ্রচেষ্টা, ইহা গান্ধীজীর চরিত্রে একটি বড় জিনিষ এবং রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার যাবতীয় দানের মধ্যে ইহাকে প্রথম ও শ্রেষ্ঠতম না হইলেও একটি শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া যাইতে পারে। সব চিন্তাকে যদি কর্মের মধ্যে রূপ দিতে পারি,—চিন্তার সত্যতাকে কর্মের কষ্টিপাথরে পরখ করিয়া লইতে যদি আমরা সকলে শিখি, তবেই গান্ধীজীর

প্রথম শিক্ষার যথোচিত সম্মান করা হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

জনগণের জাগরণ

১৯২১ খৃষ্টাব্দের আগে ভারতবর্ষে যে সকল আন্দোলন হইয়া গিয়াছিল, তাহার অধিকাংশ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। রাউলাট কমিটির রিপোর্ট পাঠ করিলে দেখা যায় যে, বিগত মহাযুদ্ধের সময়ে বিপ্লববাদিগণ সমগ্র ভারতবর্ষের সৈন্যদলের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বালাইয়া তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু গবর্মেণ্টের কর্মপটুতায় তাহা নিষ্ফল হইয়া যায়। এই ব্যর্থ চেষ্টাটিকে বাদ দিলে ১৯২০-২১ সালের পূর্ব পর্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে আমরা জনসাধারণকে দলে টানিয়া স্বাধীনতা লাভের চেষ্টার আর কোনও পরিচয় পাই না। এ বিষয়েও মহাত্মা গান্ধীকে রাজনীতিক্ষেত্রে অগ্রণীস্বরূপ বলা যাইতে পারে। তিনি খিলাফৎ ও পাঞ্জাব আন্দোলন সম্পর্কে প্রথম দেশের জনসাধারণকে রাজনীতির ক্ষেত্রে নামাইলেন এবং সুসংযতভাবে তাহাদের কর্মপন্থাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে লাগিলেন। শুধু তাহাই নহে, ১৯৩০ সালে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময়ে রাজনীতি ক্ষেত্রে দেশের স্ত্রীশক্তিকে নামাইতে তিনি বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেইজন্য পিকেটিং-এর কার্য শুধু স্ত্রীলোকগণের দ্বারা চালিত করিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল। তাঁহার ধারণা ছিল, ভারতের সুপ্ত নারীশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে স্বাধীনতা প্রচেষ্টার সুযোগকে সম্পূর্ণরূপে খাটাইয়া লইতে হইবে।

গান্ধীজী জনগণের উপর স্বরাজলাভের জন্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া থাকেন। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে তিনি স্পষ্টভাবে

বলিয়াছিলেন যে—"আমি আন্দোলন আরম্ভ করিতেছি শিক্ষিত অথবা ধনী সম্প্রদায়কে লইয়া। কিন্তু অহিংস উপায়ে স্বরাজলাভ করিতে হইলে এ সম্প্রদায়ের সম্মিলিত চেষ্টাও পর্যাপ্ত হইবে না। যতক্ষণ না জনগণ (masses) সংগ্রামে যোগ দেয়, ততক্ষণ আমরা লক্ষ্যে পৌছাইতে পারিব না। জনগণের মধ্যে সার্বজনীন আন্দোলন সঞ্চারিত করিবার জন্য শিক্ষিত সম্প্রদায়কে লইয়া কার্য আরম্ভ করিতে হইয়াছে।"

সর্বদা জনগণের মূর্তি গান্ধীজীর মানসপটে অঙ্কিত আছে বলিয়া, তিনি প্রত্যেক রাষ্ট্রনৈতিক কর্মকে সেই কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া লন। কোনও ট্যাক্স বসাইলে দেশের উপকার হইবে কি না হইবে তাহা বিচার করিতে হইলে, অথবা গবর্মেণ্টের প্রস্তাবিত শাসনব্যবস্থার ভালমন্দ পরখ করিতে হইলে তিনি সর্বদা জনগণের দুঃখের কষ্টিপাথরে তাহাকে পরীক্ষা করিয়া লন। যে বস্তুর দ্বারা যে কর্মের দ্বারা জনগণের দুঃখের ভার লাঘব হইবে বলিয়া তিনি বিবেচনা করেন, তাহাকে তিনি সমর্থন করেন, অপর কিছুকে তিনি সমর্থন করেন না। বিলাতে গোলটেবিল বৈঠকের সময়ে তাঁহাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আপনি কি স্বাধীনতা চান না?" তাহাতে গান্ধীজী উত্তর দিয়াছিলেন, "স্বাধীনতা নামটির প্রতি আমার কোনও মোহ নাই। আমি স্বাধীনতার সারবস্তু যাহা তাহা চাই, অর্থাৎ ভারতবাসিগণ নিজের দেশের সৈন্যসামন্ত, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও অপরাপর দেশের সহিত রফা নিষ্পত্তি করিবার অধিকার লাভ করিবে, ইহাই আমি চাই। সে অধিকার যদি লাভ হয়, তবে ভারতবর্ষকে স্বাধীন দেশই বলা হউক অথবা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উপনিবেশই বলা হউক, আমার তাহাতে কোনও আপত্তি নাই। জনগণের হাতে দেশের প্রকৃত শাসনভার ন্যস্ত হইলেই আমি সন্তুষ্ট হইব।" এরূপ উক্তির মধ্যে উপরের কথাটি আরও স্পষ্ট হইয়া পড়ে।

জনগণের সুখদুঃখই যাহার একমাত্র মাপকাঠি, যিনি সকল কর্মকে শুধু সেই মাপকাঠির দ্বারাই যাচাই করিয়া লন এবং যাঁহার চিন্তাকে কর্মে পরিণত করিবার অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা আছে, তিনি যে ভারতের সুপ্তজনগণের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা সঞ্চারিত করিতে পারিয়াছেন, ইহা বিচিত্র নহে।

কেহ কেহ গান্ধীজীকে সাম্যবাদের শত্রু বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, গান্ধীজী আসলে সাম্রাজ্যবাদী এবং ধনিকগণের দোসর। তিনি আপাতত দেশের জনসাধারণের বন্ধুর মত দেখাইলেও আসলে তাহাদের শত্রু। এই মতের সত্যাসত্য বিচার না করিলেও আমরা দেখিতে পাই যে, গান্ধীজীকে যাঁহারা দেশের শত্রু বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহারাও একটি কথা স্বীকার করেন যে, গান্ধীজীই প্রথম ভারতবর্ষের জনসাধারণকে জাগরিত করিয়াছেন। যাহা স্তিমিত ছিল, তাহাকে উদ্বোধিত করিয়াছেন, যাহারা নিশ্চল ছিল, তাহাদিগকে সচল করিয়াছেন।

ইহাকে গান্ধীজীর পক্ষে ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে দ্বিতীয় দান বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

অজ্ঞাত শক্তির উন্মেষ ও ব্যবহার

প্রতি জাতিরই এক একটী বিশিষ্ট সংস্কার এবং বিশিষ্ট শক্তি থাকে। কেহ বা যুদ্ধক্ষেত্রে হঠাৎ শত্রুকে আক্রমণ করিতে হইলে অসম্ভব সাহস দেখায় অথচ ধৈর্য ধরিয়া বহুদিন যুঝিতে পারে না। কেহ বা সহজে উত্তেজিত হয় না, সেইজন্য হঠাৎ আক্রমণের প্রয়োজন হইলে অপটু হয়, অথচ একবার উত্তেজিত হইলে বহুদিন ধরিয়া, নানা অবসাদ ও হতাশা সত্ত্বেও লড়িয়া যাইতে পারে। এমনি ভাবে ক্ষত্রশক্তির ব্যাপারে এক একটি জাতির এক এক বিষয়ে বিশেষ প্রতিভা থাকে। এই জাতিগত

প্রতিভা মানুষের জন্মগত সংস্কার নহে। সেই জাতির মধ্যে প্রচলিত আচার, ব্যবহার ও কৃষ্টি হইতেই ইহার উৎপত্তি হয়। সেইজন্য আচার ব্যবহারের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে পারিলে যে কোন জাতির মধ্যে যে-কোনও শক্তি সময়কালে সঞ্চিত হইতে পারে।

কিন্তু সঞ্চিত হইতে পারে বলিয়াই যে তাহা সঞ্চিত করিতে হইবে তাহার কোনও মানে নাই। যদি এক জাতির মধ্যে কোনও একটি বিশেষ শক্তি থাকে, তবে ভাল নেতার পক্ষে সেই শক্তিকে পরিহার করিয়া অন্য একটি শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে। কেননা, এ চেষ্টা শুধু ব্যয়সাপেক্ষ নহে, যথেষ্ট সময়সাপেক্ষও বটে। যিনি উৎকৃষ্ট নেতা, তিনি জাতির উপস্থিত শক্তিকে উপযুক্ত কর্মপন্থায় নিয়োগ করিয়া স্বীয় কার্যসিদ্ধি করিতে পারেন এবং যে শক্তিলাভ সুদূর পরাহত তাহার অপেক্ষায় বসিয়া থাকেন না।

ভারতবর্ষের অধিবাসিবৃন্দের মধ্যে নানাবিধ সামরিক শক্তি আছে। মারাঠারা একরকম, পাঞ্জাবের শিখ ও মুসলমান অন্য রকম, সীমান্ত প্রদেশের পাঠানগণ অন্যরকম এবং হিমালয় অঞ্চলের গুরখা অথবা গাড়ওয়ালীগণ অপর এক রকমের। কিন্তু যদি আমরা ভারতবর্ষের সাধারণ অধিবাসিগণের সহিত চীন, আরব অথবা ইউরোপের জনসাধারণের তুলনা করি, তাহা হইলে দেখা যায় যে, ভারতবাসীর মধ্যে একটি শক্তি অত্যদ্ভুত পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। ধর্মের নামে সর্ববিধ ক্লেশ সহ্য করিবার মত তাহাদের একটি আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। সাধারণ ভারতবাসীর মধ্যে এই প্রচ্ছন্ন আদর্শবাদ ও ধৈর্য পরম বিস্ময়কর বস্তু। হঠাৎ কাহাকেও আক্রমণ করিতে ভারতবাসী হয়ত নারাজ হইবে, নিজের পেটের অন্নের জন্য বা সাংসারিক সুখ সুবিধার জন্য লড়াই করিতে সে সহজে অগ্রসর হইবে না। যেখানে একটি আঙুল তুলিলে

দুঃখের নিবৃত্তি হয় সেখানেও আগে আঙুল তুলিবে না। কিন্তু যদি তাহাকে একবার বুঝান যায়, এইটি তোমার ধর্ম, এজন্য তোমাকে শত লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে, অনেক নির্যাতন সহ্য করিতে হইবে, তাহা হইলে তাহার মধ্যে সুপ্ত আদর্শবাদী জাগিয়া উঠে এবং সে যে পরিমাণ সাহস ও ধৈর্য দেখায় তাহা যে কোনও বীরজাতির পক্ষে দৃষ্টান্তস্থল হইতে পারে। কেবল ব্যাপার হইল এই সুপ্তশক্তিকে এমন এক কর্মপন্থায় নিয়োজিত করিতে হইবে, যাহার দ্বারা সত্যই আমাদের দুঃখকে মোচন করা যায় এবং আমাদের কার্যে সিদ্ধিলাভ ঘটিতে পারে।

গান্ধীজী জ্ঞানতই হউক অথবা অজ্ঞানতই হউক, ভারতবর্ষের মধ্যে সুপ্ত ধৈর্য-শক্তিকে অহিংস অসহযোগ প্রবর্তনের দ্বারা একটি উৎকৃষ্ট কর্মপন্থা দান করিয়াছেন। অহিংস অসহযোগ তাঁহার নিকট হয়ত সম্পূর্ণ আদর্শবাদ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। রক্তপাতকে তিনি আদর্শবাদী বলিয়াই ঘৃণা করেন এবং সেইজন্য ভারতবাসীকে রক্তপাত হইতে নিবৃত্ত থাকিতে বলেন, একথা সত্য। সাধারণ ভারতবাসীর রক্তপাত করিবার কতটুকু ক্ষমতা আছে, তাহা আমাদের জানা নাই। কিন্তু তাহাদের মধ্যে সহ্য করিবার যে আশ্চর্য ক্ষমতা আছে ইহা নিশ্চিত। এবং সেই সহ্যগুণের বশে অসহযোগের দ্বারা পরাধীনতার শৃঙ্খলকে যে মোচন করা যাইতে পারে, ইহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। অতএব ভারতের সুপ্ত শক্তিকে আবিষ্কার করিয়া তাহাকে যথাযথভাবে কাজে লাগাইবার উপায় নির্দেশ করায় আমরা গান্ধীজীর মহত্ত্ব দেখিতে পাই। ইহা তাঁহার পক্ষে রাজনীতির ক্ষেত্রে তৃতীয় দান বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে।

গোপনতার উচ্ছেদ সাধন

গান্ধীজী যেমন অহিংস অসহযোগের উপায় নির্দেশ করিয়া ভারতের সুপ্ত ধৈর্যশক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছেন এবং সাফল্যমণ্ডিত করিবার

ভরসা দিয়াছেন, তেমনই তিনি এই উপায়ের দ্বারা প্রত্যেক ভারতবাসীর মধ্যে সাহসের ও বীর্যের যে শক্তি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তাহাকে আবার জাগাইয়া তুলিয়াছেন। ভারতবর্ষে এক সম্প্রদায় লোক সর্বদাই পরাধীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু কোন দিনই তাহাদের সংখ্যা পর্যাপ্ত ছিল না। অধিকাংশ লোক, স্বাধীনতাকামী ইহা স্পষ্টভাবে স্বীকার করিতেও কুণ্ঠাবোধ করিতেন। তাঁহারা স্বাধীনতার কথা মুক্তির কথা গোপনে আলোচনা করিতেন, গোপনে কর্মপন্থা নির্ধারণ করিতেন কিন্তু সকলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যে একথা বলা সম্ভব অথবা গোপন পথ পরিহার করিয়া সর্বসমক্ষে মুক্তিব্রত উদ্‌যাপন করা যাইতে পারে ইহা তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এই সম্প্রদায়কে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলনের সময় সর্বসমক্ষে টানিয়া আনিয়া গোপনতার অবসাদক্লেশ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। স্বাধীনতাকামিগণ গুহা-পথ পরিত্যাগ করিয়া দিবসের উন্মুক্ত আলোকে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাদের মন হইতে সব সন্দেহ সকল ভয় দূর হইয়া গেল। ইহা কম কথা নহে।

রাষ্ট্রীয় মুক্তির চেষ্টাকে গোপনতার বন্ধন হইতে বাহির করিয়া আনা গান্ধীজীর পক্ষে চতুর্থ মহৎ দান বলিয়া আমরা বিবেচনা করিতে পারি।

অহিংস অসহযোগ

কিন্তু সবশেষে বলিতে হইলেও গান্ধীজীর পক্ষে অহিংস অসহযোগের অস্ত্র আবিষ্কার করাকেই আমরা তাঁহার শ্রেষ্ঠতম দান বলিয়া বিবেচনা করিব। আমাদের ধারণা ভারতবর্ষ যদি না এই উপায়ের দ্বারা স্বরাজলাভ করিতে শেষ পর্যন্ত নাও পারে তাহা হইলেও জগতের ইতিহাসে মহাত্মা গান্ধীর নাম চিরদিন অহিংস অসহযোগের প্রবর্তক

হিসাবে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে। হয়ত এমনও দিন আসিতে পারে, যখন মানুষ যুদ্ধের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া অবশেষে পরস্পরের সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য তরবারি পরিহার করিয়া অহিংস অসহযোগের আশ্রয়ই গ্রহণ করিবে।

মহাত্মা গান্ধীর ধারণা যে যখন এক দল লোক অপর কোনও দলের উপর অত্যাচার করে অথবা তাহাদিগকে শোষণ করে, তখন অত্যাচারিত দল সাক্ষাৎ অথবা পরোক্ষভাবে সেই শোষণকার্য্যে সহায়তা করিয়া থাকে। অর্থাৎ আমি যদি কাহারও দ্বারা শোষিত হইতে না চাহি, এবং এজন্য পুরা দাম দিতে রাজি হই, অর্থাৎ স্বাধীনতার দাবীর উপযুক্ত মূল্যস্বরূপ মৃত্যু, বরণ করিতে রাজি হই তাহা হইলে জগতে এমন কোনও শক্তি নাই যাহা আমার মাথা নীচু করিতে পারে অথবা আমাকে কোনও রকমে শোষণ করিতে পারে। অত্যাচারিতের সহযোগিতা বিনা অত্যাচারী অত্যাচাব করিতে পারে না। আমাদের মধ্যে গোপন দুর্বলতা আছে বলিয়াই আমাদিগকে অত্যাচার সহ্য করিতে হয়। সেই দুর্বলতা দূর করিয়া আমবা যদি শুদ্ধ হইতে পারি, তাহা হইলে স্বরাজ আমাদের করতলগত হয়। সেইজন্য আত্মশুদ্ধিকে গান্ধীজী স্বরাজলাভের মূলমন্ত্র স্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন। জগতের অত্যাচারকে দুই উপায়ে বন্ধ করা যায়। উপরে লিখিত হইয়াছে যে, আমরা যদি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে অত্যাচারীর সহিত সহযোগিতা বর্জ্জন করি, তাহা হইলে অত্যাচারীর অত্যাচার নিশ্চয়ই বন্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু জগতে এই উপায়টি প্রচলিত নহে। প্রচলিত উপায় হইল অত্যাচারীকে বলপ্রয়োগের দ্বারা নিরোধ করা অথবা সোজাসুজি হত্যা করা। জগতের এই নীতিই চলিয়া আসিতেছে, অর্থাৎ ভয় ও পশুবলের ব্যবহারের দ্বারাই অত্যাচারের পর অত্যাচারকে রুদ্ধ করিবার চেষ্টা চলিতেছে।

এই উপায়টি পুরাতন। কিন্তু জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, পশুবলের প্রয়োগের দ্বারা সর্বদা ন্যায়ের দেবতাকে অধিষ্ঠিত করা যায় নাই। ন্যায় যেখানে বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া স্থাপিত হইয়াছে সেখানে ন্যায়ের রাজ্য বেশি দিন স্থায়ী হয় নাই। সেইজন্য বাহুবলের পথ পরিহার করিয়া গান্ধীজী ন্যায়ের রাজ্য স্থাপনের জন্য অন্য এক উপায়ের নির্দেশ দিয়াছেন। গান্ধীজীর ধারণা, যদি আমরা অত্যাচারীর সহিত অসহযোগ করি তাহা হইলে তাহার অত্যাচারের কল ভাঙিয়া যাইবে। কিন্তু যদি সেই যন্ত্র ভাঙার সময়ে আমরা অত্যাচারীর প্রতি ঘৃণার ভাব পোষণ করি, অথবা তাহার প্রতি বিদ্বেষ রাখি, তবে সে পরাজিত হইলেও বরাবর আমাদের শত্রুই থাকিয়া যাইবে, তাহাতে আমাতে যে ভেদ আছে সে ভেদ চিরস্থায়ী হইয়া যাইবে। তাহার পরিবর্তে যদি আমরা শত্রুর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ না করি, তাহার প্রতি মানুষের ন্যায্য প্রাপ্য শ্রদ্ধা দিতে কখনও কুণ্ঠিত না হই, তাহা হইলে সে পরাজিত হইলেও, তাহার অত্যাচারের যষ্টি হাত হইতে খসিয়া পড়িলেও, সে আমাদের শত্রু থাকিয়া যাইবে না, হয়ত বা অবশেষে আমাদের মিত্র হইয়া দাঁড়াইতেও পারে। যদি তাহাই হয়, তবে তদপেক্ষা কল্যাণ আর কি হইতে পারে?

ইহা হইল অসহযোগের মূলমন্ত্র। কাহারও কাহারও ধারণা, অহিংস অসহযোগ সংগ্রাম নহে। কিন্তু সে ধারণা ভুল। ইহা সংগ্রামেরই একটি রূপ। কেবল ইহার নূতনত্ব হইল এইখানে যে ইহার মধ্যে সংগ্রামের তীব্রতা থাকিলেও সংগ্রামের ধূলি ও কর্দম, অর্থাৎ দ্বেষ ও ক্রোধ নাই। সেইজন্য অহিংস অসহযোগের অন্তে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিকট আরও মধুর হইয়া উঠে। সংগ্রামরত উভয় দলের মধ্যে যুদ্ধান্তে অবসাদ না আসিয়া নূতন উৎসাহ ও নূতন প্রেমের

ভাব স্থাপিত হয়। উভয়ে সম্মিলিত হইয়া নূতন সমাজ গড়ার চেষ্টা করে।

মহাত্মা গান্ধীকে অনেকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এরূপ যুদ্ধ কি সম্ভব? এরূপ যুদ্ধের দ্বারা কি জগতের যাবতীয় অত্যাচার সত্য সত্যই দূর করা যায়? তাহার উত্তরে গান্ধীজী বলিয়াছেন, এরূপ সংগ্রাম যে সম্ভব তাহা আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। মানুষে তরবারির দ্বারা আজ পর্যন্ত স্থায়ীভাবে ন্যায়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই। কিন্তু অহিংস অসহযোগের দ্বারা ন্যায়ের রাজ্য স্থাপন করিবার সম্ভাবনা আমি দেখিতে পাই। যখন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে, তখন আমাদের চেষ্টার ত্রুটি হইবে কেন? কবে কোন তারিখে, ন্যায়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহা আমাদের ভাবিবার বিষয় নয়? তরবারির দ্বারা যখন ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না, তখন অহিংসার দ্বারা সে চেষ্টা করা ছাড়া আমাদের আর কি কর্তব্য থাকিতে পারে?

মহাত্মা গান্ধী কিন্তু এইটুকু বলিয়াই শান্ত হন না? অহিংস অসহযোগের আরও কি কি বিশেষ গুণ আছে তাহা বলিতে তিনি কখনও ক্লান্ত হন না। তিনি বলেন, অহিংস অসহযোগের আরও দুইটি বিশেষ গুণ আছে। ইহা যেমন যুদ্ধান্তে উভয় দলকে আরও শুদ্ধ আরও প্রেমে আকৃষ্ট করে, তেমনই আবার—

১। ইহাতে পরাজয় হইলে, তরবারির যুদ্ধ অপেক্ষা দেশের কম ক্ষতি হয়।

২। দ্বিতীয়ত, ইহার এমন গুণ যে যাহার যতটুকু আধ্যাত্মিক শক্তি আছে, সে ততটুকুকেই অসহযোগের কাজে লাগাইয়া লাভবান হইতে পারে।

দ্বিতীয় যুক্তিটিকে আরও স্পষ্টভাবে বুঝিবার প্রয়োজন আছে। ভারতবাসীর আত্মবিশ্বাস কম। অথচ অহিংস অসহযোগে যেরূপ আত্মবিশ্বাসের প্রয়োজন আছে, তরবারির যুদ্ধে ততটা হয় না। তরবারির যুদ্ধে সৈনিকের মনে প্রচ্ছন্ন কাপুরুষতা বিদ্যমান থাকিলেও, সে দলে ভিড়িয়া হয়ত শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হইতে পারে। কিন্তু অহিংস সংগ্রামে, যেখানে সবই ধৈর্য এবং সত্ত্বগুণের উপর নির্ভর করে, সেখানে ইহা সম্ভব নয়। সর্ববিধ সম্পত্তির ক্ষয়, এমন কি প্রতি-মুহূর্তে প্রাণবিসর্জ্জনের সম্ভাবনার মধ্যে অটল থাকিলে, তবেই অহিংস সৈনিকের পক্ষে জয়লাভ করা সম্ভব, নচেৎ নহে। অথচ অহিংস অসহযোগের বিশেষ গুণ হইল এই যে, এপথে প্রথম হইতেই মৃত্যুভয়কে ডাকিয়া আনিবার প্রয়োজন হয় না। যাহার মানসিক শক্তি অল্প সে অল্পমাত্রায় অসহযোগ করিতে পারে। হঠাৎ বড় সাহসের কাজে প্রবৃত্ত হইবার প্রয়োজন তাহার হয় না। অল্প কাযে ধৈর্যবলে জয়যুক্ত হইলে অসহযোগী সৈনিকের সাহস বাড়িয়া যায় এবং তাহার অসহযোগের মাত্রাও বৃদ্ধি পায়। সৈনিকের সাহস যত বৃদ্ধি পায়, তাহার অসহযোগও তত কাযকরী ও ফলপ্রসূ হয়। অর্থাৎ অসহযোগ একটি বর্দ্ধনশীল সাধনোপায়, সৈনিকের আন্তরিক বলের ক্রমপরিণতির সহিত অসহযোগও ক্রমপরিণতি লাভ করে। এইজন্য গান্ধীজী জনগণের অথবা লোকবিশেষের আন্তরিক ক্ষমতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া নানাবিধ কর্মপন্থার সূচনাও দিতে পারেন।

ইহা অহিংস অসহযোগের শ্রেষ্ঠত্বের একটি বড় লক্ষণ। ভারতের রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে গান্ধীজী স্বীয় মতবাদকে কাযকরী করিবার জন্য যে প্রচেষ্টা করিয়াছেন তাহার ফলেই এদেশে অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্তিত হইয়াছিল। তাহার ফলাফলের বিচার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।

উপসংহার্

মহাত্মা গান্ধীর বিভিন্ন দানের কথা আলোচনা করিয়া আমরা স্পষ্টই এমন কতকগুলি বিষয় দেখিতে পাই, যাহার জন্ত ভারতবর্ষ তাঁহার নিকট চিরদিন ঋণী থাকিবে। তিনি ভারতের অন্তর্নিহিত শক্তিকে এমনভাবে আবিষ্কার করিয়াছেন, এমনভাবে তাহাকে একটা কর্মপন্থার নির্দেশ দিয়াছেন, যাহা তৎপূর্বে আর কেহ করিতে সমর্থ হন নাই। ভারতবর্ষ অবশ্য এখনও মুক্তিলাভ করিতে, অর্থাৎ স্বরাজ স্থাপন করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু ইতিমধ্যে অহিংস অসহযোগ প্রবর্তনের ফলে ভারতেব সর্বত্র চরিত্রের মধ্যে যে স্পষ্ট পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেখা গিয়াছে তাহার ফল ফলিতে বাধ্য। ভারতবাসীর সাহস ছিল, আত্মবিশ্বাস ছিল, কিন্তু তাহা ধর্মের জন্য নিয়োজিত হইত। গান্ধীজী সেই স্রোতধারাকে রাজনীতির ক্ষেত্রে পরিচালিত করিলেন। ভগীরথ যেমনভাবে গঙ্গা নদীকে ইচ্ছার অধীনে চালিত করিয়া দেশকে শস্যশ্যামল করিয়াছিলেন, গান্ধীজীও তেমনই ভারতের স্তিমিত কর্মশক্তিকে উদ্বোধিত করিয়া ভারতবাসীর দুঃখ দূর করিবার মত ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহার জন্য কৃতজ্ঞতা স্বাভাবিক।

ভারতবাসীও সেজন্য মহাত্মা গান্ধীর নিকট কৃতজ্ঞ। কিন্তু কৃতজ্ঞতার গুণও যেমন আছে দোষও তেমনি আছে। ইহা অন্ধ হইলে সমাজের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়। মহাত্মা গান্ধীর প্রতি কৃতজ্ঞতার বশে আমরা সময়ে সময়ে একটি কথা ভুলিয়া যাই যে, তিনি মানুষ এবং অপরাপর মানুষের মত তাঁহারও চরিত্রে ও কর্মে নানাবিধ অসম্পূর্ণতা থাকা স্বাভাবিক।

পরমহংসদেব অথবা শঙ্করাচার্য আধ্যাত্মিক সম্পদে যেমন ভরপুর

ছিলেন, তেমনই জ্ঞানের রাজ্যে অসম্ভব আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন একথা অস্বীকার করা যায় না। জীবনের কোনও অংশই তাঁহাদের কাছে অধিক প্রিয় অথবা কোন প্রদেশই তাঁহাদের কাছে তাচ্ছিল্যের বিষয় ছিল না। তাঁহারা মানুষের জীবনকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু গান্ধীজী মূলত জ্ঞানী নহেন, কর্মী। তাঁহার কর্মপন্থা বিশেষ একটি উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিয়াছে। তিনি ভারতবর্ষকে রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে মুক্তি দিতে চান এবং তাহাও অহিংস উপায়ের দ্বারা, অর্থাৎ প্রেমধর্মের দ্বারা সাধন করিতে চান। সেইজন্য জীবনের অবশিষ্ট অংশের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবার মত সময়ও তাঁহার নাই, দৃষ্টিসাধনাও তিনি করিতে পারেন না। জীবনকে সমগ্রভাবে বুঝিবার বা বুঝাইবার কাজ তাঁহার নহে। অতএব যাঁহারা গান্ধীজীর রাজনীতিক্ষেত্রে বৃহৎ দানের কথা স্মরণ করিয়া হঠাৎ তাঁহার প্রতি প্রেমের মোহবশত মনে করিয়া থাকেন যে, তিনি মানুষের জীবনের প্রতিদিকেই কিছু না কিছু নূতন বলিতে আসিয়াছেন, তাঁহারা গান্ধীজীর প্রতি অবিচার করেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। গান্ধীজী মূলত কর্মী, জ্ঞানী নহেন। প্রাচীন ভারতের ভাষায় বলিতে গেলে তিনি ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ নহেন। তবে তাঁহার মহত্ত্ব এইখানে যে, তিনি ক্ষত্রিয় হইলেও প্রেমধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহাকে যোদ্ধা-ব্রাহ্মণও বলা যাইতে পারে, কিন্তু তিনি জ্ঞানী ব্রাহ্মণ, অর্থাৎ মুনি নহেন।

এই কথা বলিয়াই আমরা বর্তমান প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করিব। ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে গান্ধীজীর দান কম নহে। অপর সকলের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে তাঁহার দানকে অতুলনীয় বলা চলে। সেই দানকে আমরা যেন সতত স্মরণ করি, তাঁহার মহত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারি, তাহা অনুসরণ করিয়া নিজেরা সতত আধ্যাত্মিক সম্পদের

অধিকারী হইতে পারি। কিন্তু সে প্রেম, সে ভক্তি আমাদের দৃষ্টিকে যেন কোনদিন মোহাবিষ্ট করিতে না পারে, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। সম্যক্ দৃষ্টির অধিকারী হইতে পারিলে তবেই আমরা মহাত্মা গান্ধীর পথ সম্যক্‌ভাবে অনুসরণ করিতে পারিব বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

রাজনীতির ক্ষেত্রেও প্রেমের পথ অন্ধের জন্য নহে।

গান্ধীজয়ন্তী

মহাত্মা গান্ধী ১৮৬৯ সালে ২রা অক্টোবর গুজরাটে জন্মগ্রহণ করেন। আজ তাঁহার বয়স ৬৮ পূর্ণ হইয়া ৬৯এ পড়িয়াছে। গান্ধীজীর জন্মদিনে আমরা সকলে প্রার্থনা করি যেন তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সফল করিতে পারেন। আজ আমরা গান্ধীজীর জীবনের কতকগুলি স্মরণীয় ঘটনা উল্লেখ করিয়া তাহার পর তাঁহার মতামতের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

গান্ধীজী বিলাত হইতে ব্যারিষ্টারি পাশ করিয়া প্রথমে বোম্বাই সহরে ওকালতি আরম্ভ করেন। কিন্তু কিছুদিন পরে দক্ষিণ আফ্রিকায় একটি কাজের বায়না লইয়া তিনি সেখানে চলিয়া যান। সেই হইতে তিনি মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাস করিতেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীদের উপর ইউরোপীয়গণ বড় অত্যাচার করে। তাহার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবার জন্য গান্ধীজী ১৯০৩ সালে "ইণ্ডিয়ান্ ওপিনিয়ন" নামে একখানি সংবাদপত্র বাহির করেন। কিন্তু শুধু সংবাদপত্রে আন্দোলন চলে না। সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয়গণকে সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী করিবার জন্য তিনি ১৯০৪ সালে ফিনিক্স আশ্রম স্থাপনা করিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ ১৯০৬ হইতে ১৯১৩ পর্যন্ত ৮ বৎসর ধরিয়া চলিয়া সফল হইয়াছিল। আন্দোলনের মধ্যে সত্যাগ্রহীগণকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য ১৯১০ সালে টলষ্টয় ফার্ম নামে আর একটি আশ্রম স্থাপিত করা হয়। বন্দুক-কামান লইয়া যুদ্ধে যেমন সৈন্যদের কুচকাওয়াজ শেখা দরকার, অহিংস

আন্দোলনের জন্য জীবনকে গড়িতে গেলে যে সেইরূপে গ্রামে সংগঠনমূলক কার্য ও আশ্রমজীবন যাপনের প্রয়োজন একথা গান্ধীজী খুব স্পষ্টভাবে তখন হইতে বুঝিয়াছিলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহের পর গান্ধীজী বিলাতে গিয়াছিলেন এবং সেখান হইতে ভারতে ফিরিয়া মহাযুদ্ধের জন্য সৈনিকসংগ্রহের কার্যে কিছুদিন নিযুক্ত থাকেন। তখনও তিনি ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের সদাশয়তায় বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু পাঞ্জাবে জালিয়ানওয়ালাবাগ ঘটনার পর তাঁহার সে বিশ্বাস একেবারে ভাঙিয়া যায়। ভারতবর্ষে আসিয়া গান্ধীজী প্রথমে অল্পদিন বোলপুর শান্তিনিকেতনে ছিলেন। কিন্তু তাহার পরই ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে আহমদাবাদের উপকণ্ঠে এক আশ্রম স্থাপনা করেন। ১৯১৭ সালে এই আশ্রম সবরমতী নদীর ধারে সরাইয়া লইয়া যাওয়া হয়। ১৯১৭ সালে চম্পারণে চাষীদের মধ্যে বিপুল আন্দোলন হয়। তাহার মূলে ছিলেন গান্ধীজী। আন্দোলনের ফলে চাষীদের জয় হয় এবং নীলকুঠীর মালিকগণের পরাজয় ঘটে। ১৯১৮ সালে খেড়া জেলায় গুজরাটে কৃষক আন্দোলন হইয়াছিল। তাহার পরই ১৯১৯ সালে রাউলাট আইন এবং খিলাফৎ সম্পর্কে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়।

অসহযোগ আন্দোলন অহিংসনীতিতে চলিয়াছিল। সেই নীতিতে কি করিয়া গবর্মেণ্টের বিরোধিতা করিতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নিজের অন্তরের নানাবিধ দোষ হইতে চরিত্রকে মুক্ত করিতে হয়, সেই শিক্ষা দিবার জন্য গান্ধীজী ১৯১৯ সালের শেষভাগে ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকা পরিচালনা আরম্ভ করেন। ইয়ং ইণ্ডিয়ায় যে শিক্ষা লেখার সাহায্যে দেওয়া হইত সবরমতী আশ্রমে তাহাই হাতে-কলমে শেখানো হইত। ১৯২২-এর পর অসহযোগ আন্দোলনের অবসান ঘটিলে

দেশে সংগঠনমূলক কার্য চলিতে থাকে। তাহার ফল ১৯৩০ সালে লবণ-সত্যাগ্রহের সময়ে টের পাওয়া যায়। ১৯৩০-১৯৩৩ পর্যন্ত সত্যাগ্রহ আন্দোলন চলিতে থাকে এবং তাহার পর তাহার পরিবর্তে হরিজন আন্দোলন, গ্রাম-উদ্যোগ আন্দোলন প্রভৃতি আরম্ভ হয়। গান্ধীজী হরিজন আন্দোলনের সময়ে সাক্ষাৎভাবে সবরমতী আশ্রম ছাড়িয়া দিলেন। এবারে তিনি নূতন কোন আশ্রম স্থাপনা না করিয়া সেগাঁও নামক এক ক্ষুদ্র গ্রামে স্বহস্তে সংগঠনমূলক কার্য করিতে আরম্ভ করিলেন। একদিন যেমন সবরমতীর আদর্শে ভারতের দিগ্‌বিদিকে আশ্রম ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, আজও তেমনই দরকার হইয়াছে যে কর্মীগণ ভারতের গ্রামে গ্রামে বসতি করিয়া লোকের চরিত্রকে উন্নত, সাহসী এবং বলিষ্ঠ করিবেন। এই কথাটি গান্ধীজী এখন স্বীয় আচরণের দ্বারা সকলকে শিক্ষা দিতেছেন। ইহাই গান্ধীজীর জীবনের মোট পরিচয়। এইবার আমরা তাঁহার মতামত এবং উপদেশের বিষয় কিছু আলোচনা করিব।

গান্ধীজী মনে করেন জগতে আজ যে বড়লোক এবং গরিব লোকের মধ্যে তফাৎ রহিয়াছে তাহার মূলে আছে মানুষের স্বার্থপরতা, শ্রমবিমুখতা এবং ভয়। যাহারা ধনী তাহারা নিজে মাটি হইতে খাদ্য-সামগ্রী উৎপাদন করে না, অপরকে খাটাইয়া খায় এবং তাহাদের পরিশ্রমের উচিত মূল্য দেয় না। গান্ধীজীর মতে মানুষে মানুষে ভেদ উঠিয়া যায় যদি সবাই নিজের হাতে শারীরিক পরিশ্রম করিয়া খাদ্যসামগ্রী উৎপাদন করে। কিন্তু সত্যই ত' মানুষে মানুষে শুধু নিজেকে লইয়াই এমন আলাদা ভাবে থাকিতে পারে না। তাই কাহাকেও চাষের কাজ করিতে হয়, কাহাকেও ছুতারের কাজ, কাহাকেও কামার, কুমার বা ধোপা, নাপিত অথবা তাঁতির কাজ। কিন্তু শরীর খাটাইয়া কিছু না কিছু উৎপন্ন করার দায়িত্ব হইতে কাহারও নিস্তার নাই।

আর সে পরিশ্রম অন্তত এতখানি হওয়া উচিত যাহার দ্বারা মানুষের নিজের জীবনধারণের কাজ চলিয়া যায়। শুধু জীবনধারণের জন্য মানুষকে নিজের শারীরিক শ্রমের উপরেই নির্ভর করিতে হইবে ইহাকে গান্ধীজী শরীরযজ্ঞ বা অঙ্গশ্রম নাম দিয়াছেন। অঙ্গশ্রমের দায়িত্ব সকলের।

কিন্তু আবার দেখুন, কোন কাজ উচিত বলিলেই ত' লোকে করিতে চায় না। একজন হয়ত গান্ধীজীর নীতি বুঝিয়া শরীরযজ্ঞ পালন করিল, কিন্তু অপরকে তাহা পালন করানোর উপায় কি? তাই গান্ধীজী বলেন, ধনী এবং শোষকদের মনকে বদলাইবার জন্য অহিংস অসহযোগের দরকার আছে। জগৎ হইতে শোষণ দূর করিবার পক্ষে এবং ধনবৈষম্য উঠাইয়া দেওয়ার জন্য অহিংস অসহযোগকে তিনি শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া মনে করেন।

গান্ধীজী বলেন ধনীরা ধনী কেন না গরীবেরা মাহিয়ানার লোভে পড়িয়া অথবা ভয়ের বশে তাহাদের ধনোৎপাদনে সহায়তা করে। একদিকে ধনীদের লোভ এবং হাতে অনেক শক্তি, অপরদিকে নির্ধন-দের অজ্ঞতা, ভয় এবং লোভ রহিয়াছে। তাহারাও বাগে পাইলে আরও গরিবদের খাটাইয়া লইতে চায়, মনে মনে নিজেরা বড়লোক হইয়া বাঁচিয়া থাকার স্বপ্ন দেখে। এই দুই পাপ হইতে মুক্ত হইতে হইলে ধনীদের অনুরোধ করিতে হইবে তাহারা যেন শোষণবৃত্তি ছাড়িয়া দেয়। আর নির্ধনদের শিখাইতে হইবে তাহারা যেন অসহযোগিতা করিয়া ধনীদের শোষণের কারবার একেবারে অচল করিয়া দেয়। যদি তাহারা নিষ্ঠার সহিত অসহযোগ করে, সকল অত্যাচার নীরবে সহিয়া লয়, তবু নিজেদের ব্রতে অটল থাকে, তাহা হইলে তাহাদের কষ্ট ও বীরত্ব দেখিয়া ধনীদের হৃদয় টলিতে পারে, তাহারা নিজেদের জীবনকে

শোষণপাপমুক্ত করিয়া মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিতে পারে। আর যদি না'ও পারে, তাহা হইলে ধনীদের শোষণের দ্বারা ধন-সংগ্রহের যে বর্তমান ব্যবস্থা চলিতেছে, তাহা নির্ধনদের সহযোগিতা বিনা নিশ্চয় ভাঙিয়া যাইবে।

এই মহান্ ব্রতের জন্য মানুষকে অসীম ধৈর্য শিখিতে হইবে। সেই ধৈর্যের দ্বারা ও নিজেদের অটল অসহযোগের দ্বারাই জগতের যত শোষিত এবং অত্যাচারিত লোক জগতকে নূতনভাবে গড়িয়া তুলিতে পারে, পরের শ্রমের উপর সুখের আসন গড়ার ব্যবস্থার অবসান চিরদিনের জন্য ঘটাইয়া দিতে পারে।

কিন্তু ইহার জন্য চাই সকল অত্যাচারকে সহ্য করিবার মত শক্তি এবং নিজের ব্রতে অটল থাকার মত বিশ্বাস। ইহা ভগবানকে পাওয়ার তপস্যার মত কঠিন কাজ। বস্তুত গান্ধীজী স্বরাজ সাধনাকে তপস্যাই বলিয়াছেন এবং ইহাও বলিয়াছেন যে এই তপস্যার আগুনে আমরা যদি নিজেদের সত্যে অটল থাকি, কোনও পরিশ্রমকে অথবা দুঃখকে স্বীকার করিতে ভীত না হই, কোনও লোকসানকে লোকসান বলিয়া না মানি, তাহা হইলে জগতের মানুষ চরিত্রে শুদ্ধ হইয়া যাইবে, আমরাও শুদ্ধচরিত্র হইব এবং সকলে পরিশ্রম করিয়া সমান সমান থাকিবে। ধনী-নির্ধন থাকিবে না। যাহার বিদ্যা বেশী সে বিদ্যা সকলকে বিতরণ করিবে। যাহার শিল্পজ্ঞান আছে, সে সকলকে আনন্দ পরিবেশন করিবে। বিশেষ বিশেষ গুণের জন্য মানুষে সম্মান বেশী পাইবে, কিন্তু একা অথবা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অপরের শ্রমকে শোষণ করার অধিকার পাইবে না। শিশু এবং বৃদ্ধ ব্যতীত কেহ পরান্নে নির্ভর করিতে পারিবে না। কেবল যাহারা জ্ঞানের জন্য জীবন-সর্বস্ব দিয়াছে, জ্ঞান বিতরণের কার্যে সদা নিযুক্ত আছে এমন ব্যক্তিকে

শুধু জীবনধারণের জন্য ভিক্ষান্ন সমাজের লোক স্বেচ্ছায় দান করিতে পারে। জ্ঞানের উপাসকের সেই ভিক্ষান্নের উপরে অধিকার বলিয়াও কিছু থাকিবে না।

গান্ধীজীর মতবাদের মধ্যে এই দুইটিকে মূল কথা বলিয়া আমাদিগকে মানিতে হইবে। আমাদের দুঃখ দুর্দশার জন্য আমরাই দায়ী। আমাদের অন্তরে নিহিত কোন না কোন দোষের জন্যই আমরা দুঃখ ভোগ করিয়া থাকি। আর সেই দোষ হইতে নিজেকে এবং জগৎকে মুক্ত করিবার উপায় হইল তপশ্চর্যা বা স্বেচ্ছায় দুঃখবরণ। কিন্তু অজ্ঞানীর মত দুঃখবরণ করিলেই সুফল ফলিবে না। নিজের উদ্দেশ্যকে মনের সামনে পরিষ্কার রাখিতে হইবে। সব মানুষ যে সমান এই সত্যে আস্থা রাখিতে হইবে। ধনীরা লোভের বশে অন্ধ হইলেও আমরা যেন ক্রোধের বশে অন্ধ না হই। মানুষ যতই খারাপ হউক না কেন, তপশ্চর্যার দ্বারা তাহাকে ভাল করা যায়, এই বিশ্বাস হারাইলে চলিবে না।

কোন কোন রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত বলেন যে গান্ধীজী বিপ্লবী নয়। তিনি আস্তে আস্তে মডারেটদের মত দেশের ভাল করিতে চান, যাহারা খাইতে পায় না তাহাদের দুমুঠা খাইতে দিয়া ঠাণ্ডা রাখিতে চান, যেন বিপ্লব না বাধিয়া যায়। কিন্তু গান্ধীজী স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন তিনি পরিপূর্ণ বিপ্লবী, কিন্তু তাঁহার বিপ্লবে হিংসার স্থান নাই। হিংসার বিপ্লবের চেয়ে তাহাতে অনেক বেশী ধৈর্য, অনেক বেশী শক্তির প্রয়োজন। মানুষের অন্তরে বিপ্লব ঘটাইয়া জগতের চেহারা বদলাইয়া দেওয়াই তাঁহার ব্যবসায়। মানুষ আজ সর্বত্র যে জীবন যাপন করিতেছে তাহা দোষের বিষয়। তাহা হইতে মুক্ত হইতে হইলে সত্যাগ্রহীগণকে তপস্যা করিতে হইবে। সে তপস্যায় তাহাদের প্রাণ বিসর্জনও দিতে হইতে পারে। কিন্তু গান্ধীজী প্রথমেই দুঃখ এবং প্রাণ বিসর্জনের কথা বলেন, যুদ্ধের শেষে

কি কি লাভ হইবে তাহার লোভ দেখান না। তিনি শুধু তপস্যার দুর্গম পথের দিকেই যাত্রীর দৃষ্টিকে বাঁধিয়া রাখেন। যাহার যত শক্তি তাহাকে সেইমত তপশ্চর্যা দেন। তাহার শক্তি বৃদ্ধি পাইলে আরও কঠিন তপস্যার কথা বলেন, তাহার ফলও বেশি হয়। যত সাহস, যত ধৈর্য, যত শুদ্ধতা ও যত জ্ঞানের সহিত মানুষ অসহযোগ করে, তাহার অসহযোগের ফলও তত বেশি হয়। মডারেটগণ একটি লাভ হইতে অপর একটি লাভের চেষ্টায় অগ্রসর হন। গান্ধীজী একটি লোকসান হইতে আরও গুরুতর লোকসানের দিকে মানুষকে ঠেলিয়া দেন। ইহাতে অন্তরে মানুষের লাভ হয়, কিন্তু সংসারের জমাখরচে তাহার লোকসান হয় বলিয়াই সকলে দেখিতে পায়। গান্ধীজী ইহাও বলেন, যতক্ষণ মানুষ নিজের আকাঙ্ক্ষিত জিনিষের জন্য জীবন পণ না করে ততক্ষণ সত্যকারের মূল্যবান সামগ্রী লাভ করা তাহার পক্ষে সম্ভব হয় না। মৃত্যুই মানুষকে শেষ পর্যন্ত জয়ের তিলক পরাইয়া দেয়, আর কোন্ বিপ্লবীই বা মৃত্যুর চেয়ে বেশি অগ্রসর হইতে পারে? গান্ধীজীর শেষ কথা বলিয়া আজ বিদায় লইব। তিনি একবার বলিয়াছিলেন, যে জাতি মৃত্যুকে নিদ্রার সাথী করিয়া রাখিয়াছে তাহার দ্বারাই বড় কাজ হওয়া সম্ভব। **That nation is great which rests its head upon death as its pillow.**

আসুন গান্ধীজীর জন্মদিনে আমরা সঙ্কল্প করি যে তাঁহার প্রদর্শিত তপস্যার পথে অগ্রসর হইয়া আমরাও যেন একদিন মৃত্যুর ভয়কে অতিক্রম করিতে পারি। এবং এই কর্মযোগে যেন আমাদের সত্যের দৃষ্টি অবিচল থাকে, জ্ঞান পূর্ণ হয় এবং মানুষের প্রতি ভালবাসা কখনও মলিন না হয়, অর্থাৎ ভক্তিও অমলিন থাকে। কর্মযোগই যেন সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান এবং ভক্তির শিখরে আমাদিগকে লইয়া যায়।

অহিংস সহযোগের স্বরূপ

স্বরাজের অর্থ কি ?

অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে গান্ধীজীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইয়াছিল যে, তিনি স্বরাজ বলিতে ঠিক কি বোঝেন তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন না। দুইবৎসর পূর্বে এই বিষয়টি উল্লেখ করিয়া গান্ধীজী "হরিজন" পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন :—

> এক সময়ে আমি বলিয়াছিলাম—চরকার মধ্যে স্বরাজ লুকায়িত আছে। তাহার পর ইহাও বলিয়াছিলাম যে, মাদকতা বর্জ্জনের নাম স্বরাজ। ষোলআনা স্বদেশীর প্রবর্ত্তন করিলে যে স্বরাজ হইবে, এমন কথাও আমি বলিয়াছি। একটি গল্প আছে, কয়েকজন অন্ধ ব্যক্তি একটি হাতীর নিকট গিয়া তাহাকে নানাভাবে বর্ণনা করিয়াছিল। আমাদের স্বরাজের বর্ণনাও যেন তাহারি মত। প্রত্যেক সংজ্ঞা আংশিকভাবে সত্য কিন্তু কোন সংজ্ঞার মধ্যেই পূর্ণ সত্য নিহিত নাই।

গান্ধীজী নিজে যখন এমন কথা বলেন, তখন তাঁহার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ হইবে তাহাতে সন্দেহ কি ? কিন্তু এই অস্পষ্টতা গান্ধীজীর ব্যক্তিগত বুদ্ধির দোষে হয় নাই, ইহা বলাই আমাদের উদ্দেশ্য। ব্যক্তিগতভাবে আমাদের মনে হয় গান্ধীজী মাত্র দুইবার বা তিনবার স্বরাজের পূর্ণতম সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, অর্থাৎ মানুষের সীমাবদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা যতদূর বলা সম্ভব ততদূর বলিয়াছেন। ১৯২০ সালে ৮ই ডিসেম্বর "ইয়ং ইণ্ডিয়ায়" তিনি লিখিয়াছিলেন,—

> নিজের উপরে পূর্ণ শাসনের ক্ষমতা লাভের নামই স্বরাজ। মোক্ষ বা মুক্তি হইতে স্বরাজ অভিন্ন।

আরও একবার তিনি লিখিয়াছিলেন,—

আমার মনে হয়, স্বরাজলাভের জন্য চেষ্টা বা সাধনাই প্রকৃত স্বরাজ। আমরা যতই অগ্রসর হই না কেন, আমাদের পূর্ণ আদর্শ যেন আরও দূরে সরিয়া যায়।

যতই আমরা সাধন পথে অগ্রসর হই ততই আমরা যে কত অকিঞ্চিৎকর তাহা উপলব্ধি করিতে পারি। কিন্তু আমাদের সাধনাতেই আনন্দ, সিদ্ধিলাভে নহে। পরিপূর্ণ শক্তিতে সাধনা করাও যাহা পরিপূর্ণ সিদ্ধিলাভ করাও তাহাই। সাধনাই প্রকৃত সিদ্ধি।

সাধনার ধারা

গান্ধীজীর বিশেষত্ব হইল তিনি ভারতবর্ষের জনগণের পক্ষে মোক্ষলাভের জন্য একটি সাধনার ধারা নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। কবে আমাদের দেশের শাসনভার আমাদের করায়ত্ত হইবে, তাহার সন তারিখ না বলিয়া তিনি বলেন আমাদের জাতীয় চরিত্রে যে সকল দোষ বিরাজ করিতেছে, আমরা যেদিন তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারিব, সেইদিন আমাদের স্বরাজ লাভ হইবে। তাহা আজও হইতে পারে, সাধনা স্থগিত রাখিলে বা মন্থরগতি হইলে বহুদিন পরে হইতে পারে।

যে সকল সন্ন্যাসী যোগের মার্গ অবলম্বন করেন, তাঁহারা অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি নানাবিধ বিভূতি লাভ করেন বলিয়া শোনা যায়। গান্ধীজীর মতে আমাদের স্বরাজ সাধনার পথেও তেমনি নানাবিধ বিভূতি লাভ হইবে। জাতীয় স্বাধীনতা, অর্থাৎ রাষ্ট্রের শাসনাধিকার প্রভৃতি সেই সকল বিভূতির পর্য্যায়ে পড়ে। সেইজন্য গান্ধীজী বিভূতিলাভকে স্বীয় লক্ষ্য না করিয়া মোক্ষ বা পরম মুক্তিকে, অর্থাৎ যে মুহূর্তে মানুষ স্বীয় আমিত্ব বর্জন করিয়া সমগ্র মানবজাতির প্রেমে পূর্ণ হইয়া যাইবে, তাহাকেই নিজের লক্ষ্য বলিয়া বিবেচনা করেন। শেষ লক্ষ্য ঠিক রাখিলে

মধ্যপথে স্বাধীনতারূপ বিভূতি লাভ আমাদের পক্ষে অনিবার্য। আমাদের একমাত্র লক্ষ্য যেন ইহাই হয়, কি করিয়া আমাদের সকল আচরণ, সব চিন্তা, সমগ্র মানবের কল্যাণে নিয়োজিত হয়। তাই একবার গান্ধীজী বলিয়াছিলেন,—

> সমগ্র জাতির জন্য আত্ম বলিদান করিবার জন্য প্রস্তুত হইবে বলিয়াই যেন ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে।

I want India to be free so that she can die for humanity.

১৯৩৩ সালে জওহরলালজীর সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর যে পত্রব্যবহার হয়, তাহার মধ্যে গান্ধীজী লিখিয়াছিলেন,—

> আপনি লক্ষ্যের সম্বন্ধে আমার কাছে স্পষ্ট নির্দেশ চাহিয়াছেন। কিন্তু একবার তাহার সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করিয়া লওয়ার পর আর তাহা বারবার জনসমক্ষে জ্ঞাপন করার প্রয়োজন বোধ করি না। তাহার কি দরকার? কোন্ উপায়ে সেই লক্ষ্যে পৌঁছানো যাইবে, আমি কেবল তাহাই ভাবি। মানুষ কি করিয়া সেই সাধনার পথে উত্তরোত্তর অগ্রসর হইবে, তাহাই আমার চিন্তার বিষয়। আমার ধারণা, সাধনার উপরেই যদি আমরা সব চিন্তা নিয়োগ করি, তাহা হইলে সিদ্ধিলাভও সেই পরিমাণে নিকটবর্ত্তী হয়।

(Selection from Gandhi, P 37)

শেষ লক্ষ্য মুক্তি বা মোক্ষ বলিলেও গান্ধীজী পথিমধ্যে অর্থাৎ সাধনপথে আমাদের কি কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য সে সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্দেশ দিয়া থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, গান্ধীজী মনে করেন বর্ত্তমান জগতের ধনবৈষম্যের মূল কারণ হইল মানুষের স্বার্থপরতা। স্বার্থপরতা সমগ্র মানবের প্রতি প্রেমের পরিপন্থী। তাহা হইতে মুক্তি পাইতে হইলে সকল মানুষের পক্ষে শারীরিক শ্রমসাধন করিয়া অন্নের

সংস্থান করা কর্তব্য। এই শ্রম চাষবাস সংক্রান্ত কোনও কার্যে হইলে ভাল হয়। গান্ধীজী নিত্য অঙ্গশ্রমকে মানুষের পক্ষে অবশ্যপালনীয় ধর্ম বলিয়া বিবেচনা করেন। এবং তিনি বলেন যে যদি মানুষ ইহা পালন করে তাহা হইলে যোগের বিভূতি লাভ স্বরূপ মানবসমাজও সাম্যের বিভূতি লাভ করিবে।

অহিংস অসহযোগের স্বরূপ

১৯২১ সালে এবং ১৯৩১ সালেও গান্ধীজীর বিরুদ্ধে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে তিনি বিপ্লবের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে নারাজ। এ কথা আংশিকভাবে সত্য। কিন্তু ইহার কারণ এরূপ নহে যে তিনি নিজে বেশিদূর যাইতে ভয় পান। আসল কারণ হইল, যাহারা যুদ্ধ করিবে তাহাদের শক্তির পরিমাণ বুঝিয়া তিনি ব্যবস্থা করেন। সৈনিকের শক্তির অতিরিক্ত কোনও সাধনা তিনি কখনও আরোপ করেন না। ১৯২০ সালে ৮ই আগষ্ট তিনি লিখিয়াছিলেন,

অসহযোগ আন্দোলনের শেষ পর্বে শিক্ষিত অপেক্ষা সাধারণ জনগণের দায়িত্ব বেশি। তাহারাই আমাদের ভরসাস্থল।

অশিক্ষিত কারিগর, দেশের নারীশক্তি এবং সাধারণ লোক আজ আন্দোলনে যোগ দিয়াছে। আমরা প্রথমে শিক্ষিত সম্প্রদায়কেই ডাক দিয়াছিলাম। সংগ্রামের আহ্বান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর দিয়া আজ অশিক্ষিত জনগণের নিকট পৌঁছিয়াছে। সেইজন্যই শিক্ষিত জনগণকে আগে ডাকিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কে কোন্ দলে থাকিবে, তাহা আগে বাছাই করিয়া লওয়ার প্রয়োজন ছিল। এই পরীক্ষা অতিশয় প্রয়োজনীয় বলিয়া আমাদের আন্দোলন প্রথমে শিক্ষিত সম্প্রদায়কে লইয়াই আরম্ভ হইয়াছিল।

• অহিংস অসহযোগের মূল কথা হইল দুঃখ বরণের পথে আমাদিগকে অগ্রসর হইয়া সিদ্ধিলাভ করিতে হইবে। শিক্ষিত সম্প্রদায়কে যে কাউন্সিলের এবং খেতাবের

মোহ ছাড়িতে বলা হইতেছে, অথবা স্কুল কলেজ এবং আইন আদালতের সুবিধা বর্জন করিতে বলা হইতেছে, তাহা আত্মত্যাগের সামান্য একটি মাত্রা ভিন্ন আর কি? ঐ আত্মত্যাগের পরে আমাদের আরও অনেক দূর অগ্রসর হইতে হইবে। কারার দুঃখবরণ, এমন কি হয়ত ফাঁসির কাঠেও আমাদিগকে ঝুলিতে হইবে। আমাদের মধ্যে যত বেশি লোক, যত অধিক ত্যাগ স্বীকার করে এবং যত অধিক দুঃখ বহন করে, আমরা ততই স্বীয় লক্ষ্যের নিকটবর্তী হইব।

১৯২৪ সালে জাতীয় বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষক মহাত্মা গান্ধীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,

কতদিন পর্যন্ত দুর্ভিক্ষপীড়িতের মত সামান্য বেতন লইয়া আমাদের কাজ করিতে হইবে?

গান্ধীজী উত্তর করিয়াছিলেন,—

যতদিন না তোমাদের মৃত্যু ঘটে। সৈনিকের পক্ষে জয়লাভও যা মৃত্যুও তাহাই। মৃত্যুই তাহার বিজয়তিলক।

মহাত্মা গান্ধী কি বিপ্লবে বিশ্বাস করেন?

কয়েক সপ্তাহ পূর্বে বন্ধুবর বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় দেশপত্রিকায় "গান্ধী কি রিফর্মিষ্ট" নামে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তিনি ঠিকই বলিয়াছিলেন যে অনেকে এসম্বন্ধে ভুল ধারণা পোষণ করে। যিনি সিদ্ধিলাভের জন্য মৃত্যু বরণ করিতে কাতর নহেন এবং যিনি প্রতি সৈনিককে সাধন পথে মৃত্যু বরণ করিতে প্ররোচিত করেন তিনি ত' সামনের বিপদ দেখিয়া শঙ্কিত হন না, পরাজয় স্বীকার ত' তাঁহার কোষ্ঠীতে নাই। মৃত্যু অপেক্ষা আর বড বিপ্লব কি হইতে পারে? যিনি বাহিরে সংঘাত পাইয়া স্বীয় কর্মপন্থাকে সঙ্কীর্ণ করিয়া লন, অধিক অগ্রসর হইতে ভয় পান, যতটুকু নিরাপদে যাওয়া যায় ততটুকু গিয়া সন্তুষ্ট থাকেন তিনি রিফর্মিষ্ট হইতে পারেন। কিন্তু গান্ধীজীর মতে অগ্রসর হওয়া বাহিরের

কোনও অবস্থাবৈগুণ্যের উপর নির্ভর করেনা। তাহা সম্পূর্ণ নির্ভর করে নিজের অন্তরের বলের তারতম্যের উপর। এবং গান্ধীজী মনে করেন বাহিরের ঘাত প্রতিঘাতের সহিত সম্পর্ক না রাখিয়াই মানুষের অন্তরের বল বৃদ্ধি পায়। তাহা কেবল মানুষের আত্মশুদ্ধি এবং ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীলতার উপর নির্ভর করে। ইহাই গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগের মূল কথা। আমাদের অন্তর যত দোষমুক্ত হয় বাহিরেও তত সামাজিক বিভূতি বা সমৃদ্ধি আমরা লাভ করিয়া থাকি। আমাদের শেষ লক্ষ্য হইল মোক্ষ বা সম্পূর্ণ দোষশূন্যতা। তাহার জন্য প্রয়োজন হইলে মৃত্যু বরণ করিতে গান্ধীজী কুণ্ঠিত নন, অপরকে সে পথে প্রেরণ করিতেও তিনি পশ্চাৎপদ হন না। কেবল সাধকের শক্তি সামর্থ্য অনুসারে তিনি তাহাকে অগ্রসর হইতে বলেন। সেইজন্য তিনি কয়েকবার অসহযোগ আন্দোলনকে বিপ্লব বলিয়া বর্ণনা করিলেও তাহাকে evolutionary revolution আখ্যা দিয়াছিলেন। তাহা মূলতঃ বিপ্লব, রিফর্মিসম্ নহে। তাহার মূলে বাহিরের কাছে পরাজয় নাই, অন্তরের দুর্বলতা স্বীকার করিয়া সেইমত কর্মপন্থা নির্ধারণ করার ব্যবস্থা রহিয়াছে।

The movement of Non-co-operation, if it may be considered a revolution, is not an armed revolt, it is an evolutionary revolution, it is a bloodless revolution. The movement is a revolution of thought, of spirit. Non-co-opertion is a process of purification, and as such, it constitutes a revolution in one's ideas. (30. 2. 1921)

The nations have progressed both by evolution and revolution. The one is as necessary as the other. Death, which is an eternal verity, is revolution as

birth and after is slow and steady evolution. Death is as necessary for man's growth as life itself. God is the greatest Revolutionist the world has ever known or will know. He sends storms where a moment ago there was calm. He levels down mountains which He builds with exquisite care and infinite patience."

(2. 2. 1922)

উপসংহার

ইহাই মহাত্মা গান্ধীর মূল কথা। বাহিরের ঘোর অন্ধকার দেখিয়া ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নাই। ভিতরে যদি আমাদের আশার প্রদীপ জ্বলিতে থাকে এবং অন্তরের আলস্য, অবসাদ অথবা কর্মে অপটুতার প্রাচীর ভেদ করিয়া যদি তাহার শিখা আরও প্রজ্বলিত হইয়া উঠে তবে বাহিরের অন্ধকারকে যে তাহা অবশেষে পরাস্ত করিবেই করিবে এবিষয়ে সন্দেহ নাই। আমাদের লক্ষ্য যেন ইহাই থাকে, অন্তরের দোষে যেন অন্তরের অগ্নি নির্বাপিত না হয়।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব। অল্পদিন পূর্বে জনৈক ব্যক্তি গান্ধীজীর সহিত সেগাঁও গ্রামে সাক্ষাৎ করিতে যান। তিনি গান্ধীজিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,

আপনি কি আনন্দে আছেন?

গান্ধীজী বলিয়াছিলেন—

আমি সম্পূর্ণ আনন্দে আছি।

এই গ্রামের বাহিরে যখন ছিলেন, তাহা অপেক্ষা কি এখন বেশী সুখে আছেন।"

তাহা আমি বলিতে পারি না, কেননা আমার সুখ বাহিরের কোনও বিষয়ের উপর নির্ভর করে না।" (৮।৮।১৯৩৬)

ইহা স্মরণ রাখিয়া যেন আমরা সম্পূর্ণ আত্মস্থ হইয়া জীবনের কর্মের প্রবাহকে অপ্রতিহত ও বীর্য্যে পরিপূর্ণ রাখিতে সমর্থ হই, ইহাই আমাদের প্রার্থনা হউক।

গান্ধীজীর ধর্মতত্ত্ব

সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্য কি?

মানুষের জীবনে নানারকম দুঃখ আছে। রোগ, শোক, পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ প্রভৃতির জন্য মানুষ দুঃখ পায়। মানুষের সব দুঃখ একেবারে দূর করা যায় না বটে, তবে চেষ্টা করিলে লোভ, ক্রোধ, ভয়, ঈর্ষ্যা প্রভৃতির বশে এবং পরস্পরের প্রতি ব্যবহারের দোষে যে সকল দুঃখ জন্মায়, তাহার মধ্যে বেশির ভাগ কমানো যাইতে পারে। জগতে যত মহাপুরুষ জন্মিয়াছেন, তাঁরা অধিকাংশ, মানুষের দুঃখকে নানাভাবে দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এইখানেই তাঁদের মহত্ত্ব। সকলের চেষ্টা কিন্তু একরকম হয় নাই। কেহ লোককে সংশিক্ষা দিয়া, কেহ সমাজের মধ্যে নানাবিধ শাসনের ব্যবস্থা করিয়া, কেহ দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়া সংসারে দুঃখের ভার লাঘব করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সত্যাগ্রহ ইহারই মধ্যে একটি চেষ্টা।

দুঃখের কারণ কি?

ভারতবর্ষে অনেকদিন পূর্ব্বে জ্ঞানীরা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আচ্ছা, এই সব দুঃখের মূল কারণ কি? মানুষ কেন লোভ করে? কেন পরস্পরকে হিংসা-দ্বেষ বা ভয় করে?"

অনেক চিন্তার পর তাঁহারা কতকগুলি চমৎকার তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে মানুষের মনের মধ্যে নানাবিধ ভাব আছে, সেগুলি সবই স্বাভাবিক। প্রকৃতি যখন মানুষকে হাত পা দিয়া

সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তখন তাহার মনের মধ্যেও নানাবিধ ভাব জুড়িয়া দিয়াছিলেন। আমরা দেখিতে পাই যে, যদি দশজন লোক একসঙ্গে বাস করে, তাহা হইলে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে হিংসা-দ্বেষের জন্য অথবা স্বার্থনাশের ভয়ে মাঝে মাঝে কলহ-বিবাদ হইয়া থাকে। আবার তেমনই, সময়ে সময়ে তাহারা পরস্পরের প্রতি প্রীতির বশে মেলামেশা করে, নানাভাবে পরস্পরকে সাহায্য করে, পরস্পরের জীবনকে আরও সহজ ও মধুর করিবার চেষ্টা করে। সে সময়ে কেহ নিজের স্বার্থের দিকে না চাহিয়া অপরের সুখসম্পদের প্রতিই দৃষ্টি রাখে। তাহা হইলেই বুঝা যাইতেছে যে, মানুষের মধ্যে এমন সব প্রবৃত্তি আছে যার ফলে বিরোধ বাধায়, সঙ্কীর্ণতার বৃদ্ধি করে, আবার এমন সব প্রবৃত্তিও আছে যার বশে পরস্পরের মধ্যে মিলন ঘটে, ঐক্যের পুষ্টিসাধন হয়। প্রথম বৃত্তিগুলিকে ভেদকারী বৃত্তি বলা যাইতে পারে। কাম, ক্রোধ, ভয়, প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি ভেদকারী বৃত্তি. আর প্রেম, করুণা, সমবেদনা, দয়া-দাক্ষিণ্য, ভয়হীনতা প্রভৃতি মিলনকারী বৃত্তি।

এখন প্রশ্ন হইল, যদি একশ্রেণীর বৃত্তি খারাপই হয়, তবে প্রকৃতিদেবী মানুষের মনের মধ্যে তাদের স্থান দিলেন কেন। মানুষকে ত নির্দোষ করিয়া গড়িলেই পারিতেন? কিন্তু তা যখন করেন নাই, তখন আমাদের বুঝিতে হইবে সেরূপ বৃত্তির দরকার কি? এ বিষয়ে শুধু ভারতবর্ষে নয়, সব দেশেই অনেক চিন্তা ও আলোচনা হইয়াছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বলেন যে, কাম ক্রোধ প্রভৃতি বৃত্তি মানুষের বাঁচিয়া থাকার জন্য একান্ত প্রয়োজন, সেগুলিকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দিলে, মানবজাতি জগৎ হইতে লুপ্ত হইয়া যাইবে। ক্রমবিবর্তনে মানবজাতির সৃষ্টি হইয়াছে, এবং কাম, ক্রোধ ও আত্মরক্ষার সংস্কারগুলি মানুষ জন্ম-জন্মান্তর হইতে সঞ্চয় করিয়াছে। ভারতের পণ্ডিতগণ বহুকাল ধরিয়া বলিতেছেন যে,

সংস্কারগুলি মানুষ জন্ম-জন্মান্তর হইতে লাভ করিয়াছে। তবে জন্মান্তর সম্বন্ধে হিন্দু পণ্ডিতদের যেমন ধারণা, ইউরোপের ক্রমবিবর্তনবাদী পণ্ডিতদের ধারণা তাহা হইতে স্বতন্ত্র। যাহা হউক কেমন করিয়া ভেদকারী বৃত্তির উদয় হইয়াছে, তাহা লইয়া পণ্ডিতে পণ্ডিতে মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু সকলেই একটি কথা স্বীকার করেন যে, মানুষের বাঁচিয়া থাকার জন্য খানিক কাম, খানিক ক্রোধ, খানিক হিংসার দরকার আছে। অতএব ভেদকারী বৃত্তির প্রকৃত উদ্দেশ্য হইল, মানুষের শরীরকে ধারণ করিয়া রাখা।

এমন প্রশ্ন উঠিতে পারে, তাই যদি হয়, তবে কামাদি বৃত্তির বশে মানুষে মানুষে এত বিরোধ বাধে কেন? এই প্রসঙ্গে পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, যদি শুধু শরীর-ধারণের জন্য হিসাবমত কাম, ক্রোধকে ব্যবহার করা যায়, তবে মানুষে মানুষে বিরোধ বাধিতে পারে না। তাহাদের যাহা উদ্দেশ্য, তাহার সীমা অতিক্রম করিলেই গোলযোগ ঘটে। মানুষ চাষের সুবিধার জন্য মাঠে আল বাঁধে। কিন্তু আল ভাল জিনিষ বলিয়া যদি তাহাকে বাড়াইয়া প্রাচীরের মত করা হয় তবেই বিপদ। প্রয়োজনের অতিরিক্ত হইলেই মঙ্গলের পরিবর্তে অমঙ্গল ঘটায়। কিন্তু প্রেম প্রভৃতি মিলনকারী বৃত্তির স্বভাব অন্য রকমের। এইগুলি যদি অত্যধিক বৃদ্ধি পায়, তাহাতে কোন অমঙ্গল ঘটে না। এইগুলি ফুলের গন্ধের মত পদার্থ। যতই বাড়ুক না কেন, মনে আনন্দ বাড়ে বই কমে না।

উপরের আলোচনা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, মনের মধ্যে আমাদের যে সকল বৃত্তি আছে, সেগুলিকে যদি ঠিক নিজের বশে রাখা যায়, যে বৃত্তির যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই যদি তাহাকে খেলিতে দেওয়া হয়, তবে সংসারের বহু দুঃখ মিটিয়া যায়। কিন্তু যত গোল, ঐ বশে রাখা

লইয়া। মানুষ মনের বৃত্তিগুলিকে সচরাচর নিজের বশে রাখিতে পারে না, হয়ত বা লক্ষজনের মধ্যে এক আধ জন আছেন যিনি তাহা পারেন। অধিকাংশ লোক নিজের মনের বাসনার কাছে হার মানে, স্রোতে গা ঢালিয়া দেয়, বাসনাকে বশে আনিবার চেষ্টাই করে না। কেহ বা চেষ্টা করিয়াও বার বার বিফল হ'য়। বানের জল যেমনভাবে বাঁধের ফাটল দিয়া হু হু শব্দে ঢুকিয়া পড়ে, বাসনার স্রোতও তেমনই সকল বাধা অতিক্রম করিয়া মনকে অধিকার করিয়া বসে। ফলত হতাশ হইয়া শেষ পর্যন্ত তাহারা বাসনাকে সংযত করিবার চেষ্টা পরিত্যাগ করে। যতদিন না বার্ধক্যের বশে বাসনার তেজ আপনা হইতে ক্ষীণ হইয়া পড়ে, ততদিন স্রোতের মুখে হাল ভাঙ্গা নৌকার মত, তাহারা বাসনার-বন্যায় অবশ হইয়া ভাসিয়া চলে।

ইহা হইতে নিস্তারের উপায় কি

ইহা তো মঙ্গলের পথ নয়। পারি অথবা না পারি, বাসনাকে অধিকারে আনিবার চেষ্টা আমাদের করিতেই হইবে। আমাদের দেহ কখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারে না, কিন্তু তাই বলিয়া দেহকে সুস্থ রাখিবার চেষ্টা তো আমরা কখনও ত্যাগ করি না। শরীরের বেলাতে যখন এই, তখন মনের বেলায় আরও কত বেশী চেষ্টার দরকার। আমার শরীর অসুস্থ হইলে সংসারের যত ক্ষতি হয়, মন অসুস্থ হইলে তাহার চেয়ে কতই না বেশী ক্ষতি হয়। যাহাদের সহিত আমরা মেলামেশা করি, তাহাদের মনে ও আমাদের ব্যবহারের পিছনে যে কাম-ক্রোধ লুকাইয়া থাকে, তাহার আঘাতে কাম ক্রোধের উদয় হয়। আমার আচরণের মূল যদি ঈর্ষ্যা হয়, তবে আমারই মতন আর একজন ব্যক্তি তাহার উত্তরে ঈর্ষ্যারই আচরণ করিবে। ইহাতে সংসারের

অশান্তি-কোলাহল বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং কমিবার কোনও উপায় হয় না।

তবে উপায় কি ?

সেইজন্য গীতায় বলিয়াছেন,—

"যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥ (৬৷২৬)"

"চঞ্চল ও অস্থির মন যে যে বিষয়ে যাইবে ; (যোগী) সেই সেই বিষয় হইতে তাহাকে প্রত্যাহার করিয়া নিজের বশে রাখিবে।"

(গান্ধীজীর অনুবাদ)

গান্ধীজী এই প্রসঙ্গে একবার "ইয়ং ইণ্ডিয়া" পত্রিকায় বুদ্ধদেবের একটি উপদেশ আমাদের সকলের শিক্ষা ও অনুকরণের জন্য উদ্ধৃত করিয়াছিলেন।

When by reason of a phase of mind, there arise in a brother bad and wrong thoughts associated with appetite, hatred and delusion then he should divert his mind from that to another phase associated with what is right. If they still arise, then he should study the perils they entail, marking how wrong and depraved such thoughts are, and how they ripen into ill. If they still continue, he must bethink him how to allay all these modes and fashions of thoughts.

As he does so, the thoughts will pass away and

disappear, so that his heart stands firm, is steadfast, is focussed and concentrated And lastly, if allay as he may, these thoughts continue to rise, then with his teeth clenched and with his tongue pressed against his palate, he should by sheer force of mind, restrain, co-erce and dominate his heart. As he does so, these thoughts will pass away and disappear. He will think only such thoughts as he wishes and not those he wishes not to think. (Young India, 1926, P. 462).

যদি অবস্থাবিপর্যয়ে কোন ভ্রাতার মনে স্পৃহা, ঘৃণা, অথবা দেহ সংক্রান্ত ভাব আসে এবং কু অথবা অন্যায় চিন্তা তাঁহার মনকে অধিকার করিয়া বসে, তবে মন হইতে সেগুলিকে সরাইয়া যে ভাব মঙ্গলজনক তাহারি উপর মনকে নিবদ্ধ করিতে হইবে। যদি তাহাতে কু-চিন্তা দূর না হয়, তবে তিনি যেন ঐরূপ চিন্তার ফল কিরূপ বিষময় হইয়া থাকে, সে বিষয়ে ধ্যান করেন। তাহা সত্ত্বেও যদি চিন্তা বন্ধ না হয়, তবে কি উপায়ে এইরূপ চিন্তা বন্ধ করা যাইতে পারে, এ বিষয়ে তিনি যেন ভাবিতে থাকেন। তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে কুচিন্তাগুলি ধীরে ধীরে মন হইতে সরিয়া যাইবে এবং তাঁহার অন্তঃকরণ স্থির, দৃঢ় ও একাগ্র ভাব ধারণ করিবে। কিন্তু যদি এ উপায়েও কুচিন্তা বন্ধ না হয়, তবে দাঁতে দাঁত চাপিয়া, তালুতে জিহ্বা চাপিয়া, নিছক মনের জোরে জোর করিয়া যেন তিনি কুচিন্তা ঝাড়িয়া ফেলেন এবং হৃদয়ের উপর অধিকার বিস্তার করিয়া তাহাকে সংযত করেন। এইরূপে কুচিন্তা মন হইতে সরিয়া যাইবে এবং তিনি ইচ্ছামত বিষয়েই চিন্তা করিবেন। যে বিষয়ে ইচ্ছা নাই, সে বিষয়ের চিন্তা আর তাঁহার মনে বাসা বাঁধিতে পারিবে না।

সুদূরের প্রতি দৃষ্টি

কিন্তু মনের সঙ্গে যুদ্ধে সব সময়ে পারাও যায় না। সব সময়ে নিজের মনের বল তো যথেষ্ট নয়। অন্তরের দ্বন্দ্বের শেষে মন অবসাদগ্রস্ত হইয়া যায়, তখন তো সুযোগ পাইয়া কুভাব পুনরায় আসিতে পারে।

এ সকল বিষয় শুধু কথার কথা নয়। বস্তুত যাঁহারা সাধনায় রত তাঁহারা নিত্য এরূপ অবস্থায় পড়িয়া থাকেন। ইহা হইতে উদ্ধারের উপায় কি? মনের মধ্যে স্থায়ী বলের উপায় কি? গান্ধীজী বলেন, একমাত্র স্থায়ী উপায় হইল ঈশ্বরের কৃপালাভ। ঈশ্বরের কৃপা বিনা বাসনার উপরে স্থায়ী অধিকার আসিতে পারে না। "পরন্তু তাহার (বিষয়ের) মূল অর্থাৎ উহাতে যে রস (বাসনা) থাকে, তাহা ত, ঈশ্বর দর্শন হইলেই শান্ত হয়। যে ঈশ্বর সাক্ষাৎকারের রস পায়, সে অপর রসের কথা ভুলিয়া যায়' (অনাসক্তিযোগ, ২।৫৯ টিপ্পনী)। "ভক্তি বিনা—ঈশ্বরের সহায় বিনা মানুষের প্রযত্ন মিথ্যা" (অনাসক্তিযোগ, ২।৬১ টিপ্পনী)।

কিন্তু ঈশ্বরের কৃপা তো তাঁহার উপরেই নির্ভর করে। আমাদের দিক হইতে কৃপার অপেক্ষায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকা চলিতে পারে না, কিছু করিতে হয়। সেই কার্যটী কি?

গান্ধীজী এ বিষয়ে বলিয়াছেন যে, মূল কথা হইল মানুষের সেবা, তাহাদের প্রতি প্রেম। যদি সর্বদা সেই দিকে লক্ষ্য থাকে, তবে মনে কুভাব বা স্বার্থপরতা বাসা বাঁধিতে পারে না। "My creed is service of God and therefore of humanity"—"ভগবানের সেবা করাই আমার ধর্ম, অতএব মানবজাতির সেবাই আমার ধর্ম।" সমুদ্রে যখন জাহাজ ভাসে তখন তাহা অবিরাম দুলিতে থাকে। তাহার ফলে সমুদ্রযাত্রীদের রোগ হয়। কিন্তু এই রোগ হইতে মুক্তির উপায় বড় বিচিত্র।

জাহাজের এক প্রান্তে একটী চৌকিতে রোগীকে বসাইয়া বলা হয় তিনি যেন অন্য কোনও দিকে লক্ষ্য না করিয়া সুদূর চক্রবালরেখার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। জাহাজের প্রতি অঙ্গ দুলিতেছে, সমুদ্রের ঢেউ অবিরাম ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে, সবই সচল, তাহাদের প্রতি তাকাইলে শরীরের মধ্যেও স্থৈর্য থাকে না। কিন্তু সুদূরে স্থির চক্রবালরেখার প্রতি একাগ্রমনে ধ্যান রাখিলে, পারিপার্শ্বিক গতি হইতে মন সরিয়া গিয়া শরীরের মধ্যে শান্তি ও স্থিরতা আনিতে পারে। গান্ধীজীও এইভাবে বলেন যে, সংসারের স্বার্থদ্বন্দ্বের আবর্তের দিকে যদি আমরা দৃষ্টি রাখি, তবে তাহার ঘূর্ণীপাকে আমাদের চিন্তা জড়াইয়া পড়ে। মনের, বাক্যের ও চিন্তার স্থিরতা আনিতে হইলে, স্থিরভাবে সুদূর চক্রবালরেখার মত মানবের কল্যাণ, মানবজাতির প্রতি প্রেমের উপর একাগ্র ধ্যান রাখিতে হইবে। আমাদের প্রতি কার্যের, প্রতি বাক্যের প্রতি চিন্তার লক্ষ্য যেন হয়, মানুষের কল্যাণ, মানবের দুঃখের নিবৃত্তি, তবেই অন্তর শান্ত ও অটল থাকিতে পারিবে।

যদি অশ্রান্ত পরিশ্রমের দ্বারা জীবন ক্ষেত্রকে আমরা এইভাবে প্রস্তুত করিতে থাকি, তবেই হয়ত ভগবানের কৃপাবারি আমাদের অন্তরে আশীর্বাদের মত সিঞ্চিত হইতে পারে, ঈশ্বরের নিকটে আমরা জোর করিয়া কৃপালাভ করিতে পারি না।

ব্রত গ্রহণ

জীবনকে এইভাবে গঠন করা দরকার স্বীকার করিলে নিত্য আচরণের জন্যে কতকগুলি ব্রত গ্রহণ করিতে হয়। গান্ধীজী সবরমতী আশ্রমের কর্মীবৃন্দের জন্য সেই উদ্দেশ্যে কতকগুলি ব্রত স্থির করিয়া

গিয়াছেন। এই নিয়মগুলির আলোচনা করিলে আমরা গান্ধীজীর সাধনা ও ধর্মবিশ্বাসের বিষয় সম্যক্‌ভাবে বুঝিতে পারিব।

ব্রতগুলির মধ্যে অভয়, অহিংসা, সত্য, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ ও কায়িকশ্রমের নিয়মগুলি প্রধান। প্রথম কথা সকলের প্রতি প্রেমভাব বজায় রাখিতে হইবে, কাহারও প্রতি মনে বা বাক্যে ভেদজ্ঞানের বশবর্তী হইয়া আচরণ করার মানে তাহার প্রতি হিংসা প্রকাশ করা। যখনই আমরা অপরের ব্যবহারে বা মতে অসন্তুষ্ট বা বিরক্ত হই, তখনই বুঝিতে হইবে, তাহার প্রতি আমাদের প্রেমভাব আর অক্ষুণ্ণ নাই। অতএব সদাসর্বদা প্রেমভাব রাখিতে হইলে অহিংসার ব্রতকে অটুট রাখিতে হইবে।

"বহুর জন্য—দুনিয়ার জন্য যাহা প্রয়োজন, তাহা কাহারও নিজের অধিকারে বা কব্জার মধ্যে রাখাও হিংসা" (সার্বভৌম মহাব্রত, পৃ ১১)।

"পরমাত্মা পরিগ্রহ করেন না—আপনার জন্য আবশ্যক বস্তু প্রত্যহ উৎপন্ন করেন। যদি আমি তাঁহার উপর বিশ্বাস রাখি, তবে তিনিই আমার প্রয়োজনীয় জিনিস প্রত্যহ দিতেছেন ও দিবেন, ইহা নিশ্চয় জানিব। প্রকৃত ভক্তের ইহাই অনুভব।" (সার্বভৌম মহাব্রত, পৃঃ ২৮)।

অতএব সঞ্চয়বৃত্তি যখনই আমার মনকে অধিকার করে, তখনই আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস হারাই এবং সংসারে অপর কোন না কোন মনুষ্যকে বঞ্চিত করি। সেইজন্য অহিংসার ভাব অটুট রাখিতে হইলে, অপরিগ্রহের ব্রত গ্রহণ করিতেই হয়।

অপরিগ্রহের পর কায়িকশ্রমের ব্রত। পরের শ্রমের উপর জীবন ধারণ করিবার অধিকার কাহারও নাই। সুতরাং পরের দুঃখ লাঘব

করিবার জন্য এবং জগতের ঋণশোধ করিবার জন্য নিত্য নিয়মিতভাবে কায়িকশ্রম করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। কিন্তু সে শ্রম শুধু নিজের জন্য করিলেই চলিবে না। পরের নিমিত্তও কর্ম করিতে হইবে। কর্ম বিনা যখন আমরা বাঁচিতে পারি না, তখন যজ্ঞার্থে অর্থাৎ পরোপকারার্থে কর্ম করাই শ্রেয়। এই সম্পর্কে গান্ধীজী অনাসক্তিযোগের তৃতীয় অধ্যায়ে ৯ম ও ১২শ শ্লোকের টিপ্পনীতে যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের প্রণিধানযোগ্য।

"যজ্ঞ অর্থাৎ পরোপকারার্থে, ঈশ্বরার্থে করা কাজ" " দেবতার অর্থ ঈশ্বরের সৃষ্ট ভূতমাত্র। ভূতমাত্রের সেবা দেবসেবা এবং ইহাই যজ্ঞ।"

এরূপ যজ্ঞের বা কর্মের পিছনে মানবজাতি অথবা সমস্ত জীবজগতের প্রতি প্রগাঢ় প্রেম বর্তমান রহিয়াছে, অতএব তাহা অহিংসারই অপর এক প্রকাশ মাত্র।

জীবনকে এভাবে গড়িতে হইলে সদাসর্বদা নির্ভীকভাবে সত্য পথে চলিতে হয়। অহিংসাকেই যদি আমরা কাম্য ও জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠার যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করি, তবে যে বাক্যে, যে আচরণে, ও যে চিন্তায় অহিংসা প্রকাশিত হইল, তাহাই আমাদের কাছে সত্য অপর সব অসত্য। অতএব সদাসর্বদা সত্যের আচরণ করাই আমাদের মূল লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়।

এইরূপ সাধনায় গান্ধীজী স্বয়ং রত বলিয়া তিনি বলিতে পারিয়াছেন যে, "সত্যই ভগবান"—Truth is God. তিনি পূর্বে বলিতেন "ভগবানই সত্য", কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতা ও সাধনার পরিণতির সহিত তিনি বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, "সত্যই ভগবান।"

কিন্তু এইরূপ কঠোর পথে চলার শেষ কোথায়? গান্ধীজী এক জায়গায় বলিয়াছেন যে,—"আমি একটি সামান্য ব্যক্তি, যাহার একমাত্র

লক্ষ্য হইল কি করিয়া উচ্চে, আরও উচ্চে উঠিয়া নিজের সকল মলিনতাকে পরিহার করিতে পারি।" "সকলের অস্তিমে আমি কেবল ইহাই চাই, যেন সর্বশেষে আমি আমার স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে সম্পূর্ণরূপে শূন্যমাত্রে পর্যবসিত করিতে পারি, নিঃশেষে যেন আমার স্বতন্ত্র সত্তার লোপ সাধন করিতে পারি।"

ইহা অপেক্ষা বড় আকাঙ্ক্ষা সাধকের পক্ষে আর কি হইতে পারে? যিনি জীবনের মধ্যে কঠোর হইতে কঠোরতর ব্রতের অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে আত্মার চতুর্দিকে সঞ্চিত সমস্ত ক্লেদ, সব সংস্কারকে ভস্মীভূত করিয়া শেষে সেই আত্মাকেই সত্যের মধ্যে নিঃশেষে সমর্পণ করিতে চান, বিশ্বযন্ত্রীর হাতে যন্ত্রের মত না থাকিয়া, বরং তাঁহারই মধ্যে সম্পূর্ণভাবে লীন হইয়া যাইতে চান, তিনি অগ্রণী এবং আমাদের সকলের প্রণম্য ও আদর্শস্থানীয়, এ বিষয়ে আর কি সন্দেহ থাকিতে পারে।

সত্যাগ্রহের দার্শনিক ভিত্তি ও কৌশল

উইলিয়ম জেমস আমেরিকার একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। মানুষে মানুষে যুদ্ধ করে ইহা তিনি ভালবাসিতেন না। যুদ্ধের নানা দোষ, অথচ সংগ্রাম করিলে মানুষের অন্তরে সাহস, দৃঢ়তা, পরস্পরের সহিত সহযোগিতা, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি কতকগুলি গুণ বৃদ্ধি পায় ইহাও তিনি বুঝিতেন। সেই জন্য তাহার চেষ্টা ছিল মানুষে মানুষে সংগ্রাম বন্ধ করিয়া এমন কোনও উপায় বাহির করা যাহার দ্বারা যুদ্ধের সুফলগুলি মানুষের অন্তরে ফুটিয়া উঠে, অথচ যুদ্ধের ক্ষতি মানবসমাজকে ভোগ করিতে হয় না। তিনি এ বিষয়ে গভীর চিন্তা করিয়া একটি উপায় নির্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, মানবসমাজে সংগ্রাম বন্ধ না করিয়া যদি তাহার মোড় ফিরাইয়া দেওয়া যায় এবং মানুষের পরিবর্তে যদি নৈসর্গিক শক্তিপুঞ্জের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানো যায় তাহা হইলে এই সুফল ফলিতে পারে। একজন মানুষ বা এক দল মানুষ অপর দলের মুঠা হইতে খাদ্যসামগ্রী ছিনাইয়া না লইয়া যদি প্রকৃতিদেবীর কবল হইতে খাবার ছিনাইয়া লয় তাহা হইলে সব দিক দিয়া মঙ্গল হয়। প্রকৃতি সহজে মানুষকে খাইতে পাইতে দেয় না। ঝড়, বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, শীত, গ্রীষ্ম, বনের পশু, কীট, পতঙ্গ, রোগ, তাপ সবই মানুষের সহজ সুখের অন্তরায়। তাহাদের সঙ্গে যুঝিয়া মানুষকে বাঁচিতে হইবে। আগুন, জল, মেঘ, বিদ্যুৎ, সূর্যের কিরণ প্রভৃতির মধ্যে এমন অনেক শক্তি লুকানো আছে যাহা আজ আমাদের কোনও কাজে লাগে না। সেগুলিকে বুদ্ধির দ্বারা কাজে লাগাইতে হইবে। উইলিয়ম জেমসের কল্পনা ছিল, যদি এই সংগ্রামের অজুহাতে

জগতের সকল মানুষকে একতাবদ্ধ করা যায় তবে ক্ষাত্রধর্মের যে সুফল তাহা মানবচরিত্রে বিকশিত হইবে, কিন্তু মানুষে মানুষে লড়াইয়ের কুফল হইতে সমাজকে আর ভুগিতে হইবে না। উইলিয়ম জেমস ইহাকে "মর‍্যাল ইকুইভ্যালেণ্ট অব ওয়ার" নাম দিয়াছিলেন।

উইলিয়ম জেমস ১৯১০ সালে মারা গিয়াছেন। তাহার পর জগতে অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কিন্তু তাঁহার প্রদর্শিত পথ ব্যাপকভাবে কেহ গ্রহণ করে নাই, বরং মানুষে মানুষে যুদ্ধ বাড়িয়াছে, যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং জগতে দুঃখের ভার পরিমাণে হয়ত আরও বেশী হইয়াছে। সমগ্র মানবজাতি একতাবদ্ধ হইয়া প্রকৃতির শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করিলে ভাল হইত। কিন্তু সেই একতাবদ্ধ হইবার যে-শিক্ষা তাহা বচনে বা কর্মে কেহ মানুষকে শিখাইতেছে না। স্বার্থের দ্বারা অন্ধ হইয়া তাহারা পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়িতেছে এবং যাহারা এই সুযোগে দু-পয়সা কামাইয়া লয় এবং যাহারা জগতের অধিকাংশ রাষ্ট্রকে নিজেদের কবলে রাখিয়াছে তাহারা মানুষকে ভুল পথে চালিত করিতেছে। ঐক্যের শিক্ষা পাইয়া যাহাতে তাহাদের অন্ধত্ব না ঘোচে সে-বিষয়ে তাহারা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে। স্বার্থের বশে তাহারা নিজেই যখন অন্ধ তখন অপরের অন্ধত্ব তাহারা ঘুচাইবে কেমন করিয়া? ধুতুরার গাছে ধুতুরা ভিন্ন আর কি ফল ফলিতে পারে?

এমন অবস্থায় পড়িলে প্রকৃত সজ্জনের কি করা উচিত? মানব-সমাজ ছাড়িয়া বনে পলাইয়া গেলে ত চলিবে না। বনের মধ্যে একাকী থাকিয়া মানবের একত্বে বিশ্বাস করিয়াই লাভই বা কি? যে একত্বের বিশ্বাস সংঘাতের মধ্যে, বিরুদ্ধ শক্তির দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় জয়যুক্ত হয় না তেমন বিশ্বাসে সমাজের কি উপকার হইতে পারে? যে মাটির পাত্র এমন ঠুন্‌কা যে দশ জনের হাতে দিলেই তাহা ভাঙিয়া

যায়, তেমন পাত্রে সংসারের কয়জনের তৃষ্ণা নিবারণ করা যাইতে পারে ?

তাই সংসারে এমন একটি কৌশলের প্রয়োজন হইয়াছে যাহা সত্য-সত্যই "মর‍্যাল ইকুইভ্যালেন্ট অব ওয়ার" অর্থাৎ যুদ্ধের নীতিসিদ্ধ কৌশল বলিয়া গণিত হইতে পারে। যাহা দ্বারা শুধু যে মানুষের অন্তরে ক্ষাত্রধর্মের সুফল প্রস্ফুটিত হইবে তাহা নয় কিন্তু মানুষের অন্তরে সমগ্র মানবজাতির একত্বের বোধ ফুটিয়া উঠিবে, অথচ যে কারণে মানুষ মানুষের সহিত কলহ বা সংগ্রাম করে সে সকল ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ সমস্যারও ভাল সমাধান হইবে। এমন একটি যুদ্ধকৌশলের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে।

সত্যাগ্রহ এমনই একটি কৌশল। সত্যাগ্রহ ব্যক্তিগতভাবে জগতের ইতিহাসে কোন কোন মনীষী ব্যবহার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর পূর্বে এত বৃহৎ ক্ষেত্রে তাহা কখনও প্রযুক্ত হয় নাই। প্রায় এক-শ' বৎসর আগে হাঙ্গেরিতে অসহযোগ আন্দোলন হইয়াছিল। কিন্তু পুরা সত্যাগ্রহীর মনোভাব লইয়া বোধ হয় তাহা অনুষ্ঠিত হয় নাই। তাহার পর দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়গণের সহিত স্থানীয় রাজশক্তির সংগ্রামে ইহা ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষে ইহা ১৯১৭ সালে চম্পারণ জেলায় প্রযুক্ত হয়। তাহার পর ১৯১৭-১৮তে খেড়া জেলায়, ১৯১৮তে আমেদাবাদ কলের মজুরদের দ্বারা ইহা ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৯১৯ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি তারিখে গান্ধীজী রাউলট আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করেন। তাহার পর খিলাফৎ এবং পঞ্জাব-অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করিতে করিতে ১লা আগষ্ট ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলন সুরু হয়। ইহা ১৯২২ সাল পর্যন্ত চলিয়াছিল। ১৯২৪ সালে ভারতবর্ষের মধ্যে ভাইকম ও অমৃতসরে ধর্মসংস্কারের চেষ্টায়

সত্যাগ্রহ অনুসৃত হইয়াছিল। তাহার পর ১৯২৮ সালে গুজরাটে বারদোলিতে ব্যাপকভাবে চাষীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ইহা প্রযুক্ত হইয়াছিল। অবশেষে ১৯৩০-৩৩এর আইন-অমান্য আন্দোলনের সময়ে ইহা পুনরায় সারা ভারতবর্ষময় ছড়াইয়া পড়ে। ১৯১৭ এবং ১৯২৮এর আন্দোলনে সত্যাগ্রহিগণ পুরাপুরি জয়লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু ১৯০৬-১৩, ১৯২০-২২, ১৯২৪ এবং ১৯৩০-৩৩এর সংগ্রামে সত্যাগ্রহ সম্পূর্ণ সফল হয় নাই। তাহা সত্ত্বেও সত্যাগ্রহের দ্বারা ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে চরিত্রগত এত বেশি পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহারা পূর্বাপেক্ষা এত অধিক সচেতন, সাহসী এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে যে দেশ এখন পর্যন্ত স্বাধীনতা লাভ করিতে না পারিলেও ভবিষ্যতেব জন্য যে কতকাংশে তৈয়ারি হইয়াছে ইহা কেহ অস্বীকার করে না।

সেই সত্যাগ্রহের কৌশল আমাদের ভাল করিয়া শিখিতে হইবে। যে যুদ্ধের অস্ত্র ভারতবাসীরা আজ হাতে ধরিয়াছে তাহার ব্যবহার যদি ভাল করিয়া জানা না থাকে তবে সুফল অপেক্ষা কুফলই বেশি হইবার সম্ভাবনা, এবং হয়তো যুদ্ধের দ্বারা যতটা লাভ আমাদের সংগ্রহ করা উচিত অজ্ঞানের বশে আমরা তাহা হইতে বঞ্চিত হইব, সে ফল সম্যক্‌ভাবে সঞ্চয় করিতে পারিব না।

সত্যাগ্রহের প্রথম নিয়ম হইল প্রেম বা অহিংসা। আমাদের বুঝিতে হইবে যে মানুষ যদিও ভিন্ন ভিন্ন দেশে বাস করে, ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়, নিজের স্বার্থকে সমগ্র মানবজাতির স্বার্থ হইতে পৃথক করিয়া দেখে, তাহা আসলে ভুল দৃষ্টির বশে করে। এই জ্ঞান সত্যাগ্রহীর সমস্ত চেষ্টার মূলে থাকা চাই। ইহাতে বিশ্বাস হয়তো গোড়া হইতেই হইবে না, কিন্তু অন্তরে শুদ্ধ ও পরিপূর্ণ প্রেম এবং স্বার্থহীনতা বজায় রাখিয়া অগ্রসর হইলে প্রেমের পরিমাণও সত্যাগ্রহীর অন্তরে

বাড়িতে থাকিবে, অবশেষে সমগ্র মানবের স্বার্থ যে শেষ পর্যন্ত এক এই ধারণাও গভীরভাবে তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইবে। এই ধারণাটি সত্যাগ্রহীর পক্ষে থারমোমিটারের মত। সত্যাগ্রহযুদ্ধের মধ্যে যদি তিনি দেখেন, যুদ্ধ অবিরাম চালাইয়াও মানবের প্রতি প্রেম তাঁহার কমিতেছে না বরং বাড়িতেছে তবে তিনি ঠিক পথে চলিয়াছেন। আর যদি তাঁহার প্রেম কমে বা মানুষে মানুষে ভেদের বোধ বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ তাঁহার থারমোমিটারের অঙ্ক নীচের দিকে নামিতে থাকে, তবে তাঁহাকে বুঝিতে হইতে হইবে যে তাঁহার সত্যাগ্রহে কোথাও না কোথাও ভুল হইয়াছে। মানুষের ঐক্যে বিশ্বাস সত্যাগ্রহের ভিত্তি এবং সেই তত্ত্বের সম্যক্ উপলব্ধি এক হিসাবে সত্যাগ্রহীর লক্ষ্যও বটে।

সত্যাগ্রহের দ্বিতীয় ভিত্তি হইল এই যে মানুষ ও তাহার নির্মিত প্রতিষ্ঠান এক নহে। মানুষকে তাহার নির্মিত প্রতিষ্ঠান হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে হইবে। যে ইংরেজ আজ জগতে সব চেয়ে বড় সাম্রাজ্য গঠন করিয়াছে তাহার সাম্রাজ্যবাদ যতই অনিষ্টকর, যতই হীন হউক না কেন, সেই ইংরেজ জাতিকে তাহার হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান হইতে আলাদা করিয়া দেখিতে হইবে। সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস চাই, ধনতন্ত্রবাদের ধ্বংস চাই, কিন্তু যাহারা সেই প্রতিষ্ঠান চালাইতেছে সে-সব মানুষের নহে। কেননা, তাহারা যখন মানুষ তখন সত্যাগ্রহের দ্বারা আমরা তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারিব এবং তাহাদের হৃদয়ে ধনতন্ত্রবাদ এবং সাম্রাজ্য-বাদের মত সঙ্কীর্ণস্বার্থ প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা সুমহান ও কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার শুভ ইচ্ছা জাগাইতে পারিব এই ভরসা এবং এই আশা সত্যাগ্রহীর অন্তরে থাকা দরকার।

,সত্যাগ্রহীকে মানুষের মন লইয়া কারবার করিতে হয়। সকল যোদ্ধাকেই তাহা করিতে হয়, কেননা, জয়পরাজয় শেষ পর্যন্ত মানুষের

মনের ব্যাপার। সত্যাগ্রহী যেমন প্রথমত সমস্ত মানুষকে একজাতীয় বলিয়া বিবেচনা করেন, দ্বিতীয়ত, তিনি যেমন সকল মানুষকে শেষ পর্যন্ত ভাল করা যায় এই বিশ্বাস পোষণ করেন, তেমনই তিনি ইহাও একটি মূল নীতির মত মানেন যে, বুদ্ধির দ্বারা বা তর্কের দ্বারা মানুষের মনের সঙ্কীর্ণতা বা অন্ধত্ব ঘোচানো যায় না।

যে-ব্যক্তি সাম্রাজ্যবাদ চালাইতেছে, যাহার সহায়তায় ধনতন্ত্রবাদ জগতে কায়েমী হইয়া আছে, তাহার দৃষ্টি আজ ছোট হইয়া গিয়াছে। সে সমগ্র মানুষের একত্বে বিশ্বাস করে না, সমস্ত মানবসমাজের কল্যাণের যে শেষ পর্যন্ত একটিমাত্র পথ আছে তাহাও সে মানে না। নিজের শ্রেণীর স্বার্থকেই সে বড় করিয়া দেখে, তাহাতেই তাহার দৃষ্টির গগন ছাইয়া যায়। এই মোহগ্রস্ত অবস্থা হইতে মানুষকে বুদ্ধির দ্বার দিয়া উদ্ধার করা যায় না। কেননা, তাহার বুদ্ধি যতই তীক্ষ্ণ হউক না কেন, তাহা শুদ্ধ নয়। হৃদয়ে স্বার্থের সংস্কার দৃঢ়ভাবে রহিয়াছে বলিয়া তাহার বুদ্ধি এবং দৃষ্টিশক্তি সেই স্বার্থের প্রভাবে সঙ্কুচিত হইয়া যায়। তাহাকে মুক্ত করিতে হইলে তাহার হৃদয়ের উপরে স্বার্থের যে কঠিন আবরণ পড়িয়াছে সেই আবরণকে ভেদ করা দরকার।

মহাত্মা গান্ধী বলেন সত্যাগ্রহী স্বেচ্ছায় দুঃখবরণ করিয়া প্রতিপক্ষের মোহের আবরণকে বিদীর্ণ করিতে পারেন। সত্যাগ্রহী মানুষকে ছোট না ভাবিয়াও মানুষের তৈয়ারি প্রতিষ্ঠানকে ছোট ভাবিতে পারেন এবং তাঁহার সমস্ত শক্তি দিয়া তাহাকে ভাঙিবার চেষ্টা করিতে পারেন। ভাঙিতে গেলে স্বার্থান্ধ ব্যক্তিরা তাঁহাকে দুঃখ দিবে, শারীরিক কষ্ট দিবে। সেই দুঃখে যদি তিনি অবিচল থাকেন তবে তাঁহার স্বেচ্ছায় বরণ করা দুঃখ দেখিলে, সত্যাগ্রহীর অটল প্রতিজ্ঞার স্পর্শ পাইলে স্বার্থান্ধ মোহগ্রস্ত ব্যক্তির হৃদয়ে সহানুভূতি জাগিয়া উঠিবে এবং তাহার

বুদ্ধির উপরের আবরণ ছিন্ন হইয়া যাইবে। হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিলে তাহার বুদ্ধিকেও স্পর্শ করা যাইবে এবং সাম্রাজ্যবাদ এবং ধনতন্ত্রবাদ ভাঙিতে হয়তো আজ যাহারা সেই সকল প্রতিষ্ঠানকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে তাহাদেরই সহায়তা লাভ করা যাইবে। বুদ্ধির রাস্তা দিয়া বুদ্ধিকে স্পর্শ না করিয়া হৃদয়েব রাস্তা দিয়া মানবের বুদ্ধিকে স্পর্শ করিতে হইবে, ইহাই সত্যাগ্রহীর তৃতীয় এবং সর্বোত্তম নিয়ম।

সত্যাগ্রহের পথ দুঃখের পথ, তপস্যার পথ। কিন্তু সে দুঃখ হইল স্বেচ্ছায় বরণ করা দুঃখ এবং সত্যাগ্রহী জগতের দুঃখ দূর করিবার জন্য, মানুষের দৃষ্টি এবং বুদ্ধিকে স্বার্থের নাগপাশ হইতে মুক্ত করিবার জন্য, স্বার্থসংঘাতের মধ্যেও সমগ্র মানুষের একত্বের প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখিবার জন্য এই ব্রত গ্রহণ করেন। তাই সত্যাগ্রহীর নিকট স্বেচ্ছায় বরণ করা দুঃখ শেষ পর্যন্ত বিজয়তিলকের মত সুখদায়ী হইয়া উঠে।

তাঁহার অসহযোগের ফলে প্রতিপক্ষের সুখের নীড় যদি ভাঙিয়া যায়, যদি সে পরোক্ষভাবে দুঃখ পায়, তাহাতে সত্যাগ্রহী কখনও কাতর হন না। কিন্তু প্রতিপক্ষকে প্রত্যক্ষভাবে দুঃখ দিয়া, তাহাকে ভয় দেখাইয়া তিনি জয়লাভ করিতে চান না। তাহাতে প্রতিপক্ষের স্বার্থসংস্কার আরও দৃঢ় হইয়া যায়। যে সকল মোহের বশে সে শোষণের প্রতিষ্ঠানগুলি জগতে কায়েমী রাখিয়াছে, বিপদের সম্ভাবনায় সেই সকল প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাহার মমতা আরও বাড়িয়া যায় এবং সত্যাগ্রহীর পক্ষে স্থায়ীভাবে সেই প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিঃশেষ করা আরও কঠিন হইয়া উঠে। এই জন্য মহাত্মা গান্ধী প্রতিপক্ষকে বিপদে ফেলিয়াছেন এ ভাব কখনও দেখান না, তাহার হৃদয়ে যাহাতে সে ধারণা না জাগে বরং তাহারই চেষ্টা করেন। প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধাচরণ করেন, স্বতন্ত্রভাবে মানুষের নহে।

যদি কোন প্রতিষ্ঠানকে হিংসার অস্ত্র দ্বারা ভাঙা যায়, প্রতিপক্ষের অন্তরে যে মোহের বশে সেই শোষণকারী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেই বীজকে কিন্তু নষ্ট করা যায় না। বরং হিংসার যুদ্ধের দ্বারা আরও স্থায়ীভাবে সেই বীজ প্রতিপক্ষের অন্তরে গাঁথিয়া যায়। তাহা আবার অঙ্কুরিত হইয়া উঠিবার সুযোগ খোঁজে। ইহাকে গান্ধীজী স্থায়ী প্রতিকার বলিয়া বিবেচনা করেন না। শোষণের বীজ মানুষের অন্তরে নিহিত আছে। তাহা প্রতি নবজাত শিশুর সহিত প্রত্যহ জগতের ক্ষেত্রে সঞ্জাত হইতেছে। স্বার্থের বুদ্ধি যে কেবলমাত্র শ্রেণীবিশেষকে আশ্রয় করিয়া আছে এবং একবার তাহাদিগকে হিংসার অস্ত্রের দ্বারা শাসনে আনিতে পারিলেই যে জগতের সমস্যার সমাধান হইবে তাহা নহে। চিরকাল মানুষকে মানব-অন্তরে অবস্থিত স্বার্থের বীজের সহিত সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হইবে। যথোচিত শিক্ষার দ্বারাই ইহা সম্ভব। শোষণ-বিহীন প্রতিষ্ঠান রচনার দ্বারা তাহা স্থায়ী করিতে হইবে। সমাজ-তন্ত্রবাদিগণ এক্ষেত্রে বলেন, "হাঁ শিক্ষার নিত্য প্রয়োজন তো আছেই। কিন্তু আমাদের সে শিক্ষা দিবার সুযোগ কোথায়? যাহারা রাষ্ট্রকে অধিকার করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের হিংসার অস্ত্রের দ্বারা আগে সরাইয়া তারপর আমরা শিক্ষার আয়োজন করিব। এই উপায়ে সব চেয়ে কম যুদ্ধ করিয়া জগতের আর্থিক এবং সমাজব্যবস্থায় বিপ্লব আনিয়া সাম্যের প্রতিষ্ঠা করা যাইবে।" গান্ধীজী এই জায়গায় বলেন তাহাদের সরাইবার জন্যও হিংসার প্রয়োজন নাই, অহিংস অসহযোগের দ্বারা তাহা সম্পূর্ণভাবে সম্ভব, এবং এই উপায়ে রাষ্ট্রকে অধিকার করিতে পারিলে ভবিষ্যতে জগতে নিঃস্বার্থপরতার শিক্ষা দেওয়া আরও সুসাধ্য হইবে। বস্তুত অহিংস অসহযোগের সূচনা হইতেই সত্যাগ্রহী আচরণের দ্বারা মানুষকে সে শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ করেন।

গান্ধীজী মনে করেন হিংসার দ্বারা হিংসার বিনাশ সাধন করা যায় না। অহিংসার দ্বারাই হিংসা বিনষ্ট হয়, স্বার্থহীনতার দ্বারাই স্বার্থপরতাকে পরাহত করা যায়, ঐক্যে বিশ্বাসের দ্বারাই ভেদবুদ্ধির অবসান ঘটে। ইহাকেই তিনি সনাতন পথ বলিয়া বিবেচনা করেন।

ইহাই হইল সত্যাগ্রহের দার্শনিক ভিত্তি। এইবার আমরা তাহার কৌশলের সম্বন্ধে আলোচনা করিব। মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহের সম্বন্ধে বিভিন্ন কালে যে সকল নিয়ম রচনা করিয়াছেন আমরা একে একে সেগুলির আলোচনা করিব।

(১) সত্যাগ্রহীকে দুঃখ বরণ করিতে হইবে এবং কেন করিতে হইবে তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। দুঃখবরণ শেষ পর্যন্ত কোথায় দাঁড়ায় তাহা স্পষ্টভাবে জানা দরকার। গান্ধীজী বলিয়াছেন যে সত্যাগ্রহীকে অবশেষে মৃত্যুর দুয়ার পর্যন্ত আগাইতে হইবে। মরণের দাম দিয়া যাহা লাভ করা যায় তাহাই মূল্যবান। তাহার চেয়ে অল্প দাম দিয়া যে বস্তু লাভ করা যায় তাহার মূল্যও কম।

কিন্তু হঠাৎ মরণের জন্য কেহ প্রস্তুত হইতে পারে না। বর্তমান সমাজ আমাদের কতকগুলি সুখ-সুবিধা দেয়, কিন্তু সমগ্র মানুষের স্বার্থের দিকে চাহিলে আমরা বুঝিতে পারি যে শ্রেণীবিশেষ এই সুবিধা পাইলেও অধিকাংশ মানবকে শোষণ করিয়া সুবিধাগুলি আহরণ করা হয়। আমরা সত্যাগ্রহের দ্বারা এই সমাজব্যবস্থার বিনাশ সাধন করিবার চেষ্টা করিলে আমাদিগকে দুঃখ বরণ করিতে হয়। বর্তমান সমাজের দেওয়া সুখ-সুবিধাগুলি হাতছাড়া হইয়া যায় এবং নূতন দুঃখও মাথার উপর আসিয়া পড়ে।

গান্ধীজী বলেন, প্রথম হইতেই বৃহৎ দুঃখ চাহিয়া লইও না। এমন একটি বিষয় লইয়া সত্যাগ্রহ আরম্ভ কর যাহাতে প্রথমেই বৃহত্তম দুঃখ

আসিয়া না পড়ে। জনগণকে তোমার সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবে, অতএব অল্প দুঃখ হইতে বেশি দুঃখ, অল্প সাহস হইতে বেশি সাহসের পথে সকলকে লইয়া যাও। যে জনগণ বৃহৎ দুঃখের জন্য প্রস্তুত হয় নাই তোমার নেতৃত্বে হঠাৎ তাহাদের মাথায় বৃহৎ দুঃখের বোঝা নামাইও না। ক্রমবৃদ্ধিশীল দুঃখের পথে, তপস্যার পথে, সত্যাগ্রহী নিজে অগ্রসর হইবেন, অপরকে লইয়া যাইবেন।

ইহা সত্যাগ্রহের একটি মূল এবং প্রধান কৌশল। যিনি সত্যাগ্রহী তিনি স্বীয় অন্তরের সঙ্গে গোড়া হইতে যুঝিয়া মৃত্যুর ভয়কে অতিক্রম করিবেন, তাঁহার নিজের জন্য কোনদিনই দুঃখের সীমারেখা নির্দিষ্ট থাকিবে না। কিন্তু যাহাদের তিনি সাথী করিয়া লইতে চান তাহাদের যেন অসম্ভব দুঃখের মধ্যে হঠাৎ না ফেলেন। তাঁহার লক্ষ্য হইবে সেই জনগণকেও শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর ভয়কে অতিক্রম করিতে শেখানো। কিন্তু তিনি ক্রমশ সাধনার দ্বারা তাহাদিগকে সেই ভয় অতিক্রম করিতে শিখাইবেন।

১৯২০ সালে গান্ধীজী সকলকে কারাবরণ পর্যন্ত অগ্রসর হইতে বলিয়াছিলেন। ১৯৩০এ কিন্তু স্পষ্টভাবে বলিয়াছিলেন জোতজমি, সংসার-সম্পত্তি সবই আমাদিগকে খোয়া দিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও শুনাইয়া রাখিয়াছিলেন যে অপরকে না মারিয়া স্বেচ্ছায় মৃত্যু পর্যন্ত অগ্রসর না হইলে আমাদের দ্বারা মুক্তিলাভ সম্ভব হইবে না। এইভাবে ক্রমবৃদ্ধির পথে তিনি ভারতবর্ষের অধিবাসিগণকে স্বরাজ লাভের পথে আগাইয়া যাইতে বলেন।

কেহ কেহ বলেন যে গান্ধীজী বিপ্লবী নহেন, তিনি মডারেটগণের মত সংস্কারপন্থী। কিন্তু গান্ধীজী স্পষ্টতই বিপ্লবী, কেননা তিনি মৃত্যুর দাম দিয়া মূল্যবান স্বরাজ লাভ করিতে চান। মডারেটগণ একটি লাভ

হইতে বৃহত্তর লাভের চেষ্টা করেন। সে লাভ বৈষয়িক। গান্ধীজী একটি লোকসান হইতে বৃহত্তর লোকসানের দিকে জনগণকে লইয়া যান। তাহাতে বৈষয়িকভাবে লোকসান হয় বটে, কিন্তু অন্তরে মানুষের বল বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ বৈষয়িক না হইলেও আধ্যাত্মিক লাভ হইয়া থাকে। যথাসময়ে ইহার দ্বারা মানুষ জগতে সুখের নীড় গড়িয়া তুলিতে পারিবে এই আশা গান্ধীজী সর্বদাই পোষণ করেন।

অতএব সত্যাগ্রহ-বিপ্লবের প্রথম কৌশল হইল ইহা ক্রমবৃদ্ধির পথে মানুষকে ত্যাগ ও সাহসের এবং আদর্শবাদের শেষ পর্যন্ত লইয়া যায়।

(২) দ্বিতীয় নিয়ম হইল যে সত্যাগ্রহের সময়ে সত্যাগ্রহী যে দাবি করিবেন তাহা যেন কদাপি অন্যায় না হয়। শুধু তাহাই নয়। আমাদের ন্যায়সঙ্গত দাবি যদি চারি আনা হয় তবে সত্যাগ্রহী দুই আনা মাত্র দাবি করিয়া লড়াই করিতে থাকিবেন। কিন্তু সেই দুই আনা দাবির জন্য যে দিন লড়াই করা তাঁহারা স্থির করিবেন সেদিন হইতে যেন তাঁহারা পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখিলেও কিছুতেই দুই আনাকে ছাড়িয়া এক আনা না করেন অথবা আশু জয়ের উৎফুল্লতায় যেন দুই আনাকে বাড়াইয়া তিন আনার দাবিও করিয়া না বসেন। সেই যুদ্ধ যত দিন চলিবে তত দিন দুই আনার অতিরিক্ত বা কম আর কিছুই যেন তাঁহাদের দাবি না হয়। দাবি দুই আনা কি তিন আনা করিবেন তাহা স্থির করিবার পূর্বে তাঁহারা সহস্রবার চিন্তা করিবেন। কিন্তু একবার তাহা স্থির হইয়া গেলে কখনও সেই দাবি হইতে তাঁহারা আগাইবেনও না, পিছাইবেনও না। এ নিষ্ঠা সত্যাগ্রহীদের মধ্যে দৃঢ়ভাবে থাকা চাই।

দাবি স্থির করার ব্যাপারে তাঁহারা সর্বদা অল্পের দিকে থাকিতে চেষ্টা করিবেন ইহা সত্যাগ্রহ-সংগ্রামের দ্বিতীয় কৌশল।

প্রতিপক্ষ হয়তো বৃহৎ দাবিতে ভয় পাইয়া ছোট দাবি স্বীকার করিয়া

লইতে পারে। কিন্তু প্রতিপক্ষকে ভয় দেখানো, মানুষ হিসাবে তাহাকে আরও হীন করিয়া কিছু আদায় করিয়া লওয়া সত্যাগ্রহীর উদ্দেশ্য নয়। নিজেদের দাবি এমন হওয়া চাই যেন শত্রুতেও তাহা ন্যায়ত অস্বীকার করিতে না পারে। তাহা হইলে জগতের লোক সংবাদ পাইলে সত্যাগ্রহীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইবে এবং সত্যাগ্রহীদের নিজের মধ্যেও বাঁধন দৃঢ় থাকিবে, অন্যথা তাহা শিথিল হইবার সম্ভাবনা আছে।

(৩) সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজী আরও একটি সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করেন। তিনি বলেন অনেক সময়ে জনগণকে সত্যাগ্রহে উদ্বুদ্ধ করা কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। সেই সময়ে কেহ কেহ তাহাদের জাগরিত করিবার জন্য খাজনা বন্ধ বা অনুরূপ কোনও আন্দোলনে আহ্বান করিতে চান। খাজনা বন্ধের লোভে অর্থাৎ আশু লাভের আশায় উত্তেজিত হইয়া হয়তো জনগণ সত্যাগ্রহীর নেতৃত্ব স্বীকার করিতে পারে, কিন্তু গান্ধীজী ইহাকে সত্যাগ্রহীর পক্ষে ভুল পথ বলিয়া বিবেচনা করেন। যদি জনগণ ঠিক বুঝিয়া থাকে যে খাজনা বন্ধের ফলে তাহাদের জোত জমি, গরু বাছুর নিলাম হইয়া যাইবে, তাহাদের জেলে কঠিন কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে এবং বুঝিয়াও যদি তাহারা প্রস্তুত থাকে, অহিংসার সঙ্কল্পে অবিচল থাকে তবেই স্বরাজ লাভের জন্য খাজনা বন্ধের মত কঠিন পথে সত্যাগ্রহী নামিবেন। কিন্তু যদি জনগণকে জাগরিত করা যাইতেছে না বলিয়া সত্যাগ্রহিগণ শুধু সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বা প্রতিপক্ষকে ভয় দেখাইবার জন্য এইরূপ আন্দোলন করেন তবে সত্যাগ্রহ আর সত্যাগ্রহ থাকিবে না। অহিংসা বজায় থাকিবে না এবং জনগণের পক্ষে জয়ের পরিবর্তে অন্তে পরাজয়ের সম্ভাবনা বেশি হইয়া দাঁড়াইবে।

(৪) সত্যাগ্রহের আর একটি নিয়ম হইল সত্যাগ্রহী সর্বদাই প্রতিপক্ষের সহিত আপোষ করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। তাহার উপর

বিশ্বাস করা যখন সত্যাগ্রহ-কৌশলের একটি অঙ্গ, তাহারই সহায়তায় শোষণমূলক প্রতিষ্ঠান ভাঙা যখন সত্যাগ্রহীর লক্ষ্য, তখন প্রতিপক্ষ রফানিষ্পত্তির কথা বলিলেই সত্যাগ্রহীকে আগাইয়া যাইতে হইবে। গান্ধীজী ১৯২৪ সালে বলিয়াছিলেন, "একথা সত্য যে সময়ে সময়ে লোকে আমার বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়াছে। অনেকে আমাকে ঠকাইয়াছে এবং অনেকের মধ্যে যে শক্তি ছিল বলিয়া আমার ধারণা হইয়াছিল শেষ পর্যন্ত তাহার অভাব দেখিয়াছি। কিন্তু তাহাদের অবিশ্বাস করি নাই বলিয়া কোনও দিন আমার অনুশোচনা হয় নাই। আমি যেমন অসহযোগ করিতে জানি তেমনই অপরের সহিত সহযোগিতা বর্জন করিতেও পারি। আমার মনে হয় সংসারে কোনও লোককে অবিশ্বাস করার মত সাক্ষাৎ কোনও হেতু না থাকিলে তাহাকে বিশ্বাস করাই সব চেয়ে ভাল। তাহাতে কাজেরও যেমন সুবিধা হয় মানুষের প্রতি আমাদের অন্তরের বিশ্বাসও তেমনই প্রকটিত হয়। ইহার চেয়ে ভদ্র পথ আর কিছুই নাই।" "প্রতিপক্ষ যদি বিশ বার সত্যাগ্রহীর সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করে তবু সত্যাগ্রহী একুশ বার তাহাকে বিশ্বাস করিবে। কেননা, মানুষকে বিশ্বাস করিয়া ভাল করাই সত্যাগ্রহের মূল নীতি।"

ইহার দ্বারা শুধু যে মানুষের প্রতি সত্যাগ্রহী অন্তরের শ্রদ্ধা দেখান তাহা নয়, যুদ্ধকৌশল হিসাবেও এই নীতির বিশেষ মূল্য আছে। যদি প্রতিপক্ষের সহিত আপোষ নাও হয় এবং পুনরায় সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিতে হয় তাহা হইলে সমস্ত দোষ এবং দায়িত্ব প্রতিপক্ষের উপরে চাপানো যায়। ইহা যুদ্ধে কম লাভের কথা নয়। গান্ধীজী সত্যাগ্রহীকে সেই জন্য সর্বদা নিজে নির্দোষ থাকিতে বলেন, যেন দোষ কোথাও থাকিলে প্রতিপক্ষেরই হয় (Always place your adver-

sary in the wrong)। ইহাকে কৌশল হিসাবেও সত্যাগ্রহের অন্যতম নীতি বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে।

(৫) আমরা পূর্বে বলিয়াছি স্বরাজ লাভের জন্য জনগণকে শক্তি ও সংহতির পথে, ত্যাগ ও সাহসের পথে ক্রমে ক্রমে লইয়া যাইতে হইবে। ইহার জন্য যেমন ভারতব্যাপী অসহযোগ বা সত্যাগ্রহের মত বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের প্রয়োজন তেমনই আবার স্থায়ী সংগঠনমূলক কাজেরও প্রয়োজন আছে।

যিনি আইন-অমান্য বা বর্তমান প্রতিষ্ঠানের সহিত অসহযোগ করিয়া স্বরাজ লাভ করিতে চান তিনি যে কোন আইনই মানেন না ইহা সত্য কথা নহে। আইনের প্রতি বিরাগবশে যে তিনি আইন অমান্য করেন ইহা ভুল ধারণা। তিনি নৈতিক এবং কল্যাণকর আইনকে মানেন বলিয়াই অন্যায় এবং অকল্যাণকর আইনকে ভঙ্গ করার সাহস পোষণ করেন। সমগ্র মানুষের কল্যাণকর অবস্থা আনিতে চান বলিয়াই সাম্রাজ্যবাদ বা ধনতন্ত্রবাদের মত ক্ষুদ্রস্বার্থ প্রতিষ্ঠানের বিলোপ সাধন করিতে চান, এই কথাটি সত্যাগ্রহী যেন সর্বদা স্মরণ রাখেন। আইন-অমান্য বা সত্যাগ্রহে উচ্ছৃঙ্খলতার স্থান নাই। ইহা শুধু ভাঙার কাজ নয়। বৃহত্তর একটি নৈতিক জীবন গড়িয়া তুলিবার চেষ্টাতেই সত্যাগ্রহীকে ভাঙনের কাজও করিতে হয়, এবং এই নৈতিক ও কল্যাণকর আইন এবং প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার শিক্ষা গান্ধীজীর মতে বুদ্ধিমানের মত সংগঠনমূলক কাজের ভিতর দিয়াই সব চেয়ে সুচারুভাবে দান করা যায়।

সত্যাগ্রহ-সংগ্রামের মধ্যে সত্যাগ্রহী স্বীয় আচরণের দ্বারা যে-শিক্ষা ক্ষণিকের মধ্যে অপরকে দিয়া থাকেন, যুদ্ধের অবসরকালে ধীর গঠনমূলক কাজের ভিতর দিয়া তিলে তিলে মৌমাছির মধুসঞ্চয়ের মত

সাহস, ধৈর্য এবং নিয়মানুবর্তিতা জনগণের অন্তরে সঞ্চিত করিবেন, ইহা সত্যাগ্রহের পঞ্চম কৌশল। এসম্বন্ধে গান্ধীজী বলিয়াছেন, "আমি জানি অনেকে আইন-অমান্যের সহিত গঠনমূলক কাজের কোনও যোগ আছে বলিয়া স্বীকার করেন না। বারদোলির মত স্বল্পপরিসর ক্ষেত্রে যেখানে একটি বিশিষ্ট অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য সত্যাগ্রহ অনুষ্ঠিত হয় সেখানে পূর্ব হইতে গঠনমূলক কাজের প্রয়োজন নাই। কিন্তু স্বরাজের মত একটি অনির্দেশ্য এবং ব্যাপক বস্তুলাভের জন্য জনগণের পক্ষে সারা ভারতব্যাপী গঠনমূলক কাজের শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন। ইহার দ্বারা জনগণের সহিত নেতাদের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠভাবে স্থাপিত হয় এবং জনগণ নেতৃবৃন্দকে একান্তভাবে বিশ্বাস করিতে ও অনুসরণ করিতে শিখে। অবিরাম সংগঠনমূলক কাজ চালাইয়া এইভাবে পরস্পরের প্রতি যে বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতা জন্মায় তাহা সঙ্কটের সন্ধিক্ষণে একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়ায়। হিংসামূলক যুদ্ধে সৈন্যগণকে প্রস্তুত করিবার জন্য যেমন কুচকাওয়াজের আবশ্যক আছে, অহিংস সংগ্রামেও সংগঠনমূলক কাজের তেমনই প্রয়োজন আছে। যদি জনগণকে যথাযথভাবে তৈয়ারি করা না যায় তবে কয়েকজন সত্যাগ্রহী ব্যক্তিগত-ভাবে তাহাদের মধ্যে থাকিয়া আইন-অমান্য করিলেও কোন ফল হইবে না। যে নেতৃবৃন্দের প্রতি জনগণের বিশ্বাস উৎপন্ন হয় নাই, যাহাদের তাহারা চেনে না, এমন নেতার আদর্শ জনগণের মনে কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। এরূপ অবস্থায় ব্যাপকভাবে সত্যাগ্রহ অনুষ্ঠান করা অসম্ভব। অতএব আমরা সংগঠনমূলক কাজে যতই অগ্রসর হইতে থাকিব আইন-অমান্যের সম্ভাবনাও তত বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।"

(৬) গান্ধীজী সত্যাগ্রহের আয়োজন সম্বন্ধে আর একটি কথা

বলিয়াছেন তাহা আমাদের প্রণিধানযোগ্য। দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহের বিষয় বর্ণনাপ্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছিলেন, "আমার বিশ্বাস সত্যাগ্রহের মত যে-যুদ্ধে প্রধানত আত্মবলের উপর নির্ভর করিতে হয় সেখানে আন্দোলন চালাইতে হইলে একটি সংবাদপত্রের বিশেষ প্রয়োজন আছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়গণকে সত্যাগ্রহের বিষয় যথাযথভাবে শিক্ষা দিবার ব্যাপারে ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন নামক সংবাদপত্রখানি খুব উপকার দিয়াছিল। ইহার সাহায্যে ভিতরেও যেমন, আফ্রিকার বাহিরেও তেমনই সর্বত্র ভারতীয়গণকে আমরা সত্যাগ্রহের সম্বন্ধে সজাগ রাখিতে পারিয়াছিলাম। আন্দোলনের সাফল্য অনেকাংশে ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নের উপর নির্ভর করিয়াছিল। আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় হইল এই যে আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীর চরিত্রে যেমন পরিবর্তন সাধিত হইতে লাগিল ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নের পরিচালনায় ও চরিত্রেও তেমনই সমান তালে পরিবর্তন ঘটিতে লাগিল।"

(৭) নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার উপদেশ দিয়াও গান্ধীজী কিন্তু সর্বশেষে বলিয়াছেন, "সত্যাগ্রহ যুদ্ধের পরিবর্তে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহার শক্তি অপরিমেয়। তাই সত্যাগ্রহী ইহা সহসা প্রয়োগ করিতে ইতস্তত করেন। তিনি পূর্বে অন্য সমস্ত উপায়ে প্রতিপক্ষের সহিত নিষ্পত্তির চেষ্টা করিবেন। তিনি সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপক-ভাবে প্রচারকার্য চালাইবেন, যে কেহ তাঁহার কথা শুনিতে চায় তাহারই সহিত ধীরভাবে আলোচনা করিবেন। নিজের দাবি শান্ত-ভাবে পেশ করিবেন। এরূপ চেষ্টার ফলেও যখন কিছুতেই সমস্যার সমাধান হইবে না তখনই তিনি সত্যাগ্রহের অস্ত্র ধারণ করিবেন। অন্তরের মধ্যে একান্তভাবে যখন সত্যাগ্রহে অগ্রসর হইবার আহ্বান পাইবেন, যখন তন্তিন্ন উপায় আর অবশিষ্ট থাকিবে না, তখনই তিনি

এই পথ গ্রহণ করিবেন। কিন্তু একবার সত্যাগ্রহে নামিলে আর তাঁহার ফেরা চলিবে না।"

সত্যাগ্রহী সর্বদা হিংসাকে পরিহার করিয়া চলিবেন। মনে বচনে ও কর্মে তাহাকে পরিহার করিবেন। যখন চারিদিকে হিংসার ঘনঘটা দেখা দিবে তখন সত্যাগ্রহী পরাস্ত না হইয়া সহকর্মীদের হিংসা এবং প্রতিপক্ষের হিংসা, এই উভয় হিংসার মধ্যে শস্য যেমন করিয়া জাঁতার দুই চাকার মধ্যে পিষ্ট হয় তেমনই করিয়া পিষ্ট হইবেন। মেঘ যেমন নিজের সর্বস্ব দান করিয়া জল বর্ষণ করে তেমনই ভাবে নিজের সর্বস্ব দিয়া জীবনকে ধূলিমুষ্টির মত হেলায় ছাড়িয়া সত্যাগ্রহী মৃত্যুকে বরণ করিবেন। তবু তাঁহার হৃদয় হইতে প্রতিপক্ষের প্রতি মানুষ হিসাবে শ্রদ্ধা এক কণাও ক্ষুণ্ণ হইবে না। তবেই জগতের হিংসাকে অহিংসার দ্বারা জয় করা যাইবে, মানুষকে পশুর পদবী হইতে উচ্চতর পদবীতে লইয়া যাওয়া যাইবে। তাহার কম চেষ্টায় কিছু হইবে না।

চারিদিকে হিংসা ও ভেদবুদ্ধির ঘটা যতই ঘোর হইয়া আসিবে সত্যাগ্রহীর দায়িত্ব এবং কর্মতৎপরতা ততই বৃদ্ধি পাইবে।

সত্যাগ্রহের নিয়ম

(১)

আমরা যদি কোনও অন্যায় বা অত্যাচার দেখি অমনি আমাদের মনে তাহা দূর করিবার ইচ্ছা হয়। মানুষ মানুষকে শোষণ করিতেছে ইহা চারিদিকে দেখা যায় এবং আমাদের ইচ্ছা হয় কেমন করিয়া এই অবস্থা দূর করি। উপায় দু'টি আছে। এক, আমরা যদি অন্যায়কারীকে শাসন করি তবে মনে হয় অত্যাচার বন্ধ হইয়া যাইবে। দ্বিতীয় পথ হইল সত্যাগ্রহ নামে তপস্যার একটি পথ। দু'টিরই বিচার করা যাক।

ছোট ছেলে চুরি করিলে আমরা তাহার কান মলিয়া দিই ভয় দেখাই অথবা তাহাকে ন্যায় অন্যায় বুঝাইবার চেষ্টা করি, যেন সে আর চুরি না করে। ছোট ছেলের বেলায় শাসনের কৌশল খাটে বটে, কিন্তু সকল ক্ষেত্রে তাহাও খাটে না। বড লোকদের বেলায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রহারের দ্বারা কার্যসিদ্ধি হয় না। দেশে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, চাষীর ঘরে ভাত নাই, বীজধান পর্যন্ত সে ভানিয়া খাইয়া ফেলিয়াছে। কেহ কেহ তখন পেটের দায়ে চুরি করে। মারধর করিয়া কি মানুষের চুরি ছাড়ানো যায়? একজনের চুরি বন্ধ হইলেও আর একজন অনাহারী লোক চুরি করিবে। পুলিশের লাঠির শাসনে তো আর ক্ষুধার তাডনা বন্ধ হয় না। শাসনের দ্বারা গরীব লোককে ঠেকাইয়া রাখা যায় না।

মানুষ অবস্থার দাস। অবস্থার বিপাকে মানুষের মাথা খারাপ হইয়া যায়। অতএব চুরি সত্যসত্যই বন্ধ করিতে হইলে লোকে যাহাতে পরিশ্রম করিয়া পেট ভরিয়া খাইতে পায় তাহারই ব্যবস্থা করিতে হইবে, পেট ভরিয়া খাইতে পাইলে লোকে কেন শুধু শুধু চুরি করিবে?

শুধু গরিবের বেলায় যে কথাটি সত্য তাহা নহে। ধনিকদের বেলাতেও এ কথাটি সত্য। ধনিকেরা অপরকে শোষণ করে কিন্তু তাহারাও গরিবের মত অবস্থার দাস। জমিদারের ছেলে ছেলেবেলা হইতেই বসিয়া খাইতে শিখিয়াছে। প্রজারা যে খাজনা দেয় তাহার বাপ সেই পয়সায় তাহাকেই স্কুলে কলেজে পড়াইয়াছে, মোটর হাঁকাইতে শিখাইয়াছে, বিলাতে পাঠাইয়াছে। প্রজার নিকট হইতে জমিদার যে খাজনা আদায় করে বছরে দুইবার সেই খাজনার অংশ গবর্মেণ্টকে দিতে হয়। খাজনার কিস্তি কামাই গেলে জমিদারি লাটে চড়ে, জমিদার ভয় পায়। তাহার মোটর চড়া বন্ধ হইবে, মেয়ের শ্বশুরবাড়ী তত্ত্বতাবাস করিতে পারিবে না, ছেলের লেখাপড়ার খরচ যোগাইতে পারিবে না, মানীর মান যাইবে, এই কথা ভাবিয়া জমিদার মরিয়া হইয়া নায়েব গোমস্তাকে ডাকিয়া বলে, "যেমন করিয়া পার দু' আনা চার আনা আদায় কর।" নায়েব গোমস্তা গরিব লোক, তাহারা ভাবে জমিদার মরিলে তাহারাও মরিবে, অনাহারে তাহাদের স্ত্রীপুত্র কষ্ট পাইবে। অতএব সকল মমতা বিসর্জন দিয়া নিষ্ঠুর হইয়া তাহারাও চাষীর কাছে খাজনা আদায় করে। চাষী বাঁচুক আর মরুক, অন্তত তাহাদের নিজেদের চাকরি তো বজায় থাকিবে।

যে চাষীর দুই বিঘা জমি আছে সে হয়তো নিজে চাষ করে, কিন্তু যাহার দশ বিঘা সে মুনিষ মান্দের রাখিয়া লাভের চেষ্টা করে। সে ভাবে, "আজ নিজের হাতে লাঙ্গল ধরিতেছি। অল্প অল্প করিয়া যদি জমি বাড়াইতে পারি তবে একদিন পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া খাইব।" সেদিন রাস্তায় দেখি একজন রিক্সওয়ালা রিক্সতে বিস্তর মাল চাপাইয়াছে এবং সকলের উপরে একটি লোক বসিয়া আছে। সে কোনও বড়-লোকের বাড়ীর চাকর হইবে। রিক্সওয়ালাটি রিক্স টানিতে গলদ্ঘর্ম

হইতেছে, কিন্তু সেই চাকরের নড়িবার নাম নাই। আমি তাহাকে বকিতে তাহার লজ্জা হইল, সে নামিয়া পড়িল। কিন্তু আমি মনে মনে ভাবিলাম, এমনভাবে কয়জনকে ঠেকানো যায়? চতুর্দিকে তো খাই খাই রব।

ইংরেজ গবর্মেণ্ট ভাবিতেছে, দেশের জমিদার ও ধনীর কাছে খাজনা লইয়া কি করিয়া বিলাতের লোককে সুখী করি। জমিদার ভাবিতেছে কি করিয়া প্রজার কাছে পয়সা লইয়া মানীর মত বাস করি, ছেলেকে বিলাতে পাঠাইয়া মানুষ করি। চাষী ভাবিতেছে কি করিয়া দু'পয়সা জমাই, আর একদিন পায়ের উপরে পা দিয়া বসিয়া খাই। আর একেবারে যাহার কিছু নাই সে দিনের পর দিন মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতেছে, "এ দুঃখ হইতে কি নিস্তার নাই? বোধ হয় মরণই ভাল।" যে যাহাকে পারে শোষণ করিতেছে, যে পারে না সে হতাশায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে। এই তো জগতের অবস্থা। একদিকে দুর্জয় লোভ, আর একদিকে রোগ, দারিদ্র্য, হতাশা ও ভয়।

এমন অবস্থায় কি ধনিককে ঠেঙাইলেই সব শোধরাইয়া যাইবে? কিম্বা একবার আমাদের দেশের শাসনভার বা রাষ্ট্র ইংরেজের হাত হইতে, তাহাদের সেপাই-শান্ত্রী নায়েব-গোমস্তার হাত হইতে ছিনাইয়া লইতে পারিলেই কি গরিবের দুঃখ ঘুচিবে? যাহারা স্বাধীন ভারতকে শাসন করিতে বসিবে তাহারাই যে আর দু' দিন পরে শোষণ করিবে না, ইহার স্থিরতা কোথায়? এরূপ ঘটনা তো নিত্য ঘটিয়া থাকে।

অতএব আমাদের এই রোগের মূল কোথায় তাহাই বাহির করিতে হইবে এবং যদি চিকিৎসা করিতে হয় তবে মূল রোগ ধরিয়াই চিকিৎসা করিতে হইবে। অন্য সব চেষ্টাই বিফল।

ঋষি টলষ্টয় বলিতেন মূল গলদ মানুষের মনে।

শোষকের মনে লোভ, শোষিতের মনে ভয়। অধিকাংশ লোকই চায় পায়ে পা দিয়া বসিয়া খাইতে। আর যাহাদের মনে সে আশা নাই তাহারা শোষকদের অত্যাচারের ভয়ে চুপ করিয়া থাকে, শোষণ বন্ধ করিতে পারে না। এই কথা ভাবিয়া ঋষি টলষ্টয় বলিয়াছিলেন, "শোষণ করার অভ্যাসটি ছাড। পরের ঘাডে চাপিয়া ভূতের মত, পরগাছার মত বাঁচিয়া থাকিও না।" গান্ধীজীর গুরু টলষ্টয়। তিনিও সেই কথায় সায় দিয়া বড লোকদের বলেন, "তোমরা পরের ঘাডে চাপার অভ্যাসটি ছাড। টাকা গরিবের, তোমাদের নয়। সে টাকা তাহাদের জন্য খরচ কর।" আর গরিবদের বলেন, "তোমরা ভয় পাইও না। কাপুরুষের মত বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি? পেটের দায়ে পুলিশের বা জজ ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরি করা ভাল নয়। পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া খাইবে, এমন কথা মনে আনাও পাপ।" মধ্যবিত্তদের ডাকিয়া তিনি বলেন, "তোমাদের শোষণের ব্যবস্থা ছাড়, গরিবের সঙ্গে পরিশ্রম কর, তাহাদের সঙ্গে এক হইয়া যাও।" গরিবকে বলেন, "তোমরা ভয় পাইও না। মানুষের মত দাঁডাইয়া বড চাষী অথবা জমিদার বা গবর্মেণ্টকে বল, 'আমরা খাটিয়া খাইব, নিজে শোষণ করিব না, অপরকেও শোষণ করিতে দিব না। যতই মারধর কর না কেন, আমরা চাই জগতে সকলেই খাটিয়া খাইবে, উঁচু নীচু ভেদ থাকিবে না'।"

গান্ধীজী বলেন যদি শোষিতেরা প্রতিজ্ঞায় দৃঢ থাকে, মারধর করিলেও, জমি, বাডী নিলাম করিলেও বিচলিত না হয়, তখন বড চাষী দেখিবে শোষণ করিবার মত মুনিষ মান্দের পাওয়া যায় না, গবর্মেণ্টও দেখিবে সকলেই প্রতিজ্ঞায় দৃঢ, না খাইয়া মরিবে, জেলে যাইবে, তবু তাহাদের মাথা নুইবে না। গোমস্তা, নায়েব, পুলিশ, সেপাই,

জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট পাওয়া যায় না, কেননা গরিবেরা সব এক জোট হইয়াছে, কেহ শোষকশ্রেণীর ভিতরে আসিতে চায় না। এমন অবস্থায় ধনতন্ত্র ও গবর্মেণ্ট একেবারে অচল হইয়া যাইবে।

বড চাষী ছোট চাষীকে ডাকিবে, জমিদার বড় চাষীকে ডাকিবে, গবর্মেণ্ট জমিদারকে ডাকিবে। ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, "আচ্ছা তোমরা কি চাও তাই বল।" তখন উভয়ে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া জগতে একটা নূতন রাজত্ব গড়িবার চেষ্টা করিবে, যেখানে কেহ শোষক নাই, কেহ শোষিত নাই সকলেই নিজের ক্ষমতামত পরিশ্রম করে, সকলেই নিজের প্রয়োজনমত খাইতে পায়, পরিতে পায়, শিক্ষা পায়, ঔষধ পায়। এই হইল গান্ধীজীর দ্বিতীয় পথ, সত্যাগ্রহের পথ।

প্রথম উপায়ে আমরা শোষককে শাসন করিয়া রাষ্ট্রের ভার নিজের হাতে লইয়া জগৎ হইতে শোষণ ও অত্যাচার দূর করিতে চাই। শাসনের দ্বারা ধনীকে আমাদের কথা মানাইতে চাই। কিন্তু আমরা নিজেই যে চিরকাল ভাল থাকিব, শেষে গরিবকে ঠকাইব না, তাহার স্থিরতা কোথায়? আর এ পথে তো বরাবর শোষকের মাথার উপরে লাঠি উঁচাইয়া রাখিতে হইবে। দ্বিতীয় উপায়ে, আমরা শোষককে না ঠেঙাইয়া নিজেদের মন হইতে চেষ্টা করিয়া শোষণের প্রবৃত্তি, লোভ, ভয়, কাপুরুষতা সব ত্যাগ করি। নূতনভাবে জীবন গডিবার চেষ্টা করি। অমনি ধনীরা বাধা দেয়। সে বাধায় আমরা বিচলিত হই না। সব মারধর সহ্য করি, কিন্তু নিজের নবজীবনের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি না। ফলে একদিন ধনীকে নামিয়া আসিতে হয়। ধ্রুব বা প্রহ্লাদের মত আমাদের অটল প্রতিজ্ঞা দেখিয়া তাহারা বিচলিত হয়, তাহাদের শোষণের যন্ত্র বিকল হয়। তখন তাহারাও ভাবে, "আর তো চলে না, অন্য উপায় দেখা যাক।"

ইহাই সত্যাগ্রহের পথ। প্রথমটি যুদ্ধের পথ। গান্ধীজীর মতে সত্যাগ্রহ যুদ্ধের চেয়ে শ্রেষ্ঠ উপায়। অপরকে শাসন করিয়া নয়, নিজে নবজীবন রচনার প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় থাকিয়া, দুঃখ ও শাস্তি বরণ করিয়া জগতে শোষণ বন্ধ করিতে হইবে। রোগীর সর্বাঙ্গে যখন ফোড়া তখন কি শুধু ফোড়ার উপরে তোকমারি দিলে চলে? রক্ত পরিষ্কার করার জন্য তখন সালসা ব্যবহার করিতে হয়। ধনতন্ত্রবাদ একটি রোগ। মিলের মালিক ও মজুর, জমিদার ও প্রজা, শাসক ও শাসিত ইহাদের যে সম্পর্ক তাহা এই কলুষিত ফোড়ার মত। এই রোগের মূল মনে। মনের মধ্যে লোভ, ভয়, আলস্য রহিয়াছে, তাই জগতে চারিদিকে এই সকল ফোড়া দেখা দিতেছে। মূল রোগ মনে, অতএব মনেরই চিকিৎসা আরম্ভ করিতে হইবে। তাই গান্ধীজী আত্মশুদ্ধির কথা বলেন। সত্যাগ্রহে আমরা যে দুঃখকষ্ট মাথায় পাতিয়া লই তাহা মনে প্রাণে গ্রহণ করিতে পারিলে আত্মশুদ্ধি হয়, ধনতন্ত্রবাদ সমূলে বিনষ্ট হয়।

সত্যাগ্রহ তপস্যার পথ, আত্মশুদ্ধির পথ। এই তপস্যার উদ্দেশ্য মোক্ষ বা বৈকুণ্ঠলাভ নয়, ইহার উদ্দেশ্য জগতে সাম্যের প্রতিষ্ঠা। যাহাতে সকলে খাটিয়া খাইয়া পরিয়া সুখী হয়, সমাজে উচ্চনীচ ভেদাভেদ দূর হইয়া সকলে সুখী হয়, সত্যাগ্রহী সেই জন্যই তপস্যা করেন।

অতএব সত্যাগ্রহের প্রথম নিয়ম হইল জগৎ হইতে ধনতন্ত্রবাদ দূর করিতে হইলে ধনীকে শাসন করিয়া নয়, নূতন একটি শোষণবিহীন সমাজব্যবস্থা তৈয়ারির চেষ্টা গোড়া হইতেই করিতে হইবে। তাহার জন্য নিজেকেই শাস্তি মাথায় পাতিয়া লইতে হইবে। অপরকে শাস্তি দেওয়ার কথা সত্যাগ্রহী কদাপি ভাবেন না। মনের মধ্যে যে সকল মলিনতা থাকার জন্য ধনতন্ত্র জগতে রহিয়াছে তাহাতে যে শোষণমূলক প্রতিষ্ঠান জগতে গড়িয়া উঠিয়াছে অসহযোগের দ্বারা সমূলে বিনাশ

করিতে হইবে এবং ইহার জন্য শুধু আমরা নহে, যাহারা আমাদের ইতঃপূর্বে শোষণ করিতেছিল, তাহার শোষণযন্ত্র অচল করিয়া তাহার সৎবুদ্ধিকে জাগাইয়া উভয়ে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইয়া নূতন একটি শোষণ-বিহীন সমাজ গড়িতে হইবে।

(২)

যেখানে কোনও অন্যায় বা অত্যাচার ঘটে সেখানে সত্যাগ্রহের দ্বারা তাহা দূর করা প্রয়োজন। সত্যাগ্রহের দ্বিতীয় নিয়ম হইল যে যাহাদের উপরে সেই অত্যাচার হইতেছে তাহারাই সত্যাগ্রহ করিবে, বাহিরের লোক নহে। যদি কোন জমিদার প্রজার উপরে অত্যাচার করে তবে প্রজাকেই জমিদারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইবে, অন্যকে নহে। সে নিজে অসহযোগ ও দুঃখবরণ করিয়া জমিদারের শুভবুদ্ধি জাগাইবার চেষ্টা করিবে, ইহাই গান্ধীজীর অতি কঠিন আদেশ।

গান্ধীজী স্পষ্টভাবে রাজকোট সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে 'হরিজন' পত্রিকায় ২০-৫-১৯৩৯ তারিখে বলিয়াছিলেন যে সেখানে গোড়াতেই একটি ভুল করা হইয়াছিল। রাজকোটের যাহারা প্রজা নহে এমন লোককেও সেখানকার সত্যাগ্রহে যোগ দিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। বাহিরের বলের উপরে নির্ভর করিয়া সত্যাগ্রহ বেশিদিন চলে না। নিজেদের দুর্বলতা ঢাকিবার চেষ্টায় বড বড মিছিল বাহির করিয়া প্রতিপক্ষকে ভাঁওতা দিবার চেষ্টা করিলেও সত্যাগ্রহে কোন ফল হয় না। জমিদার ভাবে, "বাহিরের লোক আসিয়া গোলমাল বাধাইতেছে, প্রজারা তো আমার বাধ্যই আছে।" তাহার মন সহজে টলে না। তাহার চেয়ে অল্প কয়েক জন লোক যদি নিজেদের প্রতিজ্ঞায় অটল থাকিয়া সমস্ত শাস্তি মাথা পাতিয়া লয়, সত্যাগ্রহে তখন বেশি কাজ হয়।

যেখানে আত্মবলই প্রধান বল সেখানে কয়েকজন সত্যাগ্রহী যদি অটল থাকে তাহা হইলে ক্রমে তাহাদের দেখাদেখি আর দশজনের মনে জোর হয়।

আন্দোলনে বাহিরের লোকের উপর প্রধানত নির্ভর করিলে শুধু সেই কয়জনকে জেলে পুরিতে পারিলেই আন্দোলন বন্ধ হইয়া যায়, ইহা প্রায়ই দেখা গিয়াছে। অতএব আমাদের সর্বদা এই চেষ্টা করা উচিত যেন অত্যাচারিত ব্যক্তি স্বাবলম্বী হইয়া সত্যাগ্রহ চালাইতে পারে। স্ব-রাজের সাধনায় পরের উপর নির্ভরের মত বিপদ আর নাই। শেষ পর্যন্ত যদি একজন সত্যাগ্রহীও বাঁচিয়া থাকে সেও যেন নিজের প্রতিজ্ঞায় অটল থাকে, শত শাস্তি সত্ত্বেও যেন শোষণকার্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রতিপক্ষের সহযোগিতা না করে।

শুধু প্রতিজ্ঞায় অটল থাকিলেই চলিবে না। আমরা সত্যাগ্রহের মূল উদ্দেশ্য যেন মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত না হই। আমাদের বরাবর চেষ্টা থাকা উচিত যে একজনের সত্যাগ্রহই হউক আর সহস্র জনের সত্যাগ্রহই হউক, যখন: প্রতিপক্ষের মন টলিবে, তাহার শোষণযন্ত্র বিকল হইবে, তখনই তাহাকে শুদ্ধ লইয়া আমরা নবজীবন গড়িয়া তুলিব, যেখানে অত্যাচার নাই, ছোটবড় ভেদাভেদ নাই, যেখানে সকল মানুষ পরিশ্রম করিয়া সুখে বাঁচিয়া আছে। প্রতিপক্ষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবেও শোষণের ব্যাপারে সহযোগিতা করিব না, কিন্তু নবজীবন রচনার জন্য সর্বদাই তাহার সহযোগিতা লাভের চেষ্টা করিব।

(৬)

সত্যাগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, ভয় উত্তরোত্তর কমে। সব নির্মূল হইলে ক্ষণেকের মধ্যে স্বাধীনতার তপস্যায় সিদ্ধিলাভ ঘটে।

বুদ্ধদেবের জীবনের একটি ঘটনায় আমরা অনেক শিক্ষালাভ করি। প্রথম জীবনে বুদ্ধদেব সাধারণ মানুষের মত ভয় পাইতেন। তাঁহার ভূতের ভয় ছিল, কিন্তু তিনি চেষ্টা করিয়া সেই ভয়কে সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়াছিলেন। একদিন তিনি নিজেই ভয় ভাঙার উপায়টি শিষ্যগণের নিকট বর্ণনা করিয়াছিলেন।

তিনি এক অন্ধকার রাত্রে ভয় ভাঙার সঙ্কল্প লইয়া শ্মশানের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যে-তিথিতে ভূতেরা বেশি লম্ফঝম্প করে বলিয়া প্রবাদ ছিল তিনি সেই তিথিতেই শ্মশানে গেলেন। সেখানে পৌঁছিতে গাছের পাতার মধ্যে খস্‌খস্‌ করিয়া কিসের শব্দ হইল, হয়তো পাখীর শব্দ। অমনই বুদ্ধদেবের গা ছম্‌ছম্‌ করিয়া উঠিল। ইহা পূর্ব সংস্কারের ফল, কিন্তু তাঁহার মন ও বুদ্ধি পরিষ্কার ছিল বলিয়া তিনি নিজেকেই নিজে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি মনে মনে কেন ভয় পাইয়াছেন তাহা বিচার করিতে লাগিলেন। বিচার করিতে করিতে ভয়ও কমিয়া আসিল, অবশেষে একেবারে চলিয়া গেল।

বুদ্ধদেব তখন হাঁটিয়া বেড়াইতেছিলেন। হাঁটিবার অবস্থায় যখন ভয় কাটিয়া গেল, তখন তিনি স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইবামাত্র আবার পূর্ব সংস্কারের বশে সমস্ত ভয় ফিরিয়া আসিল। আবার তিনি স্থিরভাবে বিচার করিতে লাগিলেন, অবশেষে সে ভয়ও কাটিয়া গেল। এইরূপে পুনরায় বসিয়া ও অবশেষে শুইয়া যখন তাঁহার সব ভয় চলিয়া গেল তখন তিনি ভূতের ভয় হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইলেন।

ভয় ভাঙার সম্পর্কে বুদ্ধদেব দু'টি কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদের প্রণিধান করা কর্তব্য। তাঁহার প্রথম উপদেশ হইল যে-জিনিষকে আমরা ভয় করি, সোজা তাহার সম্মুখীন হইতে হইবে, ভয় ভাঙার আর কোনও দ্বিতীয় উপায় নাই। হয়তো রাস্তায় দাঙ্গা

বাধিয়াছে তাহা দেখিয়া আমরা ভয় পাইলাম। ভয় ভাঙার জন্ম তখন হয়তো আমরা ঠিক করি, "আচ্ছা, কাল হইতে খুব ডন বৈঠক দিব, গায়ে জোর হইলে পরে তবে ভবিষ্যতে দাঙ্গা থামাইবার চেষ্টা করিব।" ইহা ঠিক পথ নয়। গান্ধীজী স্পষ্টই বলিয়াছেন, সাহসী হইতে হইলে বিপদের মুখে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া আগাইতে হইবে। শরীরের শক্তি বাড়াইলেই যে আমাদের মনের জোর বাড়িবে তাহা তো নয়। মনের ভয় মনের মধ্যেই বিচারের দ্বারা দূর করিতে হইবে এবং তাহার জন্ম সোজাসুজি বিপদের সম্মুখীন হওয়া দরকার। ভয় ভাঙার অন্ম কোনও পথ নাই।

বুদ্ধদেব আর একটি কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আমাদের খুব বোঝা দরকার। কোন কোন লোক ভয়ের বস্তুকে স্বীকার না করিয়া এড়াইয়া যাইতে চায়। হয়তো সত্যসত্যই তাহার মনে ভূতের ভয় আছে, অথচ সে মুখে বলে, "ও কিছু নয়, ভয়ের কোন কারণ নাই।" বুদ্ধদেব বলিয়াছেন যে মনকে এইরূপ মিথ্যার দ্বারা ঢাকিয়া ভিতরের ভয়কে দূর করা যায় না। মনের মধ্যে যাহা প্রচ্ছন্ন আছে তাহাকে প্রকট করিয়া তাহার মূল নষ্ট করিতে হয়। ইহা ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নাই। ধামা চাপা দেওয়ার পথ মিথ্যার পথ।

সত্যাগ্রহ জগতের দুঃখ ও অন্যায় দূর করিবার পথ। সে পথে ভয় আছে। আমাদের জেলে যাইতে হইবে, অপমান সহ্য করিতে হইবে, মারধর খাইতে হইবে, গরুবাছুর কাড়িয়া লইবে, জমিবাড়ী নিলাম করিবে। আমরা হয়তো খাইতে পাইব না, স্ত্রীপুত্র অনাহারে, রোগে, শিক্ষার অভাবে কষ্ট পাইবে। হয়তো অন্যায়ের প্রতিরোধ করিতে গিয়া বন্দুকের গুলিতে আমরা প্রাণ হারাইব। সত্যাগ্রহ-সংগ্রামে মনের মধ্যে এই সকল ভয়ের বীজ একে একে নির্মূল করিতে

হইবে। ঐ ভয় দূর না হইলে আমরা জয়ী হইতে পারিব না, যে নবজীবন জগতে প্রতিষ্ঠা করিতে চাই তাহা প্রতিষ্ঠা করিতে পারিব না।

কেহ কেহ গ্রামের চাষীদের কাছে সত্যাগ্রহের বিপদের কথা বলেন না। যুদ্ধের শেষে আমাদের কি কি লাভ হইবে সেই কথাই বেশি করিয়া বলেন। মানুষ লোভের বশবর্তী হইয়া, বা ক্রোধের বশে ক্ষণেকের জন্য ভয় ভুলিয়া যায়, যুদ্ধের মধ্যে নিদারুণ সাহসের কাজ করে। কিন্তু সত্যাগ্রহে তো অপরকে মারিবার উত্তেজনা নাই, ধীরভাবে নিজেকে সব বিপদ, সকল কষ্ট অতিক্রম করিতে হয়। সেখানে ক্রোধ বা লোভের উত্তেজনার দ্বারা ভয় ভাঙা যায় না। নিমেষের জন্য ভয় দূর হইলেও তাহার বীজ মনের গহনে থাকিয়া যায় এবং উত্তেজনা সরিয়া গেলে নানারূপে সেই ভয় আবার ফিরিয়া আসে।

এই পথ হইতে উদ্ধারের জন্য গান্ধীজী সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে একটি নিয়ম করিয়াছেন, তাহা যেমন উপযোগী তেমনই সরল। বুদ্ধদেব যেমন প্রথমে চলিতে চলিতে মনের ভয় দূর করিলেন, তারপর দাঁড়াইয়া, তারপর বসিয়া, তারপর শুইয়া ভয় দূর করিয়াছিলেন, গান্ধীজীও তেমনই বলেন সত্যাগ্রহে আমাদের প্রথমে ছোট বিপদ, তারপর মাঝারি বিপদ ও সর্বশেষে মহান বিপদ, অর্থাৎ মৃত্যুভয়ের সম্মুখীন হইতে হইবে। এইরূপে সকল ভয়কে ক্রমশ জয় করিতে হইবে।

কেহ কেহ মনে করেন, গান্ধীজী মডারেট বা নরমপন্থী। মডারেটগণের নীতি হইল, তাঁহারা ভারতবর্ষ স্বাধীন করিবার জন্য প্রথমে ইংরেজের নিকট হইতে একটু কিছু দখল করিয়া লইতে চান। তারপর একটু, তারপর আরও বেশি। এমনই করিয়া অবশেষে একদিন দেশের সব

শাসনভার আমাদের হাতে চলিয়া আসিবে বলিয়া তাঁহারা বিশ্বাস করেন। কিন্তু গান্ধীজী মনে করেন, স্বাধীনতা অমন তিল তিল করিয়া আসে না। স্বাধীনতা জন্ম অথবা মরণের মত মুহূর্তের মধ্যে ঘাটিয়া থাকে। কিন্তু সেই সিদ্ধিলাভের জন্য আমাদিগকে উত্তরোত্তর কঠিন সাধনা করিতে হয়। প্রথমে এমন বিষয় লইয়া সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিতে হয় যাহাতে গবর্মেণ্ট খুব বেশি অত্যাচার প্রয়োগ করিতে না পারে, তাহার সুযোগ না পায়। তাহার পর আরও বেশি, তাহার পর আরও বেশি। গান্ধীজী বলেন, এইভাবে যেদিন আমরা মৃত্যুর ভয়কে মনে মনে অতিক্রম করিতে পারিব সেই দিনই স্বাধীনতার সাধনায় আমাদের সিদ্ধিলাভ ঘটিবে। তাহার পূর্বে নহে।

সত্যাগ্রহের এটি খুব উত্তম নিয়ম। প্রথমেই দেশবাসীকে এমন কোন যুদ্ধে নামানো উচিত নয় যাহাতে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী এবং যে পরাজয়ের ফলে সকলের মন ক্লান্ত হইয়া পড়ে, ভয় ও অবসাদ চাপিয়া বসে। লোকের যতটুকু শক্তি তাহার চেয়ে আর একটু শক্ত বিপদের সম্মুখীন হওয়া দরকার। জয় হইলে শক্তি বাড়িবে। পরাজয় ঘটিলে যেন খুব বেশি অবসাদ না আসে সে বিষয়ে কর্মীরা বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। কর্মীদের প্রফুল্লতা দেখিয়া যেন দেশবাসী আবার মনের সাহস ফিরিয়া পান, কর্মীরা যেন বিশ্বাস না হারান। এই অবস্থার পর কিছু অবসর দিয়া আরও কঠিন কোনও আইন-অমান্যের পথে দেশবাসীকে আবার নামাইতে হইবে।

এইরূপে ছোট বিপদ হইতে ক্রমে বড় বিপদের সম্মুখীন হওয়া সত্যাগ্রহের এক প্রধান কৌশল। লোভ বা ক্রোধের উত্তেজনার দ্বারা ভয়ের সংস্কারকে ধামা চাপা দিয়া যুদ্ধজয় করা সত্যাগ্রহ নয়, এরূপ জয়লাভও বেশি দিন টিকে না। সত্যাগ্রহের মধ্যে প্রতি অবস্থায় ধীর মনে

সকলে যেন বিচারের দ্বারা ভয় দূর করেন। তবেই সত্যাগ্রহের ফল স্থায়ী হইতে পারে। প্রতি সত্যাগ্রহীর এইদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। সাধারণ দেশবাসী হয়তো সত্যাগ্রহীর মুখ চাহিয়া সাহসে বুক বাঁধিবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক লোককেই নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করিয়া, বিচারের দ্বারা, ভয় দূর করিতে হইবে। সত্যাগ্রহে অবশেষে হয়তো দুই চারিজন মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, তখন কেহ কাহারও মুখ না চাহিয়া ভয়শূন্য হইয়া সত্যাগ্রহে অটল থাকিবে।

সত্যাগ্রহ কঠিন পথ, সাধনার পথ। ক্ষণেকের উত্তেজনার দ্বারা জয়লাভের পথ নয়। সাধনার মধ্যেও হঠকারিতা চলিবে না। যতটা সয় তাহার চেয়ে আরও একটু বেশি সওয়াইয়া ক্রমশ আগাইবার পথ। এই কথাটি আমরা যেন সর্বদা মনে রাখি।

(৪)

সত্যাগ্রহের চতুর্থ নিয়ম হইল, সত্যাগ্রহী দাবির পরিমাণ খুব অল্প রাখিবেন। একটি উদাহরণ লওয়া যাক।

বর্ধমানে কিছুদিন আগে ক্যানেল করের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা হইয়াছিল এবং শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে মোটের উপরে কংগ্রেসের পরাজয় হয়। পরাজয়ের জন্য লজ্জিত হইবার কোনও কারণ নাই, কিন্তু যদি ভবিষ্যতে আমাদের সত্যাগ্রহে জয়লাভ করিতে হয় তাহা হইলে পরাজয় কেন ঘটিয়াছিল তাহা খুব ভাল করিয়া বোঝা দরকার। বোকার মত চোখ বুজিয়া কেহ সত্যাগ্রহে বিজয়ী হইতে পারে না। সত্যাগ্রহীকে লজ্জা ও ভয় ত্যাগ করিয়া নিজের পরাজয়ের কথা সমস্ত আলোচনা করিতে হইবে, তাহা হইতে যতটুকু শিক্ষালাভ করা যায় তাহা আদায় করিয়া লইতে হইবে।

বর্ধমানে দামোদর ক্যানেল হইতে গবর্মেণ্ট কৃষকদের জল সরবরাহ করেন। তাঁহারা কৃষকদের নিকট জমির উন্নতি বাবদ প্রতি একরে ৫৷৹ টাকা হারে কর দাবি করেন। চাষীদের অবস্থা ভাল নয়, সেইজন্য বর্ধমান কংগ্রেসের কর্মিগণ ক্যানেল করের ন্যায়-অন্যায় চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন। গবর্মেণ্ট বলিলেন যে জমির ফসল বৃদ্ধি পাইয়াছে অতএব অতিরিক্ত ফসলের অর্ধেক দাম ডেভেলপ্‌মেণ্ট এ্যাক্ট অনুসারে গবর্মেণ্টকে দেয়। সেই হিসাবমত তাঁহাদের দাবি একর পিছু ৫৷৹ টাকা। কংগ্রেসকর্মিগণ গবর্মেণ্টের রিপোর্ট হইতেই দেখিলেন যে জমির ফলন সত্যসত্যই বৃদ্ধি পায় নাই। কোনও কোনও জায়গায় জমির উন্নতি ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু কোনও কোনও জায়গায় অতিরিক্ত জলের জন্য জমির ক্ষতিও হইয়াছে। তবে, পূর্বে বর্ধমানে সচরাচর পাঁচ বছর অন্তর অজন্মা হইত, এবং তাহাতে অর্ধেক ফসল মারা যাইত। এখন সেটি বন্ধ হইয়াছে। অতএব প্রতি ষষ্ঠ বৎসরের অর্ধেক ফসলের অর্ধেক গবর্মেণ্ট পাইতে পারেন। এই হিসাবে তাঁহারা বলিলেন, গবর্মেণ্ট ডেভেলপ্‌মেণ্ট এ্যাক্ট অনুসারে বৎসরে একমণ ধান ও একমণ খড়ের দাম জমির উন্নতি বাবদ একর পিছু পাইতে পারেন। তখনকার দিনে ইহার দাম ছিল ১৷৹ টাকা।

কিন্তু তাহার মধ্যেও কথা আছে। বর্ধমানের ভূমিরাজস্বের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে গবর্মেণ্ট বর্ধমান জেলায় পুলবন্দী কর হিসাবে বৎসরে ৫৩০০০৲ পাইয়া আসিতেছেন। দামোদরের জল কাণা-নদীগুলির মারফত যাহাতে দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়া চাষের উন্নতি করে, সেই উদ্দেশ্যে লোকে বরাবর এই কর দিয়া আসিতেছে। কিন্তু গবর্মেণ্ট সে কাজে বরাবর গাফ্‌লতি করিয়াছেন। জল সরবরাহ হয় না, চাষের নানাবিধ অবনতি ঘটিয়াছে। জমির ফলনও পূর্বাপেক্ষা কমিয়া গিয়াছে।

অথচ বাঙলার অপরাপর জেলার তুলনায় বর্ধমানের ভূমি-রাজস্ব সব চেয়ে বেশি। যে সময়ে রাজস্বের হার ধার্য হয় সে-সময়ে ফলনও বেশি ছিল। ইহা বিবেচনা করিলে হয় গবর্মেণ্টের পক্ষে ক্যানেল কর লওয়া চলে না, নয়তো প্রজার ভূমি-রাজস্ব একদিকে কমাইয়া দিয়া অপর দিকে ক্যানেল করের দাবি করা যাইতে পারে। যতদিন গবর্মেণ্ট বাৎসরিক ৫৩০০০৲ লইতেছেন, ততদিন জল সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে তাঁহারা বাধ্য। যদি বা ক্যানেলের জন্য বহু খরচ করিয়াছেন, এই কথা বলিয়া গবর্মেণ্ট কর দাবি করেন তবে রাজস্বের হারও তাঁহাদের কমাইতে হইবে, কেননা দেশে আর তেমন ফলন হয় না।

কর্মিগণ ক্যানেলের কর সম্বন্ধে উপরোক্ত তথ্য চতুর্দিকে প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন গবর্মেণ্টের তরফ হইতে বলা হইল যে বর্ধমানে জল সরবরাহ করিতেই একর পিছু তাঁহাদের ২॥৴০ খরচ পড়িয়া যায়। সেক্ষেত্রে তাহার কম কি করিয়া তাঁহারা লইতে পারেন? উত্তরে কংগ্রেসকর্মিগণ বলিলেন যে ক্যানেল হওয়ার ফলে চাষীরই যে আংশিক সুবিধা হইয়াছে তাহা নহে, দেশে বন্যার সম্ভাবনা কম হওয়ায় ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ও গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড উভয়েরই সুবিধা হইয়াছে। অতএব ঐ দুই পথের মালিকদের নিকট গবর্মেণ্ট যতটা পারেন আদায় করুন। কৃষকেরা বড় জোর একর পিছু দেড় টাকার মত উপকার পায়, তাহার অতিরিক্ত কিছু চাওয়া গবর্মেণ্টের পক্ষে অন্যায়। গবর্মেণ্ট যতদিন পুলবন্দীর ৫৩০০০৲ লইতেছেন। এবং রাজস্ব পূর্বহারে কায়েম রাখিয়াছেন, ততদিন কিছু না লওয়াই তো সর্বাপেক্ষা ন্যায়সঙ্গত।

এই তো গেল দাবির ন্যায় অন্যায়ের কথা। তারপর কৃষকের পক্ষের কথাও ভাবিয়া দেখা দরকার। বর্ধমানের চাষী গরিব। তাহার পক্ষে একর পিছু ২॥৴০ কর দেওয়া সত্যই কঠিন, ৫॥০ তো দূরের কথা। তাহার

সব চেয়ে বড প্রমাণ হইল এই যে যখন গবর্মেণ্ট পুলিশ পাঠাইয়া কর আদায় করিতে লাগিলেন তখন লোকে হালগরু বেচিয়া কর মিটাইয়াছে। পেটে না খাইয়া খোরাকীর ধান বিক্রয় করিয়া কত লোক যে কর দিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ক্যানেলের জলে লাভ হইলে তবেই তো মানুষ কর দিতে পারে। কিন্তু যখন পেটে না খাইয়া, জোতজমি বাঁধা দিয়া লোকে কর দেয় তখন বুঝা উচিত যে তাহাদের কর দিবার সামর্থ্য নাই।

গবর্মেণ্ট কিন্তু কর্মীদের কথা না শুনিয়া ৫॥০ টাকার পরিবর্তে ২॥৵০ হারে আদায় করিবেন এইরূপ স্থির করিলেন। কংগ্রেসকর্মিগণও সত্যাগ্রহ আন্দোলনের কথা বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

তাঁহারা ভাবিয়া দেখিলেন, রাজস্বের কথা তুলিয়া বা ৫৩০০০৲ পুলবন্দীর কথা বলিয়া একেবারে কিছুই ক্যানেল কর দিব না, ইহা এখন বলা চলিবে না, বর্ধমানের চাষীগণ ততটা সঙ্ঘবদ্ধ হয় নাই। অতএব সত্যসত্যই ন্যায়ের বিচারে গবর্মেণ্ট কিছুই আদায় করিতে পারেন না ইহা জানিয়াও কৃষকদের লড়িবার ক্ষমতা বিবেচনা করিয়া তাঁহারা খানিকটা ক্যানেল কর দিবেন ইহা স্থির করিলেন। কিন্তু কতখানি কর একরপিছু দিতে স্বীকার করা যায় ইহা লইয়া বিবেচনা চলিতে লাগিল। এই সময় কর্মীদের মধ্যে দুইটি মত দেখা দিল। এক দল বলিলেন, লোকে বেশি অত্যাচার সহিতে পারিবে না, অতি শীঘ্র পরাজয়ের সম্ভাবনা আছে। এরূপ ক্ষেত্রে এখনকার মত ২॥৵০ হার স্বীকার করিয়া লওয়া ভাল। তাঁহারা কৃষকের লড়িবার শক্তির বিশেষ বিচার করিয়া মত দিলেন যে "ভূমি-রাজস্ব কমিশনের তদন্ত সাপেক্ষ সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে ২॥৵০ হারে ক্যানেল কর দেওয়া যাইতে পারে।" তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিলেন যে খোরাকী ধান বেচিয়া বা জোতজমি বন্ধক দিয়া কর দেওয়া ঠিক হইবে না। যাহা সামর্থ্যে

কুলায় তদনুসারে কর মিটাইতে হইবে তবে সাময়িকভাবে ২॥৴০ হার স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। কংগ্রেসকর্মীদের এই পক্ষ কার্যত বলিলেন যে কষ্টকর হইলেও ২॥৴০ হার উপস্থিত স্বীকার করিতে হইতেছে। ইতিমধ্যে তাঁহারা কৃষকগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। যদি ভূমি-রাজস্ব কমিশন রাজস্ব কমাইবার প্রস্তাব করেন তবে ভাল। আর যদি না করেন তবে ভবিষ্যতে রাজস্ব কমাইবার জন্য, অন্যথা ক্যানেল কর সম্পূর্ণ রদ্ করিবার জন্য আন্দোলন করিতে হইবে। ইতিমধ্যে সকলকে সঙ্ঘবদ্ধ করা যাক।

কংগ্রেসের অপর পক্ষ কিন্তু বলিলেন, কৃষকের যথেষ্ট জোর আছে, তবে এমন নাই যে ক্যানেল কর সম্পূর্ণ রদ্ করিবার জন্য এখনই আন্দোলন আরম্ভ করা যায়। রাজস্ব কমিশন কি বলেন তাহার অপেক্ষা করিয়া পূর্বের দর অনুসারে একমণ ধান ও খড়ের দাম ১॥০ হিসাবে ক্যানেল কর দেওয়া হউক। ১॥০ টাকার অতিরিক্ত দিতে কৃষককে বলা যাইতে পারে না। গবর্মেণ্টের যদি পড়তায় না পোষায় তাঁহারা অবশিষ্ট টাকা ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে এবং গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের মালিকের নিকটে আদায় করুন।

কংগ্রেসে যখন এইরূপ আলোচনা চলিতেছে তখন চাষীদের পক্ষ হইতে গবর্মেণ্টকে জানান হইল যে তাহাবা ১॥০ হার স্বীকার করে, ২॥৴০ স্বীকার করে না। চতুর্দিকে প্রচারকার্য চলিতে লাগিল, ওদিকে গবমেণ্টও আদায়ের জন্য সশস্ত্র পুলিশ গ্রামে গ্রামে পাঠাইতে লাগিলেন। পুলিশ কিছু মার-ধর করিল, এবং স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে গ্রামবাসীকে প্রচুর অপমান করিল। অল্পদিনের মধ্যেই দেখা গেল চাষীরা পুরাপুরি হারে কর মিটাইয়া দিতেছে। বাক্যবাণে ও অপমানে জর্জরিত হইয়া লোকে খোরাকীর ধান, ঘটিবাটি সবই বিক্রয় করিয়া

ফেলিতেছে। সহস্রের মধ্যে একজন মাত্র পুলিশকে বলিতে পারিল যে তাহাদের কর মিটাইবার ক্ষমতা নাই, পুলিশ পারে তো সব লইয়া যাক, তাহারা নিজে হাতে তুলিয়া দিবে না। দেখা গেল যে এরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কৃষকের সংখ্যা অতিশয় কম। অধিকাংশ লোকই ভয়ে বা অপমানে কাবু হইয়া গবর্মেণ্টের দাবি মিটাইয়া দিতেছে। কংগ্রেসকর্মিগণ পুলিশের অত্যাচার রোধ করিবার জন্য, এবং লোকের মনে সাহস যোগাইবার জন্য গ্রামে গ্রামে ঘুরিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতেও বিশেষ ফল হইল না। যাহারা মার খাইয়াছে, অপমানিত হইয়াছে তাহারা কংগ্রেসকর্মীদের কাছে একবার সব স্বীকার করিয়া দ্বিতীয়বার পুলিশের বা হাকিমের সম্মুখে সব কথা অস্বীকার করিতে লাগিল।

এই অবস্থায় কংগ্রেসকর্মিগণের মধ্যে যাঁহারা পূর্বে ১॥০ দাবি জানাইয়াছিলেন তাঁহারাও বিবেচনা করিলেন এখন ২॥৴০ হারেই রফা করা যাক এবং চাষীদিগকে বলিলেন, তাহারা যতটুকু পারে ততটুকুই দিক, ঘটিবাটি বেচিয়া কিছু দিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু চাষীরা তখন এমন ভয় পাইয়াছে যে কেহ সে কথা শুনিল না। তাহারা যথাসর্বস্ব বিক্রয় করিয়া ষোল আনা কর মিটাইতে লাগিল। পুলিশের আদায় চলিতে লাগিল এবং অল্পকালের মধ্যেই গবর্মেণ্ট ২॥৴০ হারে ছয় লক্ষ ধার্য টাকার মধ্যে গোটা জেলায় সাড়ে পাঁচ লক্ষের উপর টাকা উসুল করিয়া লইলেন।

কংগ্রেসের যে শুধু পরাজয় হইল তাহা নহে, বর্ধমান অঞ্চলে কৃষকদের মনে যতটা দৃঢ়তা ছিল এবারে তাহার পরিবর্তে নিদারুণ ভয় ও অবসাদ আসিয়াছে। কংগ্রেস এক পা আগাইয়া দুই পা পিছাইয়া গিয়াছেন। আবার যদি বর্ধমানে কোনও দাবির জন্য সত্যাগ্রহের প্রয়োজন হয় তবে গতবারের অপেক্ষা কংগ্রেসকর্মীদের কাজ আরও কঠিন হইয়া পড়িবে।

সেইজন্য গান্ধীজী সব বিবেচনা করিয়া সত্যাগ্রহের এই নিয়ম করিয়াছেন যে সত্যাগ্রহে নামিবার,আগে সহস্রবার বিবেচনা করিতে হইবে সত্যাগ্রহী কতখানি দাবিকে ন্যায্য বলিয়া স্বীকার করিবেন এবং কতদূর পর্যন্ত তপস্যা করিতে প্রস্তুত আছেন। গান্ধীজীর উপদেশ হইল দাবি সর্বদা নীচু রাখিবে। তোমার লক্ষ্য হইল স্বরাজ লাভ করা। আমাদের পরাধীনতার মূল কারণ হইল এই যে আমাদের নিজেদের মনের ভিতর ভয় আছে বলিয়া, আলস্য আছে বলিয়া, পরস্পরের মধ্যে ভেদবুদ্ধি আছে বলিয়া আমরা পরাধীন। সত্যাগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল দোষ আমাদের চিত্ত হইতে দূর হইবে। আজ যদি ছোট কোনও দাবির জন্য আমরা কারাবরণ করি তবে মনের খানিকটা ভয়, খানিকটা ভেদবুদ্ধি কমিয়া যাইবে। সেই দাবির যুদ্ধে যদি আমরা কৃতকার্য হই তখন আবার আরও বড দাবি লইয়া সত্যাগ্রহ করিব। ফলে মনের মলিনতা আরও দূর হইবে। এমনি ভাবে কঠিন হইতে কঠিনতর তপস্যায় রত হইয়া যেদিন আমাদের মন হইতে মৃত্যুভয় দূর হইবে, দারিদ্র্য, রোগ প্রভৃতির ভয় দূর হইবে, সর্ববিধ নির্যাতনের ভয় দূর হইবে, সেদিন আমাদের নিশ্চয়ই স্বরাজের সাধনায় সিদ্ধিলাভ ঘটিবে।

কেহ কেহ মনে করেন গবর্মেণ্টের কাছে গোড়া হইতেই বড় দাবি লইয়া সত্যাগ্রহে নামা উচিত। গভর্মেণ্ট হয়তো রফা করিবার জন্য খানিকটা ছাড়িয়া দিবেন, সেইটাই আমাদের লাভ হইবে। গান্ধীজী কিন্তু বলেন প্রতিপক্ষকে ভয় দেখাইয়া আদায় করার চেষ্টা ঠিক নহে। বরং আমাদের দাবি এমন হওয়া উচিত যে প্রতিপক্ষ তাহা যেন অস্বীকার করিতে না পারে। হয়তো সে মুখে স্বীকার করিবে না, মনে মনে স্বীকার করিবে। এমনধারা দাবির জন্য যদি আমরা কারাবরণ করি, সকল নির্যাতন সহ্য করি তাহা হইলে প্রতিপক্ষের মন গলিতে

পারে, তখন সত্যাগ্রহী এবং প্রতিপক্ষ উভয়ে মিলিয়া একটা নূতন ব্যবস্থা গড়িতে পারেন।

অতএব দাবির পরিমাণ নির্ধারণ করার সময়ে দেখিতে হইবে যেন তাহা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত হয়। তাহার পর দেখিতে হইবে সেই ন্যায়সঙ্গত দাবির কতখানি অংশের জন্য লড়িতে আমরা প্রস্তুত আছি। নিজের শক্তি বুঝিয়া যেন আমরা সত্যাগ্রহের সংগ্রামে অগ্রসর হই। তাহা হইলে পরাজয়ের সম্ভাবনা কম থাকে। আর যদি বা পরাজয় হয়, তখন তাহার অবসাদকে দূর করা খুব কঠিন হয় না। বর্ধমানে পরাজয়ের অবসাদকে দূর করা কঠিন হইয়াছে, কিন্তু যদি দাবি আরও নিম্ন রাখিয়া লড়াই করা হইত তবে হয়তো গবর্মেণ্ট গোড়াতেই রফা করিতে রাজি হইতেন এবং কৃষকদের মনে জয়লাভের আনন্দ ও উৎসাহ কতক পরিমাণ দেখা দিত। তাহারা ভাবিত গবর্মেণ্টের মূলদাবি ৫৷৷০ হইতে তো আমরা ২৷৷/০তে নামাইয়াছি। যদি গবর্মেণ্ট অটল থাকিতেন এবং কৃষকদের পরাজয় হইত তাহা হইলেও সে অবসাদকেও দূর করা খুব কঠিন হইত না।

১৯৩০-৩২ সালের সত্যাগ্রহ আন্দোলনে গান্ধীজী গবর্মেণ্টের সহিত যে-লড়াই করিয়াছিলেন তাহাতে দাবি খুব বেশি রাখেন নাই। আমাদের মূল সংগ্রাম অবশ্য স্বরাজের জন্য, কিন্তু গান্ধীজী দেশব্যাপী ছোট ছোট সংগ্রামের ভিতর দিয়া দেশের চিত্তকে তপস্যায় শুদ্ধ ও স্বরাজের উপযোগী করিতেছিলেন। তিনি দাবি করেন নাই যে ইংরেজ দেশ ছাড়িয়া সদ্য সদ্য চলিয়া যাক। প্রথমে শুধু লবণ-আইন রদের দাবি পেশ করা হইয়াছিল। তাহাতে আংশিকভাবে জয়লাভও ঘটিয়াছিল। ১৯৩২ সালে পিকেটিং করিবার অধিকার এবং মিটিং করিবার অধিবার লইয়া লড়াই হয়। তাহাতে কংগ্রেস পরাজিত

হইল। দেশে হতাশা এবং অবসাদ দেখা দিল। কিন্তু তার দুই তিন বৎসর পরে কংগ্রেস আইন-সভায় প্রবেশ করার সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন। ইলেকশনের উত্তেজনায় আবার সকলে কংগ্রেসের নামে মাতিয়া উঠিল, অবসাদ কাটিয়া গেল।

গান্ধীজী বলেন তোমরা যদি দাবি সর্বনিম্ন হারে কর তবে প্রতিপক্ষ খুব বেশি অত্যাচার করিতে পারিবে না। লবণ-আইন রদের দাবি করিলে ইংরেজ গবর্মেণ্ট যতটা নির্যাতন করিবে ইংরেজেরা দেশ ছাড়িয়া পত্রপাঠ চলিয়া যাক, এই দাবি করিলে তাহার চেয়ে বেশি করিবার সাহস পাইবে। অল্প নির্যাতন সহিয়া গেলে দেখা যাইবে দেশের সজ্ঘশক্তি এবং শক্তি দুইই বৃদ্ধি পাইয়াছে। তখন আগের দাবিতে জয় অথবা পরাজয় যাহাই হইয়া থাক না কেন, পরে আরও বড় দাবি লইয়া সংগ্রাম করা যাইতে পারে। এইভাবে কঠিন হইতে কঠিনতর পথে চলাই সত্যাগ্রহের নিয়ম।

সত্যাগ্রহ কতকটা যোগসাধনের মত। যোগী শিষ্যকে প্রথমেই অতি কঠিন সাধনা দেন না। তাহাতে অনেক সময়ে শিষ্যের মাথা খারাপ হইয়া যায়, তাহার কঠিন রোগ হয়। তাই সদ্‌গুরু যতটা সয় সেই বুঝিয়া শিষ্যকে তপস্যা করিতে বলেন। তাহার শক্তি বৃদ্ধি পাইলে আরও কঠিন সাধনা দেন। এইভাবে কঠিন হইতে কঠিনতর সাধনার পথে তিনি শিষ্যকে সিদ্ধির দিকে লইয়া যান।

গান্ধীজী স্বরাজ সাধনার পথে সদ্‌গুরু। তিনি প্রতিপদে বলেন, নিজের শক্তি বুঝিয়া দাবি জানাইও। অনেক বিবেচনা করিয়া যে দাবি জানাইয়াছ তাহা হইতে কিছুতেই পিছাইবে না। শুধু তাহাই নহে। লড়াই করিতে করিতে যদি দেখ তোমার শক্তি বাড়িয়াছে, তখন সুবিধা বুঝিয়া প্রতিপক্ষের নিকট তোমার দাবির পরিমাণ

বাড়াইয়া দিও না। যতখানি দাবির জন্য লড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলে, সেবারকার মত তাহার কমবেশি করিও না। সেই যুদ্ধ শেষ হইলে খানিক বিরতি দিয়া পুনরায় অধিকতর দাবির জন্য নূতন সংগ্রাম আরম্ভ করিতে পার। যখনই লড়িতে নামিবে তখনই বিবেচনা করিবে তোমার সমগ্র ন্যায্য দাবির কতটুকুর জন্য এবারে লড়িবে এবং তোমার নিজের লড়িবার শক্তিই বা কত। পরাজয়ের ফলে যখনই অবসাদ আসিবে, অতি সাবধানতার সহিত তাহা দূর করিবে। কোন অবস্থাতেই সত্যাগ্রহী দলকে ছত্রভঙ্গ হইতে দিও না। যদি পরাজয়ের আশঙ্কায় পশ্চাৎপদ হইতেই হয়, এমনভাবে ব্যবস্থা করিবে যেন সত্যাগ্রহীদের মনে ছত্রভঙ্গের ভাব না আসে।

অতএব সর্বদা সাবধান হইয়া সংগ্রাম করিবে। নিজের দাবি, ন্যায় এবং শক্তি বিবেচনা করিয়া যতদূর কম করা যায়, ততদূর করিও। ইহাই সত্যাগ্রহের চতুর্থ নিয়ম।

(৫)

সত্যাগ্রহের পঞ্চম নিয়মটি বড় কঠিন। গান্ধীজী বলেন, জগতে সব জিনিষই সহযোগিতার দ্বারা চলে। প্রজা জমিদারের উপরে উপস্থিত চটিয়া আছে বটে, কিন্তু ভয়েই হউক ভালবাসাতেই হউক, সে জমিদারের সঙ্গে সহযোগিতা করে বলিয়াই জমিদারীপ্রথা জগতে বর্তমান রহিয়াছে।

ধরুন, আমরা জমিদারীপ্রথার উচ্ছেদ চাই। তাহা চাহিলে প্রজাকেই জমিদারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করিতে হইবে। জমিদার অবশ্যই মারধর আরম্ভ করিবে এবং হয়তো পুলিশ ডাকিয়া নানাবিধ অত্যাচার করিবে। যদি প্রজারা অটল থাকে তাহা হইলে জমিদারের মন ভিজিতে পারে,

সে প্রজাদের গিয়া বলিতে পারে, "আচ্ছা, এসো আমরা একটা সুব্যবস্থা করি।" গান্ধীজী বলেন যে তখনই আমাদের সে কথা বিশ্বাস করা উচিত। আমরা জমিদারকে বলিব, "বেশ, আসুন আমরা উভয়ে মিলিয়া এমন ব্যবস্থা করি যাহাতে শোষণ নাই, উৎপীডন নাই।" আমাদের সত্যাগ্রহ কয়েকদিনের জন্য বন্ধ থাক, আমরা একটা মীমাংসা করিবার চেষ্টা করি। কিন্তু আমরা লক্ষ্য রাখি যে আমরা যাহা চাই তাহা যেন হয়। জমিদার হয়তো নিজের দিকে ঝোল টানিবার চেষ্টা করে, কিন্তু তাহাতে আমরা রাজি হই না, আমাদের দাবি কিছুতে কমাই না। কিন্তু তাই বলিয়া জমিদারের সঙ্গে কথাবার্তা চালাইয়া তাহাকে আমাদের মতে আনিবার চেষ্টা করিতে আমরা যেন না ভুলি, কেননা তাহাই আমাদের উদ্দেশ্য।

যাহার শোষণে আমরা কষ্ট পাই, যাহার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করি, তাহার সঙ্গে ধীরভাবে শান্ত মনে মীমাংসার চেষ্টা করা বড শক্ত কাজ। কিন্তু গান্ধীজী বলেন, সত্যাগ্রহ তো সত্যসত্যই বড শক্ত পথ। মানুষের প্রতি বিশ্বাসই সত্যাগ্রহীর প্রধান অস্ত্র। ঐ বিশ্বাসের জোরেই আমরা অত্যাচারীর মন গলাইবার চেষ্টা করি, তার শুভবুদ্ধি জাগাইবার চেষ্টা করি।

যদি আমাদের মীমাংসার চেষ্টা ব্যর্থ হয় তখন আবার আমরা আন্দোলন আরম্ভ করি। তখন দ্বিতীয়বার প্রতিপক্ষ আমাদিগকে ডাকিয়া বলে, "এসো একটা মীমাংসা করা যাক।" যদি তাহার বদ মতলবের সাক্ষাৎ কোনও প্রমাণ পাওয়া না যায় তবে আবার আমাদের বৈঠকে বসিতে হইবে, প্রতিপক্ষকে জানাইতে হইবে যে আমরা যাহা চাই তাহা কিছুতেই ছাডিব না, সঙ্কল্প হইতে এক পাও হটিব না, আমাদের মরণ পণ। গান্ধীজী বলেন, একবার নয়, দুইবার নয়, সত্যাগ্রহীকে যদি প্রতিপক্ষ বিশবার ঠকায়, তবু একুশবারের বারেও তিনি তাহার প্রতি আস্থা

রাখিয়া বৈঠকে বসিবেন, অবশ্য যদি সেবারে ঠকাইবার মতলবের কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাওয়া যায়। কেননা সত্যাগ্রহীর হাতে, অন্তরস্থ শুভবুদ্ধির উপরে আস্থা ও নিজের অবিচল প্রতিজ্ঞার জন্য আমরণ শাস্তিগ্রহণ করার সঙ্কল্প, এই দুইটি ব্রহ্মাস্ত্র আছে। নবজীবন গঠনের জন্য প্রতিপক্ষের সঙ্গে তিনি যেমন আলোচনা বা সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত, আলোচনা নিষ্ফল হইলে তাহার সঙ্গে আবার অসহযোগিতা বা সত্যাগ্রহ করিতেও তিনি প্রস্তুত থাকিবেন, ইহাই সত্যাগ্রহীর ধর্ম।

গান্ধীজী নিজের জীবনে বরাবর প্রতিপক্ষের সঙ্গে এইরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। অনেকে তাঁহাকে ঠকাইয়াছে, কিন্তু মানুষের অন্তরস্থ শুভবুদ্ধির উপরে আস্থা তিনি কখনও ত্যাগ করেন নাই। বুদ্ধদেবের মত তিনিও বলেন মিথ্যার দ্বারা মিথ্যাকে জয় করা যায় না, সত্যের দ্বারাই মিথ্যাকে জয় করা যায়, ইহাই সনাতন সত্য।

সত্যাগ্রহের কৌশলহিসাবেও এই নীতির একটি মূল্য আছে। যদি আমরা বরাবর প্রতিপক্ষের সঙ্গে বোঝাপড়ার চেষ্টা করি, ও তাহার পরেও যদি মীমাংসা না হয়, তবে জগতের চোখে দোষ আমাদের হয় না, প্রতিপক্ষেরই হয়, কেননা আমরা তো বরাবর তাহাকে লইয়া নবজীবন গঠনের চেষ্টা করিতেছি। যে-কোনও যুদ্ধেই হউক, দশজনের মতের দাম আছে। সকলে যদি বিশ্বাস করে সত্যাগ্রহী নির্দোষ, ঠিক ন্যায়ের পথ ধরিয়া আছে, তাহা হইলে শোষকের মন শীঘ্র টলিতে পারে, সে নিজেও অন্যায়ের জন্য শীঘ্র শীঘ্র লজ্জিত হইয়া যাইবে।

অতএব সত্যাগ্রহের তৃতীয় নিয়মটি আমাদের সর্বদাই চোখের সামনে রাখা উচিত। আমরা যেন ক্ষণেকের জন্যও মানুষের উপরে বিশ্বাস না হারাই। ইহা বড কঠিন কাজ, কিন্তু কঠিন হইলেও ইহা আমাদের করিতেই হইবে।

স্বাধীনতার অধিকার

ভগবান বুদ্ধদেবের সম্বন্ধে একটি বড় সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে। একবার কোনও ব্যক্তি তাঁহার কাছে মুক্তি ও নির্বাণের সম্পর্কে অনেক কথা বলিতে থাকেন। বুদ্ধদেব শান্ত প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি জানিতেন যে লোকটির জীবনে অনেক গলদ আছে, তাহার স্বভাব এখনও কাঁচা। মুক্তির কথা তাহার মুখে সাজে না। মুক্তি সে হজম করিতে পারিবে না। বরং তাহার বুদ্ধিভ্রংশ ও বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা বেশি। তখন তিনি সেই ব্যক্তিকে শান্ত করিবার জন্য নিম্নলিখিত গল্পটি বলিলেন।

"দেখ, অমৃত সকলকে জীবন দান করে। কিন্তু যদি একটি কাঁচা মাটির পাত্রে সে অমৃত রাখা যায়, তবে মাটি গলিয়া অমৃত পড়িয়া যাইবে। অমৃতই সেই পাত্রের মৃত্যুর কারণ হইবে। কিন্তু যদি মাটির পাত্রটি আগুনে দগ্ধ করিয়া লও, তবে অমৃত পড়িবে না। পাত্রটি অমৃতকে ধারণ করিতে সমর্থ হইবে এবং তাহা হইতে অপর বহু লোক অমৃত সংগ্রহ করিতে পারিবে।"

বস্তুত, আজ আমরা জাতীয় স্বাধীনতার জন্য দাবি করিতেছি। স্বাধীনতা অমৃতস্বরূপ। কিন্তু তাহা লাভ করিবার অধিকার কি আমাদের এখনও হইয়াছে? জাতীয় জীবনে এখনও কত না আবর্জনা রহিয়াছে, কত গ্লানির দ্বারা আমাদের চিত্ত জর্জরিত হইয়া আছে। মহাত্মা গান্ধীর কল্যাণে দেশ একবার অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়া গিয়াছে। হয়তো সে পরীক্ষা যথেষ্ট হয় নাই।

ভয় ভাঙার উপায়

যাঁহারা মহাপুরুষ তাঁহাদের মধ্যেও সময়ে সময়ে সাধারণ মানুষের মত দুর্বলতার পরিচয় পাওয়া যায়। এ সকল দুর্বলতা দেখিয়া তাঁহাদের ছোট করিয়া ভাবিবার কোনও কারণ নাই। তাঁহারাও যে সাধারণ মানুষের মত ভয় বা ক্রোধের দ্বারা আক্রান্ত হন, ইহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছু নাই। কেবল সঙ্কল্পের জোরে এবং অধ্যবসায়ের দ্বারা তাঁহারা কি করিয়া এই সকল দুর্বলতাকে অতিক্রম করেন তাহাই আমাদের শিক্ষা করা উচিত কেননা সেইখানেই তাঁহাদের প্রকৃত মহত্ত্ব প্রকাশ পায়। মহাপুরুষগণের চরিত্রের মধ্যেও দুর্বলতা দেখিলে বরং আমাদের ভরসা হইবার কথা যে আমরাও হয়তো বা চেষ্টার দ্বারা ঐ সকল দোষ হইতে অন্তত কিছুদূর মুক্ত হইতে পারি।

ভগবান বুদ্ধদেব ছেলেবেলায় অন্ধকারকে ভয় করিতেন। উত্তরকালে বুদ্ধত্ব লাভের পর তিনি সময়ে সময়ে শিষ্যবর্গের নিকট নিজের জীবনের কোনও কোনও ঘটনা উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করিতেন। একদিন প্রসঙ্গক্রমে ভয় ভাঙার উপায়ের কথা উঠিলে তিনি তাঁহার সাধনকালের একটি ঘটনার উল্লেখ করেন। যখন তিনি বুঝিলেন যে অন্ধকারের ভয়কে দূর করিতে হইবে তখন তিনি কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজের মুখের কথায় নীচে প্রকাশ করা গেল।

"অতঃপর পূর্ণিমায় অথবা শুক্ল বা কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে যে সকল স্থানে যাইলে ভয়ে লোমহর্ষণ হয় আমি সেই সকল স্থানে গিয়া রহিলাম। যখন আমি সেখানে আছি তখন একটি জন্তু কাছ দিয়া

চলিয়া গেল, একটি ময়ূর গাছের একটি ডাল ভাঙ্গিয়া ফেলিল। আমিও অনুভব করিলাম 'এইবার আমার মনে ভয় আসিতেছে।'

তখন আমি নিজেকে বলিলাম, 'কিন্তু আমি ভয়ের অপেক্ষায় বসিয়াই বা থাকি কেন? যখন যে অবস্থায় আছি, সেই অবস্থার মধ্যেই তো ভয়কে জয় করিতে হইবে।

তখন আমি সেইখানে পদচারণ করিতে লাগিলাম। পদচারণ করিতে করিতে মন ভয়ে ভরিয়া গেল। আমি দাঁড়াইলাম না, বসিলাম না, সেই অবস্থাতেই বেড়াইতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে ভয় মন হইতে চলিয়া গেল। তখন আমি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম, আবার ভয় আসিল। ক্রমে সে ভয়ও দূর হইয়া গেল। তখন আমি বসিলাম। বসিবার পরই ভয় আসিল। যতক্ষণ না ভয় সম্পূর্ণ চলিয়া যায় ততক্ষণ সেইভাবেই বসিয়া রহিলাম। তখন শুইয়া আবার মনের মধ্যে ভয় অনুভব করিলাম। অবস্থা পরিবর্তন না করিয়া শুইয়া রহিলাম, যতক্ষণ না ভয় মন হইতে চলিয়া যায়।"

এমনি ভাবে যখন যে অবস্থায় ভয় আসে, সেই অবস্থার পরিবর্তন না করিয়া, সেই অবস্থার মধ্যেই সঙ্কল্প ও মনের অবিচল ভাবের দ্বারা ভয়কে মন হইতে বিদূরিত করিতে হইবে ইহাই ভগবান বুদ্ধের উপদেশ।

তপস্বীর কাহিনী

বিন্ধ্যগিরির শিখরে একটি প্রাচীন অন্ধকার গুহায় জনৈক তপস্বী বাস করিতেন। মানবের জীবনে দুঃখের প্রভাব দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিচলিত হইয়াছিল। তিনি অনুভব করিলেন যে রোগ, শোক প্রভৃতি অনিবার্য দুঃখ। কিন্তু এতদ্ভিন্ন এমন দুঃখও আছে যাহাকে নিবারণ করা করা যায়। মানুষ মানুষকে অত্যাচার করে, তাহাকে শোষণ করে, ইহার জন্য যে দুঃখ তাহার নিবারণ সম্ভব। সে নিবৃত্তির উপায় উদ্ভাবনের জন্য তিনি তপস্যায় মগ্ন হইলেন। বহু দিবস অতীত হইল, গুহার প্রবেশপথ কণ্টকে আবৃত হইয়া গেল, অবশেষে তপস্বীর মনে সত্যের আলোক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি অনুভব করিলেন যে অত্যাচারীকে বাধা দেওয়া কর্তব্য, শোষকের পথরোধ করা কর্তব্য। কিন্তু বিরোধিতার প্রচেষ্টায় সাবধানতার প্রয়োজন আছে। যদি প্রেমের বশবর্তী হইয়া মানুষ বিরোধিতা করে তবে কল্যাণমার্গ হইতে সে বিচ্যুত হয় না। কিন্তু প্রেমের অভাব ঘটিলে বিরোধ অবশেষে বিরোধেই পর্যবসিত হয় এবং তাহাতে মানবের কোনও কল্যাণ সাধিত হয় না।

যে মুহূর্তে তপস্বীর অন্তরে এই আলোক উদ্ভাসিত হইল সেই মুহূর্তে তিনি মানবের কল্যাণের নিমিত্ত সেই সত্যের প্রচারের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। দীর্ঘ দিনের অনাহারে তাঁহার দেহ শীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, ক্ষীণ বাহু সঞ্চালনে তিনি পথের কণ্টক অপাবৃত করিয়া বাহিরে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

একটি ক্ষুদ্র গিরিপ্রস্রবিণী কলতানে বনভূমিকে উচ্ছল করিয়া নিম্নে

নদীর অভিমুখে ধাইয়া চলিতেছিল, তিনি তাহা দেখিতে পাইলেন। বহু নিম্নে মানুষের অধিকৃত গ্রাম, সেখানে কীটের মত ক্ষুদ্র বা ততোধিক ক্ষুদ্র অবয়ববিশিষ্ট কয়েকটি বিচরমাণ জীবকে তিনি দেখিতে পাইলেন। উহাদের মধ্যে প্রেমমন্ত্রে বিশুদ্ধ বিরোধিতার বাণী প্রচার করিতে হইবে, ইহা তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার দৃষ্টি সম্মুখে চক্রবালরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডের উপর নিপতিত হইল।

তপস্বী সেই দৃশ্যপটে নিমগ্ন হইয়া আছেন এমন সময়ে তাঁহার মনে একটি বিশেষ চিন্তার উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন, "আহা মানবের মন কী মূর্খতায় পরিপূর্ণ। যদি আমার হাতে বিশ্বের শাসনভার থাকিত আমি শাসনের দ্বারা সকলকে সৎপথে চালিত করিতাম।" যৎক্ষণাৎ তাঁহার মনে এই চিন্তার উদয় হইল তৎক্ষণাৎ তিনি স্বীয় পশ্চাদ্দেশ হইতে এক অশরীরী বাণী শ্রবণ করিলেন। তাঁহাকে কে যেন বলিল, "প্রভু, আপনি তাহাই করুন। শাসনের দ্বারা জগৎ হইতে ঈর্ষ্যা, দ্বেষ ঘুচাইয়া দিন। স্বার্থের অন্ধতা বিদূরিত করুন, মানুষকে পরার্থে জীবন যাপন করিবার শিক্ষা প্রদান করুন। জগতের আশু কল্যাণ সাধিত হইবে। অন্য কোনও উপায়ে এত দ্রুত মানবের দুঃখবিমোচন সাধিত হইতে পারে না।"

তপস্বী ইহা শ্রবণ করিয়া ক্ষণেকের জন্য নিশ্চল হইয়া রহিলেন। তাহার পর করুণায় পূর্ণ অন্তরে বলিলেন, "হে মার, আমি তোমাকে চিনিয়াছি, তুমি আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হও। তুমি আমাকে ক্ষমতার প্রলোভন দেখাইতেছ। কিন্তু আমি জানি তোমার পথ অনুসরণ করিলে মানুষ অনিবার্য মৃত্যুর অভিমুখে অগ্রসর হইবে। শাসনের দ্বারা যে মঙ্গল সাধিত হয় তাহা ক্ষণস্থায়ী। তাহার জন্য নিত্য একটি শাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত রাখিতে হইবে, মানবের মুক্তি কোন দিন

হইবে না। পুরুষকারের দ্বারা যে মঙ্গল সাধিত হয় তাহাই কল্যাণময়। কোনদিনই জগৎ হইতে দুঃখ নিশ্চিহ্ন হইবে না। প্রতি নবজাত শিশুর সহিত অকল্যাণের বীজ ক্ষণে ক্ষণে জগতে নবজন্ম লাভ করিতেছে। অতএব মানবকে অবিরাম অকল্যাণের বিরুদ্ধে যুঝিতে হইবে, যেই যুদ্ধে যদি সে প্রেম অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে তবেই তাহার মুক্তি। তুমি যে আমাকে শুনাইতেছ মানবসমাজে শাসনের দ্বারা দ্রুত দুঃখবিমোচন সম্ভব, ইহা ছলনামাত্র বলিয়া আমি বুঝিয়াছি। তুমি মার, আমি তোমায় চিনিয়াছি। তুমি অপসারিত হও। অপ্রেমের পথে প্রেম আসিবে না, দমনের পথে মুক্তি আসিবে না, ইহা আমি জানি। অতএব তুমি আমাকে প্রলুব্ধ করিতে পারিবে না।"

ইহা শ্রবণ করিয়া মার বিচলিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, "ইনি সম্যক্‌রূপে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি সকলই জানিয়াছেন। আমার এখানে আর স্থান নাই।"

এই বলিয়া মার অন্তর্হিত হইলেন।

যে ধম্মা হেতুপ্রভবা

ভারতবর্ষের নানাস্থানে বুদ্ধদেবের মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলির মধ্যে বহু মূর্তিতে একটি বিচিত্র সংবাদ লেখা থাকে। মূল শ্লোকটি এইরূপ,

যে ধম্মা হেতুপ্রভবা হেতুং তেষাং
তথাগতোঽবদৎ তেষাঞ্চ নিরোধো
এবংবাদী মহাশ্রমণঃ

যে সকল ধর্ম মূল হেতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের বিষয় তথাগত বলিয়াছেন। তাহাদের নিরোধের উপায়ও মহাশ্রমণ বলিয়াছিলেন। সেই মহাশ্রমণের মূর্তি।

বস্তুত ইহা বড বিচিত্র ব্যাপার বলিয়া মনে হয় যে বুদ্ধদেব সমগ্র সংসারের কোলাহল এবং দ্বন্দ্ব হইতে মুক্তিলাভের জন্য মূলতত্ত্বের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, এবং লোকেও সাময়িক প্রয়োজনকে অতিক্রম করিয়া তাহার প্রতি মনোনিবেশের দ্বারা নির্বাণ-লাভের সাধনা করিত। আনন্দলাভের নহে, নির্বাণের। যে অবস্থা প্রাপ্ত হইলে মন আনন্দ এবং নিরানন্দ উভয়বিধ অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া লোকাতীত শান্তির অধিকারী হয় ভগবান বুদ্ধ তাহারই সাধনার কথা মানুষকে উপদেশ দিয়াছিলেন।

বুদ্ধদেবের জীবনে আমরা আরও একটি বিচিত্র শিক্ষা লাভ করি। বুদ্ধদেব অল্পবয়সে অন্ধকারের ভয়ে ভীত হইতেন। কেমনভাবে বিচারের দ্বারা তিনি সেই ভয়কে পরাস্ত করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়। যে অবস্থার মধ্যে তাঁহার মনে ভয় আসিত, সেই অবস্থায় থাকিয়াই তিনি ভয়ের মূল কারণ সম্বন্ধে বিচার করিতেন। বিচার করিতে

করিতে যখন সেই কারণ সম্বন্ধে জ্ঞান তাঁহার আয়ত্ত হইত, তখনই তিনি লক্ষ্য করিতেন, ভয়ও ক্রমশ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, অবশেষে বিলুপ্ত হইতেছে। ভয়ের বিষয়কে তিনি "ভয়ের বিষয় নয়" বলিয়া কখনও মনকে মিথ্যা সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতেন না। ভয়কে স্বীকার করিয়া তৎপরে তিনি তাহাকে পরাস্ত করিবার জন্য বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন। বুদ্ধিকে শান্ত রাখিতেন, অবশেষে জীবনেও সেই শান্তি পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িত। ভয় ভাঙার সাধনার অন্তে ভগবান বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন, 'যে ব্রাহ্মণগণ অথবা অপরে সত্যকে গোপন করিয়া কোনও অবস্থাকে পরাস্ত করিবার চেষ্টা করে, তাহারা অজ্ঞান-বিলাসী, মোহেই তাহাদের আনন্দ। ঐ পথে জয়লাভ সম্ভব নহে।'

ইহা অপেক্ষা সত্য কথা আজও কোন বাস্তববাদী বলিতে সমর্থ হইয়াছেন কিনা জানি না। মনে ক্রোধের উদয় হইয়াছে, হয়তো রাষ্ট্রবিপ্লব অথবা সামাজিক বিপ্লবের দ্বারা আমাদের ভোগসুখ নির্বাপিত হইবে, এমন অবস্থায় মিথ্যা দিয়া সত্যকে আবৃত রাখিবার চেষ্টা ছলনামাত্র। হঠাৎ কিছুদিন হইতে সকলেই বলিতেছেন, দেশ স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্য তৈয়ারি হইয়া গিয়াছে, কেবল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের দোষেই আমরা অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। এমন অবস্থায় অনেককে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, পরের কথা ছাড়িয়া দিন আপনি নিজে তৈয়ারি হইয়াছেন তো? অনেকে বলিয়াছেন, অপরে আগাইলে আমরাই কি পিছাইয়া থাকিব? কেহ বা স্বীয় দৈনন্দিন আচরণের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, সত্যই, আমরা আকস্মিকের অপেক্ষায় রহিয়াছি, দৈবের উপরে নিভর করিয়া রহিয়াছি, পুরুষকারের উপর নহে। যে অবস্থার আবির্ভাব আমরা মনে আকাঙ্ক্ষা করি, জীবনে কখনও তাহার সাধনায় প্রবৃত্ত হই নাই।

এমন অবস্থায় মনে হয়, বুদ্ধদেবের সেই শিক্ষা বার বার আমাদের পক্ষে স্মরণ করা কর্তব্য। যে শিক্ষার বশে আমরা ভাবের ঘরে চুরি করিব না, কোন ঐতিহাসিক দৈবের উপর নির্ভর না করিয়া, যাহা চাই তাহাকে পুরুষকারের ভিত্তির উপরে স্থাপিত করিতে চেষ্টা করিব। অন্তরে যদি ভয় থাকে, মনের নিবিড় কোণে যদি ভোগবিলাস খোয়া যাইবার আশঙ্কা সুপ্ত অবস্থায় বর্তমান থাকে, তবে সেই ভয় কোথা উৎপন্ন হইল তাহা বিচারের দ্বারা জানিবার শক্তি যেন আমরা লাভ করি এবং সেই ভোগসুখ পরিহার করিয়া পরিশ্রমী মানবসমাজের একজন সামান্য শ্রমশিল্পী হইয়াও যেন আনন্দ লাভ করিতে সমর্থ হই।

পরাজয়ের কারণ বাহিরে নাই, আমার দুর্বলতার জন্য ঐতিহাসিক অবস্থানিচয়কে অথবা অপর কোনও ব্যক্তিকে দায়ী না করিয়া নিজেই যেন তাহা দূর করিবার সাধনায় প্রবৃত্ত হই। বুদ্ধদেবের পক্ষে যাহা সম্ভব হইয়াছিল, আমি মানুষ, আমার পক্ষেই বা তাহা কেন সম্ভব হইবে না? আমার মত একজন ব্যক্তিও যদি অন্তরের অন্ধকারকে বিচারের দ্বারা বিদূরিত করিতে সমর্থ হয়, তবে সমগ্র সমাজের অন্ধকার কতদিন ধরিয়া দেশকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে, তাহাতে কিবা আসে যায়?

পরমহংসদেব বলিতেন, শত বৎসরের আঁধার ঘরেও প্রদীপের আলো জ্বালিলে তাহা মুহূর্তের মধ্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। আমরাও যেন সেই বিশ্বাস লইয়া স্বাধীনতার সংগ্রামে, আমাদের সমাজকে সর্ববিধ দুঃখদায়ী অবস্থা হইতে মুক্ত করিবার সাধনায়, অন্তরকে শুদ্ধ করিয়া সাম্য, স্বাধীনতা এবং অস্তেয়বৃত্তির উপযুক্ত আধারে পরিণত করিতে সমর্থ হই।

কিন্তু এজন্য মূল হেতুর বিষয়ে চিন্তার প্রয়োজন। সকল দুঃখের পিছনে যে তত্ত্ব রহিয়াছে, তাহারই অধিকার লাভ করিয়া যেন আমরা দুঃখনিবৃত্তির সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারি।

সত্যাগ্রহ কি নিষ্ফল?

মিঃ এম, এন, রায় কংগ্রেসের মধ্যে আমূল পরিবর্তন চান। তিনি বলেন ১৯১৯ সালে দেশের লোক কাপুরুষ ছিল, অস্ত্র হাতে দিলেও তাহারা লড়িতে পারিত না। কিন্তু মহাযুদ্ধের ফলে তাহাদের মধ্যে একটা চেতনা জাগে, একটু বিদ্রোহের ভাব দেখা দেয়। খুব সাহসের কাজ করিবার মত মন তাহাদের ছিল না, আবার ইংরেজের বিরুদ্ধে রাগও তাহাদের ফুটিয়া উঠিতেছিল। এইরূপ দোটানা এবং দুর্বলতার অবস্থায় গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগের নীতি ভারি খাপ খাইয়াছিল। অহিংস আন্দোলনে ফাঁসিও যাইতে হইবে না, অত্যধিক নিষ্ঠুর অত্যাচারও সহিতে হইবে না, অথচ গান্ধীজী সকলকে আশা দিলেন ইহার দ্বারা ইংরেজরাজত্বও ধ্বংস হইবে, ফলে লোকে মাতিয়া উঠিল। তাহাদের বিদ্রোহের যে ক্ষীণ ভাবটি ছিল, তাহা বিকাশের সুযোগ পাইল। ইহাই ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে গান্ধীজীর দান।

কিছুদিন পরে লোকের মধ্যে বিদ্রোহের ভাবটি বৃদ্ধি পাইল, তাহারা সকল অত্যাচারের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ আরম্ভ করিল। অমনি গান্ধীজী অহিংসার অজুহাতে আন্দোলন বন্ধ করিয়া দিলেন। চৌরিচৌরার পরে তিনি আন্দোলন বন্ধ করিলেন, ১৯৩২ সালেও তাই।

আজ জয়পুর, ত্রিবাঙ্কুর, উড়িষ্যা যেখানেই গণশক্তি বিদ্রোহে অগ্রগামী হইবার চেষ্টা করিতেছে সেখানেই গান্ধীজী হুকুম দিয়া, নয় উপবাস করিয়া সেই বিদ্রোহের গতিকে নিষ্ফল করিয়া দিতেছেন। গান্ধীজীর মতলবই নয় যে গণশক্তি জাগিয়া উঠুক। তাঁহার অহিংস অসহযোগ

আর দেশে খাপ খাইতেছে না। ছেলেবেলার পোষাক কি আজও পরা যায়, তাহা আর গায়ে আঁটে না। আজ গণশক্তি বড হইয়াছে, অসহযোগের দ্বারা আর কিছুই হইবে না। তাহাকে নূতন পথ খুঁজিতে হইবে, নূতন নেতা খুঁজিতে হইবে।

ইহাই মিঃ এম, এন, রায়ের মত। ইহা লইয়া তর্কযুদ্ধ করিতে আমরা বসি নাই, কেন আজও গান্ধীজীকে নেতা বলিয়া মানি তাহারই কৈফিয়ৎ দিবার চেষ্টা করিব। রায় মহাশয়ের সব কথা আমরা ঠিক বলিয়া মনে করি না। তিনি ১৯১৯ সালের সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন সে কথা ঠিক। আমরা দুর্বল ছিলাম বলিয়াই হয়তো অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলাম, কিন্তু আজও যে সে পথ ত্যাগ করি নাই তাহার অন্য কারণ আছে, তাহা দুর্বলতা নহে।

গান্ধীজী কস্মিন্‌কালেও আর ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধ করিবেন না তাহা আমরা মনে করি না। তাহা হইলে গান্ধীজীর নেতৃত্ব আমরা ছাড়িয়া দিতাম। জয়পুর বা রাজকোট বা উড়িষ্যায় যে কর লইয়া লড়াই হইবে না, তাহা আমরা মনে করি না। গান্ধীজী স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে সংগঠনমূলক কাজ করিলে জনগণকে যেমন সঙ্ঘবদ্ধ করা যায়, এমন আর কিছুতে হয় না। অহিংস আন্দোলনের জন্য এই কয়টি দরকার, (১) গ্রামের নেতাদের উপর গ্রামের সাধারণ অধিবাসিগণের দৃঢ় বিশ্বাস ও আস্থা জন্মানো চাই। (২) নেতারা যখন জেলে, তখনও যেন গ্রামের লোকে নিজেদের পায়ে দাঁড়াইয়া অহিংস আন্দোলন চালাইতে পারে। (৩) জমি, বাড়ী, অস্থাবর সম্পত্তি নিলাম হইয়া গেলেও যেন তাহারা নিজেদের প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত না হয়। তবেই অসহযোগ আন্দোলন সফল হইবে, এইরূপ শিক্ষা গ্রামবাসীদের মনে গাঁথিয়া দিতে হইবে।

গান্ধীজী মনে করেন কর্মীরা স্থায়ীভাবে গ্রামে থাকিয়া গঠনমূলক

কাজ করিলে উপরের দুইটি গুণ তাহাদের মধ্যে জন্মায় এবং তৃতীয় দফার শিক্ষাটি সকলকে দিবার সুযোগ পাওয়া যায়। তাড়াতাড়ি লড়াই বাধাইয়া দেখা গিয়াছে লোকে বিরক্ত হইয়া উঠে, অধৈর্য হইয়া পড়ে। গবর্মেণ্টেরও তখন সুবিধা হয়, তাহাদের দমননীতিতে তখন ফলও হয়। সেইজন্য উড়িষ্যার রণপুরেই হউক বা অন্য কোথাওই হউক গান্ধীজী আইন-অমান্য বন্ধ করিয়া কর্মীদের গঠনমূলক কাজ করিতে আদেশ দিলেন। আমাদের বিশ্বাস গ্রামবাসী গঠনমূলক কাজের ভিতর দিয়া খানিক তৈয়ারি হইলে আবার আইন-অমান্যের আন্দোলন আরম্ভ হইবে। এই বিশ্বাস আছে বলিয়াই আমরা গান্ধীজীর গঠনমূলক কাজ করিতে ভয় পাই না। গান্ধীজী গ্রামবাসীকে অগ্রসর হইতে দিবেন না বলিয়া তাহাদের ভুলাইয়া রাখিবার মতলবে চরখা চালাইতে বলেন, বা স্কুল পাঠশালা করিতে বলেন, এরূপ আমরা বিবেচনা করি না। গান্ধীজী ২৭শে মে ১৯৩৯ তারিখের 'হরিজনে' যাহা লিখিয়াছেন তাহার সরল মানে এইরূপ—

"যিনি বিচক্ষণ সেনাপতি তিনি শত্রুর ফাঁদে পা দেন না। কোথায় কখন সংগ্রাম আরম্ভ করিতে হইবে তিনি নিজে তাহা ঠিক করেন। শত্রু হয়তো তাঁহাকে কোন সময়ে লড়াইয়ে নামাইতে চায়। কিন্তু তিনি অমনি লড়াই করিতে ছোটেন না। তিনি নিজের সুবিধা বুঝিয়া লড়েন।

"সত্যাগ্রহে কখন আইন অমান্য করিতে হয়, কখন পিছাইয়া গিয়া গঠনমূলক কাজের সাহায্যে অহিংস আন্দোলনের উপযোগী করিয়া দেশবাসীকে গড়িতে হয়। কখন কোন্ পথ লইতে হইবে, তাহা সত্যাগ্রহী নেতা দেশকালপাত্র অনুসারে ঠিক করিবেন। সত্যাগ্রহী যে পথই লউন না কেন, তিনি উত্তেজিত হইবেন না, কখনও হতাশও হইবেন না। একনিষ্ঠভাবে নিজের পথে চলিবেন।"

এইটি যথার্থ উপদেশ মনে করি বলিয়াই আমরা গান্ধীজীর নেতৃত্ব মানিয়া চলিবার চেষ্টা করি। গণশক্তির দ্বারাই স্বরাজ লাভ হইবে, ইহা গান্ধীজীও বিশ্বাস করেন, আমরাও বিশ্বাস করি। তাঁহার এই মতের বিরুদ্ধে মিঃ এম, এন, রায়ের মত অবিশ্বাসের কারণ এখনও খুঁজিয়া পাই নাই।

কিন্তু শুধু কি তাই? গান্ধীজীর প্রতি ভক্তিবশেই কি আমরা অহিংসার পথ লইয়াছি? তাহাও ঠিক নহে। সোজা কথা, অহিংসার পথে চলিবার চেষ্টা করিলেও হিংসার ভাব ভিতরে ভিতরে আমাদের নাড়া দেয়। তবু কেন আমরা অহিংসার পথে চলিবার চেষ্টা করি? পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ইহা কি স্বভাববিরুদ্ধ নয়? ইহার উত্তর দিবার চেষ্টা করিব।

ভারতবর্ষের হাতে যদি অস্ত্রশস্ত্র থাকিত, অথবা এদেশে যত দেশী পল্টন আছে তাহারা যদি একসঙ্গে বিদ্রোহ করিত তাহা হইলে হয়তো ভারত হইতে ইংরেজ বিদূরিত হইয়া দেশী শাসন স্থাপিত হইতেও পারিত। কিন্তু তাহা তো জনগণের স্বরাজ নয়, তাহাদের পক্ষে পররাজই কায়েম হইয়া থাকিত। দেশের শাসকসম্প্রদায় গৌরাঙ্গ না হইয়া কৃষ্ণাঙ্গ হইত কিন্তু তাহা তো আমরা চাই না। আমরা চাই দেশের শাসনশক্তি জনগণের হাতে আসিয়া পড়ুক, জনগণ নিজেদের ইচ্ছায়, স্বাধীনবুদ্ধিতে নির্বাচন করিয়া প্রতিনিধি ঠিক করুক। সেই প্রতিনিধিরা দেশের শাসন চালাক।

কেহ হয়তো বলিবেন, হিংসার আন্দোলনের দ্বারা কি রুশিয়ায় গণশক্তির হাতে শাসনভার যায় নাই? আমরা বলিব, এখনও পুরা যায় নাই। একটি বিশিষ্ট দল জনগণের নামে দেশ শাসন করিতেছেন। কিন্তু যদি তাঁহাদের রাজ্য চালনায় ভুল হয়, তবে সেই দলকে কে

শোধরাইবে? শাসকের হাতে অপরিমিত শক্তি থাকিলে বিপদ। রোজই রুশিয়ায় দেখিতেছি ষ্টালিনের সঙ্গে যাহার মত মেলে না তাহার দুর্দশার অন্ত নাই। দেশ ছাড়িয়া পলাইতে হয়, নয়তো জেলে পচিতে হয়, নয়তো তাহার ভবলীলা সাঙ্গ হয়। লেনিনের পত্নী ক্রুপ্‌সকায়ার অবস্থাও ষ্টালিনের রাজত্বকালে বিশেষ ভাল ছিল না। তাই দেখিয়া মনে হয় হিংসার পথে গণশক্তি দেশের শাসনভার অধিকার করিবার চেষ্টা করিলেও হয়ত পুরাপুরি তাহা পায় না।

কিন্তু গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনের আদর্শ অন্যরূপ। তিনি রাষ্ট্রের হাতে দেশের শাসনভার সর্বৈব দিতে বলেন না। তাঁহার চেষ্টা যে গ্রামগুলি জাগিয়া উঠুক, তাহাদের পঞ্চায়েৎ দেশের খানিকটা শাসনভার লউক। দেশের অনেকখানি শাসনভার যেন আগে হইতেই জনগণের হাতে আসিয়া পড়ে। যে বিষয়গুলি গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ বা প্রাদেশিক পঞ্চায়েৎ চালাইতে পারিবে না, তাহাই কেবল কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রশক্তি চালাইবে। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্রের উপর শাসন চালাইতে পারিবে না, যেমন রুশিয়ায় চালায়। এই আদর্শটি ভাল।

আর অহিংস সত্যাগ্রহের এমনই মজা যে বাহিরের নেতাদের শত চেষ্টাতেও ইহা সফল হইবার নহে। জনগণ সত্যই জাগ্রত হইয়া উঠিলে তবেই শুধু স্বরাজ লাভ হইতে পারে। হিংসার পথে তাহারা অর্দ্ধজাগ্রত হইলেও কাজ চলিবে। অহিংসার পথে স্বরাজলাভ করিতে হইলে জনগনের পুরা জাগরণ চাই। যদি সে পথে আমাদের স্বরাজলাভ সত্যই ঘটে তাহা হইলে যে দলকে শাসনভার দেওয়া হইবে তাহারা যথেচ্ছাচার করিতে পারিবে না। কেন্দ্রশক্তির অপব্যবহার হইলে জনগণ তাহা বন্ধও করিতে পারিবে, অন্তত এরূপ আশা করা যায়। হিংসার পথে সে আশা একেবারে নাই এরূপ নহে, তবে অপেক্ষাকৃত কম।

এইটি বিশ্বাস করি বলিয়াই অহিংসার পথকে হিংসার পথের চেয়ে ভাল মনে হয়। অথচ অন্তরের মধ্যে আমাদের যথেষ্ট হিংসা আছে। কিন্তু বিচার করিয়া যখন বুঝিয়াছি কোন্ পথটি ভাল, তখন শক্ত হইলেও সেই পথে চলিবার চেষ্টা করি। এ পথ দিয়া শেষ পর্যন্ত আমাদের জয় হইবে কিনা জানি না কিন্তু আমাদের চেষ্টার ত্রুটি হইবে না। যাহা ভাল, তাহা কঠিন হইলেও করিতে হইবে। এবং এই পথে গান্ধীজীকে আমাদের সহচর এবং নেতা পাইয়াছি বলিয়াই আমরা আজও তাঁহাকে অনুসরণ করি।

হিংসার পথ গ্রহণ করিতে ভয় পাই বলিয়া নয়, অহিংসার পথ বিচারে শ্রেষ্ঠ বলিয়াই আমরা হিংসা পরিহার করিবার চেষ্টা করিতেছি। তাই মিঃ এম, এন, রায়ের গান্ধীজীর নেতৃত্বের সম্বন্ধে মতামতগুলি আমরা মানিতে পারিলাম না।

গান্ধীজী কি হিংসামাত্রকেই ভয় পান ?

অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে চৌরিচৌরায় কয়েকজন পুলিশকর্ম্মচারী নিহত হইয়াছিল। তাহার ফলে গান্ধীজী ভারতব্যাপী আন্দোলনকে বন্ধ করিয়া দেন। ১৯৩২ সালেও তিনি বলেন যে দেশ হিংসায় ভরিয়া আছে, অতএব আইন-অমান্য স্থগিত রাখিতে হইবে। রণপুর, রামদুর্গ প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যে আন্দোলন তিনি আজ ঐ কারণে বন্ধ করিয়া কর্মীদের গঠনমূলক কাজে মন দিতে উপদেশ দিয়াছেন।

মিঃ এম, এন, রায় বলেন যে গণশক্তিকে জাগ্রত করা গান্ধীজীর উদ্দেশ্য নয়। যখন তাহারা জাগিয়া উঠে, তখন তিনি ভয় পাইয়া পিছাইয়া যান, নয়তো বিদ্রোহের বহ্নিকে অহিংসার অজুহাতে ধামা চাপা দেন। ইহার ফলে ভারতবর্ষের সর্বনাশ হইতেছে। কথাটা ভাবিয়া দেখিবার মত। সত্যই যদি গান্ধীজী স্বাধীনতার পথে অন্তরায় হন, তবে আমাদের অন্য রাস্তা দেখিতে হইবে। কারণ ভারতের মুক্তিই আমাদের কাম্য, গান্ধীজীর প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন তো আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

এখন বিচার করিয়া দেখা যাক গান্ধীজী কি জন্য মাঝে মাঝে পিছাইয়া যান। চৌরিচৌরার সম্পর্কে তিনি ২৯-১০-১৯২৫ তারিখের ইয়ং ইণ্ডিয়াতে লিখিয়াছিলেন, "আইন-অমান্যের আন্দোলন যখনই আমি বন্ধ করিয়াছি তখন যে হিংসার প্রকাশ দেখিয়া সেরূপ করিয়াছি তাহা নহে। কংগ্রেসকর্মীরাই যখন হিংসার ব্যাপারে যোগ দিয়াছে, অথবা হিংসায় অপরকে প্ররোচিত করিয়াছে তখনই আমি পিছাইয়া গিয়াছি।" ২৮-৮-১৯২৪ তারিখের ইয়ং ইণ্ডিয়াতে পূর্বেই তিনি লিখিয়াছিলেন,

"কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা যদি প্রতিষ্ঠানের নীতি মানিয়া না চলে, কেন্দ্র হইতে যে-আদেশ আসে তাহা পালন না করে, তবে কাজ চলিবে কেমন করিয়া? স্বরাজলাভের জন্য আমাদের খুব কঠোরভাবে

কংগ্রেসের নিয়ম-কানুন ও আদেশ মানিয়া চলিতে হইবে। যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হইতে আমরা মুক্তি চাই, তাহার কর্মচারীরা অতিশয় নিষ্ঠার সঙ্গে গবর্মেন্টের আদেশ মান্য করে। তাহারা নিয়মানুবর্তিতা বোঝে, লড়িতেও জানে, পরিশ্রমে কাতর নয়। দেশের শাসন তাহাদের হাত হইতে ছিনাইয়া লইতে হইলে আমাদের পক্ষে ছেলেখেলা করিলে চলিবে না, তেমনই পরিশ্রমী হইতে হইবে, তেমনই শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইবে।"

গান্ধীজী জনগণের মধ্যে হিংসার বিকাশকে ভয় পান না। পেশোয়ারে ১৯৩০ সালে গুলিচালনার সময় যখন বহু লোক মারা যায় এবং সাধারণও কিছু ক্ষেপিয়া ওঠে তখন তিনি পেশোয়ারীদের বলেন নাই, "তোমরা এইবার পশ্চাৎপদ হও।" তখনও সীমান্ত গান্ধী কংগ্রেসের শাসন ঠিক মানিয়া চলিতেছিলেন, কংগ্রেসকর্মীরা জনগণকে সংযত রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল, এবং সীমান্ত গান্ধী অহিংসার নীতিকে ক্ষণেকের জন্য ছাড়েন নাই। গান্ধীজীও তাঁহাকে পশ্চাৎপদ হইতে বলেন নাই। কিন্তু উড়িষ্যার রণপুরে বাজালগেট নামক জনৈক কর্মচারী হত্যার সময়ে দেখা গেল একজনও দায়িত্বপূর্ণ কংগ্রেসকর্মী সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। রাজকোটে স্থানীয় অধিবাসীদের দ্বারা পুরা সত্যাগ্রহ চলিতেছিল না। বাহিরের লোক আনিতে হইয়াছিল, অর্থাৎ কংগ্রেসকর্মীরা স্থানীয় জনগণকে পুরা জাগাইতে পারেন নাই। অমনি গান্ধীজী পিছাইয়া গেলেন, ইহা কি নিছক হিংসাকে ভয়? ইহা প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতার জন্য ভয়। আর দুর্বল প্রতিষ্ঠান লইয়া কি আমরা সবল সাম্রাজ্যবাদকে নষ্ট করিতে পারি? ভারতকে স্বাধীন করিতে পারি?

গান্ধীজীকে ভীতু বলিয়া মনে হয় না। তিনি তো জনগণকেই জাগাইতে চান। তিনি পিছাইয়া যান অবস্থার বিপাকে, অন্তরে ভয়ের

জন্য নহে। অতএব আমাদের কর্তব্য গান্ধীজীর নেতৃত্ব ত্যাগ করিয়া অপরকে আশ্রয় করা নয়, আমাদের কর্তব্য শীঘ্র কি করিয়া গ্রামে গ্রামে শক্তিশালী কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে, তাহার চেষ্টা করা। গ্রামের কর্মীরা যাহাতে কংগ্রেসের নীতি হইতে বিচ্যুত না হন, সে-বিষয়ে সকলের দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তাঁহারা যদি অহিংস থাকেন, জনগণকে প্রাণপণে অহিংসার পথে সংযত রাখেন, তবে শুধু জনগণের হিংসায় ভীত হইয়া গান্ধীজী কোনদিন পিছাইবেন না।

মিঃ এম, এন, রায় আরও বলিয়াছেন যে গান্ধীজী ভারতের প্রতি লোককে মনে, বচনে ও কর্মে অহিংস রাখিতে চান। তাহা কোনদিন হইবেও না, তিনিও আর কোনদিন আইন-অমান্যের আন্দোলন করিবেন না। আমাদের কিন্তু ধারণা অন্যরূপ। গান্ধীজী কর্মীদের কাছে যতটা দাবি করেন, সাধারণের কাছে ততটা করেন না। আবার তাঁহার নিজের জন্য অহিংসার আদর্শ যেরূপ উচ্চ গ্রামে বাঁধেন, কংগ্রেসের কাছে সেরূপ বাঁধেন না। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা, অর্থাৎ কংগ্রেসকর্মীরা, অহিংসার আদর্শকে খাটো করিব কেন? যদি আমরা আদর্শ উচ্চ রাখি, তবে সম্পূর্ণ না হইলেও অনেকদূর তো উঠিতে পারিব, এবং তাহার দ্বারাই ভারতের স্বাধীনতা লাভ হইয়া যাইবে।

গান্ধীজী ১৯৩২এর আন্দোলনের সময়ে বলিয়াছিলেন, 'অহিংসার আদর্শ হইল শত্রুকেও ভালবাসিতে হইবে। অথচ তাহার অত্যাচারের যন্ত্রটিকে ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। তোমরা মনে মনে শত্রুর প্রতি প্রেম অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিও। কিন্তু যদি না পার, অন্তত তাহাকে ঘৃণা করিও না। তেমনি অহিংসা মনের মধ্যে বজায় রাখিতে পারিলেই আমাদের কাজ হইয়া যাইবে।'

এইটুকু কি আমরা পারিব না?

বর্ণাশ্রম ও জাতিভেদ সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীজীর মত

কিছুদিন পূর্বে মহাত্মা গান্ধী "Caste has to go" নামে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বলেন যে, ভারতের জাতিভেদ প্রথা অত্যন্ত হানিকর এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহের দ্বারা উহার উচ্ছেদ সাধন করা প্রয়োজন। অথচ গান্ধীজীর পুরাতন লেখার মধ্যে দেখা যায় তিনি অবাধ বিবাহ সম্বন্ধকে এক সময়ে নিন্দা করিয়াছিলেন, সমাজ যে আমাদের স্বেচ্ছাচারিতা নিবারণ করিয়া সংযমের বন্ধন আনিবার জন্য এই ব্যবস্থা করিয়াছে তাহার জন্য তিনি উহার প্রশংসা করিয়াছিলেন।

গান্ধীজীর উল্লিখিত প্রবন্ধটি বাহির হইবার পর এই কথা লইয়া আমার জনৈক বন্ধুর সঙ্গে একদিন আলোচনা হইতেছিল। আলোচনা প্রসঙ্গে আমার মনে হইয়াছিল যে গান্ধীজীর বর্ণাশ্রম এবং জাতিভেদ সম্বন্ধে ঠিক ঠিক মত কি, তাহা অনেকের জানা নাই। অতএব আপাতদৃষ্টিতে উপরে উল্লিখিত দুইটি উক্তি পরস্পর বিরোধী মনে হইতে পারে, সেইজন্য ইচ্ছা ছিল যে, এ বিষয়ে একবার কিছু আলোচনা করিব। কিন্তু নানা কারণে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। সম্প্রতি গান্ধীজী হরিজন পত্রিকায় পণপ্রথার বিরুদ্ধে এক প্রবন্ধ লিখিতে গিয়া পুনরায় বিষয়টির উত্থাপন করিয়াছেন বলিয়া ইহার আলোচনা প্রয়োজন বোধ হইতেছে।

পণপ্রথা প্রসঙ্গে গান্ধীজী লিখিয়াছেন, "পণপ্রথা দূর করিতে

হইবে। বিবাহের সময়ে উভয় পক্ষের কর্তাদের মধ্যে টাকাকড়ির ব্যাপার লইয়া যেরূপ বন্দোবস্ত হয় তাহা সম্পূর্ণরূপে নিবারণ করিতে হইবে। আসল কথা পণপ্রথার সঙ্গে জাতিভেদের একটা নিবিড় সম্বন্ধ আছে। যতদিন পর্যন্ত জাতিভেদের কারণে বর বা কন্যার জন্য বিশেষ একটি জাতির কয়েক শত পাত্রী বা পাত্রের মধ্যে নির্বাচন আবদ্ধ রাখিতে হইবে ততদিন পণপ্রথা দূর করা যাইবে না। শুধু ইহার বিরুদ্ধে প্রচার করিয়া কিছু লাভ হইবে না। সমাজের বর এবং কন্যা এবং তাহাদের অভিভাবকগণের পক্ষে জাতিভেদের বন্ধনকে ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে।"

ইহা হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় গান্ধীজী বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহের দ্বারা জাতিভেদের বর্তমান ব্যবস্থাকে ভাঙিয়া ফেলিতে চান। অথচ আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে গান্ধীজী নিজেই এক সময়ে অবাধ বিবাহকে নিন্দা করিয়াছিলেন।

ইহার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতে হইলে গান্ধীজীর সামাজিক আদর্শের বিষয় জানা প্রয়োজন। গান্ধীজী মনে করেন যে, জগতে প্রতি মানুষ কতকগুলি বিশেষ বিশেষ গুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করে। শুধু যে সে বিশেষ কতকগুলি ক্ষমতারই অধিকারী হয়, তাহা নহে। আমাদের সকলের শক্তিরও কতকগুলি স্বাভাবিক সীমা নির্দিষ্ট থাকে। আমরা যদি নিজেদের শক্তির সীমা স্বীকার করিয়া লই এবং তদনুযায়ী জীবনের কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই, তাহা হইলে অনেক মনস্তাপের দুঃখ হইতে আমরা বাঁচিয়া যাই।

সংসারে কেহ নিজের জ্ঞানের দ্বারা মানবকুলের সেবা করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করে। কাহারও বাহুবল অধিক, কেহ স্বীয় ব্যবসায়-বুদ্ধি দ্বারা এবং কেহ বা শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা মানবজাতিকে সেবা

করিবার চেষ্টা করে। ইহাদের লইয়া জগতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র চারি বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্বকালে যখন সমাজ নির্দেশ করিয়া দিত এই ব্যক্তি ব্রাহ্মণ, এই ব্যক্তি ক্ষত্রিয়, তখন সে প্রত্যেক ব্যক্তির বিশিষ্ট গুণের রূপ নির্দেশ করিয়া দিত এবং তদনুযায়ী তাহাকে স্বীয় কর্ম নির্বাচন করিবার বিষয়ে সহায়তা করিত।

গান্ধীজী মনে করেন যে সেই সমাজই ভাল যে সমাজে জন্মগত গুণ অনুসারে মানুষ কর্ম করিতে পায়, তাহার স্বাভাবিক শক্তিকে স্ফুরিত করিবার সুযোগ লাভ করে। যে সমাজ মানুষকে স্বাভাবিক ক্ষমতা অনুসারে লোকসেবার সুযোগ দেয় তাহা ভাল এবং যে সমাজ তাহা পারে না বরং ব্রাহ্মণকে দিয়া ক্ষত্রিয়ের কাজ করায়, বৈশ্যের দ্বারা ব্রাহ্মণের কায চালনা করে তাহা মন্দ। বর্ণব্যবস্থা গান্ধীজীর নিকট স্বাভাবিক এবং প্রকৃতির অভিপ্রেত ব্যবস্থা বলিয়া মনে হয়।

মনুও বর্ণব্যবস্থাকে সেইরূপ ভাবিতেন, তবে গান্ধীজীর মতের সহিত মনুসংহিতার মতের কিছু কিছু প্রভেদ আছে। মনু শূদ্রদের নীচু এবং ব্রাহ্মণদের অত্যন্ত উঁচু স্থান দিয়াছিলেন। গান্ধীজী তাহার বিরোধী। সকলে সমান ইহাই গান্ধীজী স্বীকার করেন এবং তিনি ইহাও বলেন যে বর্ণব্যবস্থার দ্বারা শুধু কে কোন্ উপায়ে জগতের সেবাকার্য করিবে তাহাই নির্দিষ্ট হইয়া থাকে, ইহাতে অন্নসংস্থানের উপায় নির্দিষ্ট হয় না।

জীবনধারণের জন্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র চারি বর্ণকেই কায়িক পরিশ্রম করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ স্বধর্ম পালন করিলেও যে স্বীয় জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় কায়িক পরিশ্রম হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে তাহা নহে। স্বীয় জীবন রক্ষার জন্য কায়িক পরিশ্রম করা সর্বসাধারণের পক্ষে পালনীয় ধর্ম। তাহাদের স্বধর্মের

প্রভেদ হইল, কে কোন্ উপায়ে লোকসেবা করিবে তাহারই ব্যবস্থা লইয়া।

এইবার বিবাহের বিষয় অবতারণা করা যাক। গান্ধীজীর ধারণা মানুষের গুণ কিয়দংশে বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয়। তিনি আরও মনে করেন ব্রাহ্মণ বর্ণের কন্যার পক্ষে ব্রাহ্মণ বর্ণের বর অধিক প্রিয় হইবে। লোকে স্ব স্ব বর্ণের মধ্যে বিবাহ করিতে চাহিবে, ইহাকে তিনি "স্বাভাবিক" মনে করেন। সেইজন্য বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহকে তিনি খুব পছন্দ করেন না। পূর্বে তিনি অসবর্ণ বিবাহের নিন্দা করিতেন, আজকাল বলেন যে, সেরূপ বিবাহের দ্বারা বর্ণব্যবস্থা বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয় না।

কিন্তু জাতিভেদ সম্বন্ধে গান্ধীজীর মত একেবারেই অন্যরূপ। তিনি জাতিভেদকে বর্ণাশ্রমের অপভ্রংশ বলিয়া বিবেচনা করেন। তিনি একবার একথাও বলিয়াছিলেন যে, প্রাচীন বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে যদি আমাদের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা থাকে, যদি আমাদের স্বীয় বর্ণ প্রকৃতই কি তাহা স্বীকার করিতে লজ্জা না হয়, তাহা হইলে আমাদের সকলের বলা উচিত যে আমরা সবাই শূদ্র। ইংরেজের কাছে পদানত সকলেই আমরা যখন দাস, স্বীয় বর্ণানুক্রমিক কর্ম করিতে কেহই যখন পারিতেছি না, দাসের কর্মের দ্বারা যখন সকলকে জীবন ধারণ করিতে হইতেছে, অন্নের সংস্থান করিতে হইতেছে, তখন আমরা শূদ্র ভিন্ন আর কি?

জাতিভেদ এবং বর্ণভেদ কদাপি এক নহে। জাতিভেদ শুধু মানুষে মানুষে ভেদ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি নির্দিষ্ট করিবার জন্য জাতিভেদ নয়, তাহাদের অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তি অনুসারে কর্মের সুযোগ দিবার জন্যও ইহা নাই, কেননা সমাজ আজ সে শক্তি হারাইয়াছে। অতএব আজ আমাদের বর্ণাশ্রম মানিতে হইলে বলা

উচিত যে আমরা সকলে শূদ্র এবং সেই শূদ্রগণের মধ্যে ভেদাভেদ দূর করিবার জন্য গান্ধীজী সকল শূদ্রের মধ্যে অন্তর্বিবাহের পক্ষপাতী। তাহার দ্বারা সকলে মিলিত হইয়া এক হইতে পারিবে এবং সমাজ বহু সঙ্কীর্ণতার বন্ধন হইতে মুক্তি পাইয়া শক্তিশালী হইবে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন।

ইহাই গান্ধীজীর মত। তাঁহার কাছে বর্ণ এবং জাতি এক নহে। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে বলিয়া একটির বেলায় অবাধ বিবাহ নিরুদ্ধ করাকে তিনি স্বাভাবিক এবং মঙ্গলজনক মনে করেন, কিন্তু অপরটির বেলায় তাহা করেন না। একটির তিনি প্রতিষ্ঠা চান, অপরটির উচ্ছেদ সাধন করিতে চান। একটিকে তিনি মঙ্গলের নিদান বলিয়া বিবেচনা করেন, অপরটিকে দুঃখের আকর ভিন্ন আর কিছু মনে করিতে পারেন না।

মহাত্মা গান্ধীর 'বর্ণাশ্রম'

হিন্দু সমাজের বর্ণধর্ম ও রুশিয়ার কমিউনিজমের আদর্শে গঠিত সোসিয়ালিষ্ট রিপাব্লিকের মধ্যে দু'এক বিষয়ে মিল আছে, আবার কয়েক বিষয়ে দারুণ প্রভেদও আছে। মিলের মধ্যে দেখা যায় যে, বর্তমান ক্যাপিটালিষ্ট সমাজে মানুষকে স্বাধীনভাবে বৃত্তি নির্ধারণ করিতে দিবার যে প্রথা আছে, তাহা প্রাচীন হিন্দু সমাজে ও রুশিয়াতে অস্বীকৃত হইত। প্রাচীন সমাজে জন্মের দ্বারা লোকের বৃত্তি নিরূপণ করা হইত এবং রাজার কাজ ছিল তিনি প্রজাগণের মধ্যে বৃত্তিভেদ ঘটিতে দিবেন না, অর্থাৎ কোনও রকমে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইতে দিবেন না। রুশিয়াতে বৃত্তিশাসনের নিয়মটি ভিন্ন প্রকারের বটে এবং তাহা আরও বাঁধাবাঁধির সঙ্গে পালন করা হইয়া থাকে। সেখানে রাষ্ট্রপতিরা দেশে মোটের উপর কত গম, লোহা, কলকব্জা, কাপড় প্রভৃতির চাহিদা আছে তাহা নিরূপণ করিয়া দেন। ব্যক্তিবিশেষের এইটুকু স্বাধীনতা আছে যে সে লোহার কারখানায় কাজ করিবে কি তুলার কলে করিবে, ইহাই সে বাছিয়া লইতে পারে, কিন্তু স্বেচ্ছায় বেশি লাভের আশায় যে-কোনও কলকারখানা স্থাপন করিয়া রাষ্ট্রপতিদের উৎপাদনব্যবস্থার মধ্যে গোলযোগ ঘটাইতে পারে না। রুশিয়া এবং ভারতবর্ষ এইভাবে মানুষের আর্থিক কর্মচেষ্টার স্বাধীনতা স্বীকার না করিয়া এক বিষয়ে প্রজাগণের স্বাধীনতা স্বীকার করে। উভয় দেশেই সকল জাতিই স্বীয় ধর্ম, আচার অথবা মোটের উপর তাহাদের সংস্কৃতির বিষয়ে স্বাধীনতা ভোগ করে। কেবল সেই সংস্কৃতির উপরে ভারতবর্ষে বেদান্ত সম্বন্ধে শেখানো হইত এবং রাশিয়াতে বর্তমান বিজ্ঞানমূলক সংস্কৃতি বিষয়ে শিক্ষাদান করা হইয়া থাকে।

এই দুই বিষয়ে মিল থাকিলেও এক বিষয়ে দুইটি সমাজের মধ্যে খুব প্রভেদ দেখা যায়। ভারতবর্ষে কামার, কুমার, তাঁতি, স্বর্ণকার, চর্মকার প্রভৃতি সকলে শূদ্র বলিয়া গণ্য হয়। অধ্যাপক, পুরোহিতেরা, ব্রাহ্মণ এবং শাসক সম্প্রদায় সচরাচর ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। মনুসংহিতার আইন অনুসারে বিভিন্ন বর্ণকে দুইটি বা তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। ব্রাহ্মণের বা ক্ষত্রিয়ের অধিকারের সহিত শূদ্রের অধিকার সমান একথা কোথাও স্বীকার করা হয় নাই, বরং দুই শ্রেণীর মধ্যে যথেষ্ট তারতম্য স্বীকৃত হইয়াছিল। ইহা ভাল কি মন্দ ছিল, ইহার প্রয়োজন ছিল কি অপ্রয়োজন ছিল, তাহার বিচার না করিলেও আমরা একথা বলিতে পারি যে, দুই শ্রেণীর মধ্যে সামাজিক প্রতিপত্তিতে ও মর্যাদায় এবং আইনের অধিকারে যথেষ্ট ভেদ ছিল।

কিন্তু এই সঙ্গে একটি কথা বলা দরকার। সমাজ ও রাষ্ট্রে উল্লিখিত ব্যবধানের সঙ্গে সঙ্গে আয়ের বৈষম্য ছিল ইহা আমরা ধরিয়া লইতে পারি। ধনবৈষম্যের দোষ কাটাইবার জন্য প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থে এবং ধর্মশাস্ত্রে কতকগুলি ব্যবস্থা দেখা যায়। তাহার উল্লেখ করা প্রয়োজন। মনুসংহিতা, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে ব্রাহ্মণগণের পক্ষে দারিদ্র্য গ্রহণ অতিশয় প্রশংসনীয় কীর্তি বলা হইয়াছে। তদ্ভিন্ন অপরাপর ধনী ব্যক্তিরা যাহাতে সাধারণের উপকারার্থে অর্থব্যয় করেন, এইজন্য মন্দির-নির্মাণ, টোল-সংস্থাপন, কূপ-খনন, পথ-নির্মাণ প্রভৃতিকে অতিশয় পুণ্যের কাজ বলা হইয়াছে। বর্তমান কালে খাজনা ও ট্যাক্সের দ্বারা ধনীর ভাণ্ডার হইতে অর্থসংগ্রহ করিয়া সাধারণের উপকারার্থে তাহা ব্যয় করার প্রথা দাঁড়াইয়াছে। প্রাচীনকালে হয়তো রাষ্ট্রপতিরা মনে করিতেন ভয়ের চেয়ে পুণ্যের লোভে মানুষকে সংকাজ করানো শ্রেয়ঃ, নয়তো সে সময়ে রাষ্ট্রযন্ত্রের হাতে এমন ক্ষমতা ছিল না যাহার দ্বারা ধনীর নিকট হইতে প্রয়োজনমত

ট্যাক্স বা খাজনা আদায় করিতে পারে। যাহাই হউক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্যের আদর্শের কোনও প্রমাণ না থাকিলেও প্রাচীন ভারতবর্ষে ধনবৈষম্যের দোষকে পুণ্যবুদ্ধি জাগ্রত করিয়া খানিকটা উপশম করিবার ব্যবস্থা ছিল, ইহা আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই। এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে পাই যে ধনোৎপাদনের যাবতীয় সাধনের উপর, অর্থাৎ জমি, মূলধন প্রভৃতির উপর, ব্যক্তিবিশেষের মালিকানা স্বত্ব স্বীকৃত হইত, সাধারণের তাহার উপর কোনও অধিকার আছে ইহা আদর্শ হিসাবেও স্বীকৃত হয় নাই।

রুশিয়া কিন্তু এ বিষয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। ব্যক্তিবিশেষের ভোগ-সামগ্রীর উপর মালিকানা স্বত্ব স্বীকার করিলেও ধনোৎপাদনের সাধনের উপর তাহার কোনও স্বত্ব স্বীকৃত হয় না। সেগুলি রাষ্ট্রের আয়ত্তাধীন আছে। কেবল রাষ্ট্র যে-ক্ষেত্রে সকল জমির উপরে স্বীয় অধিকার ব্যবহার করিতে পারিতেছে না, সে-ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষকে সে স্বত্ব দিয়া রাষ্ট্রসভায় সেই ব্যক্তির অধিকারকে সঙ্কুচিত করিয়া দেওয়া হইতেছে' যে চাষী জমির উপর ব্যক্তিগত অধিকার ভোগ করে, তাহার ভোট দিবার ক্ষমতাও কাড়িয়া লওয়া হয়, অথবা যে সাধারণ ক্ষেত্রে মজুরি করে তাহাকে অতিরিক্ত রাষ্ট্রীয় অধিকার দেওয়া হয়। এইভাবে রুশিয়া ধনোৎপাদনের সকল সাধনের উপর একাধিপত্য প্রসারের ব্যবস্থা করিতেছে। দুই দেশের ব্যবস্থার মধ্যে ইহা একটি বড় প্রভেদ।

দ্বিতীয়ত, রুশিয়াতে রাষ্ট্র একটি দলবিশেষের দ্বারা শাসিত হয়। ইহার নাম কমিউনিষ্ট পার্টি। এখন পর্যন্ত পার্টি সভ্যগণের ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য দেশ শাসন করিতেছেন না, তাঁহারা দেশের সৈন্যদলের স্বার্থের উপরও লক্ষ্য রাখেন না, কেবলমাত্র শিক্ষিত জনগণ বা মধ্যবিত্ত

সম্প্রদায়ের বণিক, কেরাণী প্রভৃতির প্রতিনিধিও তাঁহারা নহেন , তাঁহারা আসলে দেশের যে শ্রেণী ধনোৎপাদন করিতেছে, যাহাদের পরিশ্রমের দ্বারা কলকব্জা ও অন্নবস্ত্র প্রভৃতি উৎপন্ন হইতেছে, তাহাদের প্রতিনিধিস্বরূপ কার্য করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে রুশিয়ার সৈন্যদলকে গোনা হইয়াছে, তাহাদের প্রতিনিধিবর্গও রাষ্ট্র শাসনের অধিকার লাভ করিয়াছে। চাষী, মজুর ও সৈনিকগণ সাক্ষাৎভাবে রাষ্ট্র পরিচালনায় অক্ষম বলিয়া কমিউনিষ্ট পার্টি তাহাদের প্রতিনিধিস্বরূপ সেই কার্য চালাইতেছে এবং স্বীয় পার্টির মধ্যে মজুরদের মধ্য হইতে অনেক প্রতিনিধিও গ্রহণ করিয়াছে।

প্রাচীন ভারতবর্ষে ক্ষত্রিয়গণই প্রধানত দেশশাসন করিতেন। তবে ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে নিজে আইন রচনা করিবার ক্ষমতা ছিল না। ব্রাহ্মণেরা প্রাচীন মুনি-ঋষিগণের দ্বারা প্রবর্তিত নীতিশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া দিতেন, শাসক-সম্প্রদায় সেই আইন কার্যে প্রয়োগ করিবার ভার গ্রহণ করিতেন মাত্র। অর্থাৎ দেশের শাসনকার্য প্রধানত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের হস্তে অর্পিত ছিল। তাহার ফলে ভাল কিছু হইলেও মন্দ ফলও অনেকাংশে ফলিয়াছিল। শূদ্রগণকে সর্বদাই অনেক অধিকারে বঞ্চিত থাকিতে হইয়াছিল এবং পরবর্তীকালের ইতিহাসে যখন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়েরা অত্যধিক ভোগবিলাসের ফলে পঙ্গু হইয়া পড়িলেন, তখন অনায়াসে বাহিরের শত্রু আসিয়া ভারতবর্ষকে পরাধীন করিয়া ফেলিল। শূদ্রশ্রেণীর হাতে রাষ্ট্রের ক্ষমতা আর একটু বেশি থাকিলে অথবা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়েরা একেবারে ঘুমাইয়া না পড়িলে, অর্থাৎ ভারতের বাহিরে যুদ্ধের যে সকল নব নব কৌশল উদ্ভাবিত হইতেছিল, যেমন অশ্বের সমধিক ব্যবহার বা কামান-বন্দুকের প্রয়োগ, সেগুলির সম্বন্ধে সজাগ থাকিলে হয়তো ভারতবর্ষের এই দশা হইত না। যাক সে কথা।

তাহা হইলেই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, প্রাচীন ভারতবর্ষ এবং বর্তমান রুশিয়ার মধ্যে ধনবণ্টনের আদর্শের বিষয়ে যেমন প্রভেদ ছিল, রাষ্ট্র শাসনের অধিকার বিষয়েও তেমনই আছে। সেইজন্ত রুশিয়াতে রাষ্ট্রের প্রকৃত অধিকার সংখ্যালঘিষ্ঠ ধনিক ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর হাত হইতে ধনোৎপাদক শূদ্রশ্রেণীর হাতে পরোক্ষভাবে পর্যবসিত হইয়াছে।

এই কথাগুলি স্মরণ রাখিয়া আমরা মহাত্মা গান্ধীর রাষ্ট্রীয় আদর্শ এবং তাঁহার সাধনোপায়ের সম্বন্ধে আলোচনা করিব। মহাত্মা গান্ধী প্রায়ই বলিয়া থাকেন যে তিনি পুনরায় বর্ণাশ্রমধর্ম প্রবর্তিত করিতে চান, তবে তাহার দোষগুলিকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিতে চান। আমাদের এখানে বুঝা দরকার তিনি ইহার মধ্যে কি কি দোষ দেখিয়াছেন এবং কোন্ কোন্ গুণের জন্যই বা ইহার পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছেন।

মহাত্মা গান্ধীর ধারণা, প্রাচীন ভারতবর্ষে বর্ণধর্মের আদর্শের মধ্যে শ্রেণীভেদের ব্যবস্থা ছিল না, উহা পরবর্তীকালে লোকে স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া করিয়াছে। বর্ণধর্মের মূলকথা হইল, প্রতি মানুষের যে সহজাত প্রবৃত্তি আছে, তাহাকে তদনুসারে কর্মের সুযোগ দেওয়া। তিনি মনে করেন, মানুষের কর্মপ্রবৃত্তি কতকাংশে জন্মের দ্বারা নির্ধারিত হয়, অতএব জাতিগত বৃত্তি অনুসরণ করাই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক এবং বৃত্তি-নিরূপণে মানুষের কোনরূপ স্বেচ্ছাচারিতা স্বীকার করা মানবসমাজের পক্ষে কল্যাণকর নহে।

মহাত্মা গান্ধী বলেন, "প্রতি মানুষের শরীরের গঠনের সঙ্গে যেমন তাহার পিতামাতার গঠনের খানিকটা সৌসাদৃশ্য আছে আমার বিশ্বাস তাহার চরিত্রের ও মনোবৃত্তির মধ্যেও তেমনই কিছু মিল থাকে। মনোবৃত্তি বংশপরম্পরাগত বস্তু, ইহা স্বীকার করিয়া লইলে আমাদের জীবনের অনেক বৃথা পরিশ্রম বাঁচিয়া যায়। আমরা যদি খোলাখুলিভাবে

একথা স্বীকার করিয়া লই, তাহা হইলে আমাদের আর্থিক উন্নতির লোভ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা গোড়া হইতেই সংযত হয় এবং তাহার পরিবর্তে আমাদের কর্মচেষ্টাকে আমরা সাংসারিক ব্যাপারে নিয়োগ না করিয়া আধ্যাত্মিক সাধনায় নিয়োগ করিতে পারি। ইহাই হইল বর্ণাশ্রম-ধর্মের মূলতত্ত্ব।"

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৯।৯।১৯২৭)

"আমি হিন্দুধর্মের যতটুকু বুঝি, তাহা হইতে মনে হইয়াছে যে, বর্ণধর্মের অর্থ অতিশয় সহজ ও সুস্পষ্ট। প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় জীবিকা উপার্জনের জন্য নিজের বংশ অথবা জাতিগত বৃত্তি অনুসরণ করিবে, ইহাই বর্ণধর্ম পালনের সরল অর্থ, অবশ্য সে বৃত্তি ন্যায়ধর্মের বিরোধী হইলে তাহাকে পরিহার কিরিতে হইবে।"

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২০।১০।১৯২৭)

"মানুষে যদিও মনোবৃত্তিগুলি বংশানুসারে লাভ করে, অর্থাৎ যদিও মানুষের বর্ণ জন্মের দ্বারা সূচিত হয়, তবু সেই বৃত্তিমূলক কার্য সম্পন্ন না করিলে মানুষের জন্মগত বর্ণ বজায় থাকে না। সে বর্ণ হইতে তাহার বিচ্যুতি ঘটে।"

(হরিজন, ১৫।৪।১৯৩৩)

১৯২১ সালে তিনি বলিয়াছিলেন, "ঈশ্বরের সৃষ্টি রক্ষা করিবার জন্য ব্রাহ্মণকে জ্ঞানের দ্বারা, ক্ষত্রিয়কে শক্তির দ্বারা, বৈশ্যকে বাণিজ্যকৌশলের দ্বারা এবং শূদ্রকে শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা মানবের কল্যাণ সাধন করিতে হইবে। কিন্তু ইহার অর্থ এরূপ নহে যে, ব্রাহ্মণ শারীরিক পরিশ্রমের দায় হইতে মুক্তি পাইবে, অথবা অপরকে বা নিজকে ক্ষাত্রশক্তি প্রয়োগের দ্বারা রক্ষা করিবার ভার হইতে বাঁচিয়া যাইবে।"

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১২।১০।১৯২১)

"অন্নের জন্য শারীরিক পরিশ্রম করার মত কল্যাণকর অভ্যাস কম আছে। সকল বর্ণের পক্ষেই এই শ্রম অপরিহার্য। যে কোনও প্রকার শ্রম করিলেই কিন্তু চলিবে না। ন্যায়ধর্মের দৃষ্টিতে আমরা বুঝিতে পারি যে চাষবাস সংক্রান্ত কাজ করাই ইহার অর্থ। অবশ্য আজকাল সকলে চাষবাসের সুযোগ লাভ করিতে পারে না। সেইজন্য তাহারা সূতা কাটা বা কাপড় বোনার কাজও করিতে পারে, কিন্তু সর্বদা চাষের পরিশ্রমকে তাহাদের আদর্শ পরিশ্রম বলিয়া স্মরণ রাখিতে হইবে।"

(য়েরোডা মন্দির হইতে লিখিত পত্রাবলি)

অর্থাৎ তাঁহার ধারণা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি যাহাই হউক না কেন মানুষে সেই প্রবৃত্তির অজুহাতে সমাজের বাকি লোকের কাছে নিজের জীবনধারণের জন্য অন্নসংস্থান করিতে পারিবে না। অন্নসংস্থানের জন্য মানুষকে নিজে হাতে চাষের কাজ করিতে হইবে, নয়তো এমন কাজ করিতে হইবে যাহার সঙ্গে চাষবাসের বা বস্ত্র-উৎপাদনের সাক্ষাৎভাবে কোনও সম্বন্ধ থাকে।

ইহা হইতে বেশ বোঝা যায় যে, মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষের প্রাচীন বর্ণাশ্রমের কথা বলিলেও তিনি মনুসংহিতার বর্ণাশ্রম হইতে বিভিন্ন সমাজব্যবস্থার কথা ভাবেন। ইউরোপীয় লেখকগণের মধ্যে টলষ্টয় এবং রাস্কিন গান্ধীজীর উপরে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। ধনের অসামঞ্জস্য হেতু সমাজে কিরূপ দারুণ অকল্যাণের সৃষ্টি হয়, তাহা উভয়ে দেখাইয়াছিলেন, মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে সাম্যতন্ত্রের প্রতি যে টান দেখা যায়, তাহার জন্য এই দুইজনের শিক্ষা অনেকাংশে দায়ী। কিন্তু সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধার সমান বণ্টনে বিশ্বাস করিলেও চুলচেরাভাবে আয়ের সমতা বিধান করা সম্ভব হইবে না বলিয়া গান্ধীজী আয়ের কিছু

অসমতাকে সমর্থন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ১৯২৭ সালে তিনি বলিয়াছিলেন, "ধনের সমান বণ্টন করাই আমার আদর্শ। কিন্তু আমি যতদূর দেখিতে পাইতেছি, তাহা কার্যত সম্ভব নয়। সেইজন্য আমাকে ধনের ন্যায়সঙ্গত বণ্টনের চেষ্টা করিতে হইতেছে।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৭।৩।১৯২৭)

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আংশিক প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেও গান্ধীজী অপর এক বিষয়ে কমিউনিষ্টগণের আদর্শের সহিত কতকাংশে একমত। গান্ধীজী মনে করেন, রাষ্ট্রের প্রকৃত মালিক শিক্ষিত জনগণ বা বণিক-সম্প্রদায় হইলে চলিবে না। ইহাকে "জনগণের" অধীন করিতে হইবে। ধনীদের তিনি বাদ দিতে চান না, তাহাদের রাষ্ট্রাধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চান না বটে, তবে দেশে ধনী, নির্ধন সকলকে এক সঙ্গে রাষ্ট্রের প্রকৃত অধিপতি করিতে চান।

"আমার মতে ভারতবর্ষের, এমন কি সমগ্র পৃথিবীর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত, যেন অন্নবস্ত্রের অভাব না ঘটে অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় অন্নবস্ত্র উপার্জনের জন্য কাজ করিবার সুযোগ যেন লাভ করে। যদি অন্ন উৎপাদন করিবার সাধনগুলি জনগণের আয়ত্তাধীন থাকে, তবে ইহা সম্ভব হইবে।"

(And this ideal can be universally realised only if the means of production of the elementary necessaries of life remain in the control of the masses) **(*Young India*, 15. 11. 1928)**

তবে রুশিয়ার সঙ্গে তফাৎ হইল এই যে, "masses" বলিতে তিনি শুধু শূদ্রগণকে (Proletariate) বুঝেন না, দেশের ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলকেই বুঝেন। তাঁহার দৃঢ় ধারণা, সমস্ত জনগণের সম্মিলিত স্বার্থ একটিমাত্র আছে, তাহাকে খণ্ড খণ্ড শ্রেণী-

স্বার্থে ভাগ করা উচিত নয়, যখনই কেহ স্বীয় শ্রেণীর স্বার্থপুষ্টি করিবে তখনই সে মানবজাতিকে এক না করিয়া বহু করিয়া ভাবিতে বাধ্য হইবে এবং ইহা শেষ পর্যন্ত সেই শ্রেণীর কল্যাণেরও বিরোধী। অতএব সকলের সম্মিলিত কল্যাণই একমাত্র কল্যাণ। সেইজন্য রাষ্ট্রকে তিনি শুধু শূদ্রগণের কল্যাণের অভিভাবক করিতে চান না, সকলের সম্মিলিত কল্যাণের অভিভাবক করিতে চান। ইহা কমিউনিজমের সঙ্গে মিলও বটে, তফাৎও বটে।

"আমি যে স্বরাজের কল্পনা করি তাহা দরিদ্র জনগণের স্বরাজ। জীবন ধারণের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা রাজন্যবর্গ অথবা ধনী ব্যক্তিরা যেমনভাবে ভোগ করেন তোমরাও তেমনই ভাবে ভোগ করিবে। কিন্তু ইহার অর্থ এরূপ নহে যে রাজন্যবর্গের মত তোমাদের রাজপ্রাসাদে বাস করিতে হইবে। সুখের জন্য প্রাসাদের কোনও প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ধনীরা জীবনযাত্রার যে সকল প্রয়োজনীয় বস্তু ব্যবহার করিয়া থাকেন, সেগুলি তোমাদের থাকা চাই। আমার এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই যে যে-স্বরাজে সেগুলি সকলকে দেওয়া না যাইবে তাহা পূর্ণ স্বরাজই নহে।"

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৬।৪।১৯৩১)

"আমার আদর্শ স্বরাজে ধর্মগত অথবা জাতিগত (racial) কোনও ভেদাভেদ থাকিবে না। ইহা শুধু ধনীদের অথবা কোনও জাতিবিশেষের মায়ত্তাধীন হইবে না। স্বরাজে সকলেই ক্ষমতা ভোগ করিবে। তাহাতে ধনীও থাকিবে, কিন্তু তাহার মধ্যে অতি অবশ্য অন্ধ, খঞ্জ, দরিদ্র, পরিশ্রমজীবী সমস্ত জনগণও থাকিবে। সকলে অধিকার লাভ করিবে।"

(Selections from Gandhi, p 88)

"বস্তুত অহিংসাধর্মের প্রকৃত পালনকারীর পক্ষে ইউরোপে প্রচলিত

"greatest good of the greatest number" নীতিটি মানা চলে না। তাহার পক্ষে কাহাকেও বাদ দিলে চলিবে না, তাহাকে পৃথিবীর সকলের ভালর জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। সমগ্র মানবের পক্ষে যাহা ভাল তাহাই সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীর পক্ষেও শেষ পর্যন্ত সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণপ্রদ।"

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৯।১২।১৯২৬)

ইহা হইতে আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, গান্ধীজীর বর্ণাশ্রম বলিতে প্রাচীন ভারতবর্ষের বর্ণাশ্রমের একটি সোসিয়ালিষ্ট সংস্করণ বুঝায়। গান্ধীজী নিজেও একথা ভাবেন বলিয়া একবার বর্তমান লেখককে বলিয়াছিলেন, "ইউরোপে কেহ কেহ আমাকে একরকম সোসিয়ালিষ্ট বলিয়া মনে করে এবং তাহা ভুল নহে।" প্রাচীন ভারতীয় সমাজের প্রতি তিনি মমতা হারান নাই বলিয়া তিনি ইহাকে নূতন সাম্যবাদের আদর্শের বহ্নিতে পরিশুদ্ধ করিয়া লইতে চান। ১৯২১ সালে তিনি বলিয়াছিলেন, "যে মুহূর্তে আমরা পাপপুণ্যের বিচার ছাড়িয়া দিয়া ক্রীতদাসের মত প্রাচীন কালের সকল ব্যবহার অনুকরণ করিব সেই মুহূর্তে আমাদের মৃত্যু ঘটিবে। প্রাচীন কালের বহু মূল্যবান সামগ্রী আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছি, কিন্তু প্রাচীন কালের ভ্রান্তিগুলির অনুকরণ করিয়া আমরা যেন আমাদের রাজগীর অবমাননা না করি।"

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৫।৯।১৯২১)

মহাত্মা গান্ধী, বলশেভিজম ও বিপ্লববাদ

১৯২৮ সালে গান্ধীজীকে জনৈক ভদ্রলোক বলশেভিজম সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন। উত্তরটি পুরাতন হইলেও একটি বিশেষ কারণে আজও তাহার যথেষ্ট মূল্য আছে। কমিউনিজমের একটি লক্ষ্য হইল ব্যক্তিগত সম্পত্তি তুলিয়া দেওয়া। সে বিষয়ে যে গান্ধীজীর সহানুভূতি আছে, ইহা অনেকের হয়তো জানা নাই, সেইজন্য ইহা জানিয়া রাখা ভাল।

গান্ধীজীকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল,

"বলশেভিজম যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত, তাহার সম্বন্ধে আপনার মত কি? আমাদের দেশে তাহা কতখানি প্রয়োগ করা যাইতে পারে?"

গান্ধীজী উত্তরে বলিয়াছিলেন, "আমাকে স্বীকার করিতে হইতেছে যে আমি বলশেভিজমের অর্থ পুরাপুরি বুঝিতে পারি নাই। আমি যতটুকু পড়িয়াছি তাহা হইতে জানি যে বলশেভিকগণ ব্যক্তিগত সম্পত্তি জগৎ হইতে বিলুপ্ত করিতে চান। নীতির ক্ষেত্রে অপরিগ্রহ বলিতে যাহা বুঝায়, ইহা তাহা হইতে অভিন্ন। লোকে যদি অর্থনৈতিক জগতে অপরিগ্রহ স্বেচ্ছায় বরণ করে, তাহা অপেক্ষা ভাল কিছু হইতে পারে না। অথবা যদি তাহাদিগকে অহিংস উপায়ের দ্বারা এই মতে আনা যায়, তবে বলিবার কিছু থাকিবে না। কিন্তু বলশেভিজম সম্বন্ধে আমি যাহা জানি, তাহাতে দেখিয়াছি বলশেভিকগণ শুধু যে অহিংসাকে স্বীকার করেন না তাহা নহে, বরং ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া রাষ্ট্রের অধিকারে আনিতে হিংসার উপায়কে তাঁহারা পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ইহা যদি সত্য হয়, তবে আমি জোর করিয়া বলিতে পারি বলশেভিক শাসনতন্ত্র বর্তমান আকারে বেশিদিন টিকিতে পারে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হিংসার উপরে স্থায়ী কিছু নির্মাণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু সে যাহাই হউক, বলশেভিজমের আদর্শের পিছনে অসংখ্য নরনারীর আত্মদান রহিয়াছে। তাঁহারা নিঃস্বার্থভাবে স্বীয় আদর্শের জন্য সর্বস্ব দান করিয়াছিলেন। যে আদর্শ বহুজনের স্বার্থত্যাগের দ্বারা শুদ্ধ হইয়াছে এবং যাহার পিছনে লেনিনের মত মহামানবের আত্মদান রহিয়াছে, তাহা চিরদিন উজ্জ্বল থাকিবে এবং যতই দিন যাইবে ততই তাহা শুদ্ধতর হইবে।"

গান্ধীজী যে অপরিগ্রহে বিশ্বাস করেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু হঠাৎ বহুলোক অপরিগ্রহী হইয়া যাইবে, ইহা তিনি মনে করেন না। তাহাদের বুঝাইতে হইবে এবং না বুঝিলে অহিংস অসহযোগের অস্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা ইহাদিগের উপরে প্রেমের জোর প্রয়োগ করিতে হইবে। এই অহিংস শক্তিপ্রয়োগের দ্বারা অত্যাচারিগণের শুভ বুদ্ধি উদ্বোধিত হইবে বলিয়া গান্ধীজী দৃঢ় বিশ্বাস করেন। সেইজন্য তিনি বলিয়াছিলেন,

"কমিউনিজম বা সোসিয়ালিজমের সহিত আমাদের একটি মূলগত প্রভেদ আছে। কমিউনিষ্টগণ বিশ্বাস করেন যে মানুষ আসলে স্বার্থপর, কিন্তু আমার ধারণা, তাহারা স্বার্থপর হইলেও তাহাদের মধ্যে নিঃস্বার্থপরতার বীজও লুক্কায়িত আছে, সেইখানেই তাহার মনুষ্যত্ব।" হিংসামার্গের দ্বারা বা বলপ্রয়োগ করিয়া যে মানুষকে পরিবর্তন করা যায় না তাহা নহে, কিন্তু অহিংস শক্তিপ্রয়োগের দ্বারা তাহা স্থায়ীভাবে করা যায় এবং মনুষ্যত্বের বিকাশে সমধিক সহায়তা করা হয়, গান্ধীজী ইহাই বিশ্বাস করেন। বস্তুত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যুদ্ধের পরিবর্তে অহিংস অসহযোগের

প্রবর্তনই গান্ধীজীর পক্ষে শ্রেষ্ঠতম দান বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে।

কেহ কেহ মনে করেন হিংসা এবং রক্তপাতকে গান্ধীজী এতই ভয় পান যে, অসহযোগের মধ্যে রক্তপাত ঘটিলেই তিনি পিছাইয়া যান। তাঁহাদের মতে চৌরিচৌরায় গান্ধীজীর পশ্চাদ্‌গমন ঐজন্যই ঘটিয়াছিল। কিন্তু ইহা সত্য নহে। ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে এবং ১৯৩০-৩২এর সত্যাগ্রহের সময়ে গান্ধীজী বার বার বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষকে রক্তের নদী পার হইয়া স্বাধীনতায় পৌঁছিতে হইবে, কিন্তু সে রক্ত শুধু অসহযোগিগণের রক্ত। আমাদের আত্মদানের উপরেই স্বরাজের ভিত্তি নির্মিত হইবে। চৌরিচৌরায় তিনি পিছাইয়া গিয়াছিলেন তাহার কারণ এ নয় যে জনতা উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কংগ্রেসের কর্মিগণ জনতাকে অধীনে রাখিতে পারে নাই, এমন কি কংগ্রেসের অনুশাসন অক্ষরে অক্ষরে পালন করে নাই, সেইজন্যই তিনি পিছাইয়া গিয়াছিলেন। পণ্ডিত জওহরলাল সম্প্রতি তাঁহার আত্মজীবনীতে চৌরিচৌরার পিছনে আসল কারণটির খুব সঠিক বর্ণনা দান করিয়াছেন। গান্ধীজী নিজেও ১৯২৫ সালে ইহা স্পষ্টভাবে বলিয়াছিলেন। বাস্তবিক কোনও প্রতিষ্ঠানের কর্মচারিগণ যদি আদেশ পালন না করিয়া চলেন, তবে প্রতিষ্ঠানের আদর্শ যত বড়ই হউক না কেন, তাহা কখনও সফল হইতে পারে না।

গান্ধীজী অহিংস অসহযোগকে রিফর্ম মনে না করিয়া রেভলিউশন মনে করেন, নরমপন্থা মনে না করিয়া চরমপন্থা বলিয়া বিবেচনা করেন। তিনি বলেন যেখানে সত্যাগ্রহীকে মৃত্যু আহ্বান করিতে বলা হইতেছে, তাহা বিপ্লব ভিন্ন আর কি হইতে পারে? মৃত্যুর অধিক আর কোন্ বিপ্লব আছে?

"কেহ কেহ আমাকে এযুগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী বলিয়াছেন। তাহা সত্য কিনা জানি না। তবে আমি নিজে বিপ্লবী, ইহা আমি বিশ্বাস করি। আমার বিপ্লবে হিংসার স্থান নাই এবং অসহযোগের অস্ত্র প্রয়োগের দ্বারা আমি স্বীয় কার্যসিদ্ধির চেষ্টা করিয়া থাকি।"

বস্তুত ১৯২২ সালে কেহ কেহ গান্ধীজীর বিপ্লবাত্মক মনোভাবের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে অপবাদই দিয়াছিলেন। আন্দোলনের মধ্যে তাঁহার কার্যক্রম দেখিয়া কেহ তাঁহাকে নরমপন্থী বলিয়া মনে করেন নাই। সেই সময়ে এক ইংরেজের সহিত গান্ধীজীর যে পত্রব্যবহার হইয়াছিল, তাহা প্রণিধানযোগ্য। ১৯২২ সালের ২রা ফেব্রুয়ারির ইয়ং ইণ্ডিয়াতে তাহা প্রকাশিত হইয়াছিল। ইংরেজ ভদ্রলোক প্রশ্ন করিয়াছিলেন,

"আপনি কি কখনও ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন এবং জগতের বিভিন্ন জাতি কিভাবে ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হয়, তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন? আপনি কি দেখেন নাই যে মানবসমাজে সকল উন্নতি ধীরে ধীরে সাধিত হইয়া থাকে, বিপ্লব বা ধ্বংসের দ্বারা তাহা কখনও সম্পন্ন হয় না? ঈশ্বর কিভাবে প্রকৃতির মধ্যে পরিবর্তন সাধন করেন, তাহা কি আপনি প্রণিধান করিয়াছেন? বৃক্ষের বৃদ্ধি, জীবজগতের বিকাশ যে ধীর প্রগতির দ্বারা সাধিত হয়, তাহা কি আপনি দেখেন নাই? আকাশের নক্ষত্রের গতি প্রণিধান করিয়াছেন? সূর্য চন্দ্র যাহারা যুগযুগান্তর ধরিয়া রহিয়াছে, তাহাদের গতি যে লক্ষ্যও করা যায় না, তাহা কি আপনি জানেন না? পাহাড়ে উঠিতে হইলে ধীরে ধীরে পদক্ষেপ করিতে হয়, কিন্তু নামিবার কাজ এক মুহূর্তে সাধিত হইতে পারে, তাহা কি জানেন না? একবার পা পিছলাইলে পাহাড়ের তলায় পড়িতে সময় লাগে না, উঠিতেই সময় লাগে, ইহা স্মরণ রাখিবেন।"

গান্ধীজী উত্তরে বলিয়াছিলেন, "জগতের জাতিবৃন্দ শুধু ধীর প্রগতির

দ্বারাই উন্নত হয় নাই, বিপ্লবও তাহার সহিত অন্তরঙ্গভাবে জড়িত ছিল। জগতে একটিকে বাদ দিয়া অপরটিকে ধরিয়া রাখিলে চলে না। জন্ম ও জন্মের পর ধীরে ধীরে মানুষের বিকাশ যেমন সত্য, মৃত্যুও তেমনি সত্য। বাস্তবিক আমার কাছে মৃত্যু বিশ্বের মধ্যে একটি অনন্ত সত্যের মত প্রতিভাত হয়। এই বিশ্বের মধ্যে যদি কোনও বিপ্লবী থাকেন, তবে ঈশ্বর অপেক্ষা কেহ যে বড নাই, ইহা জোর করিয়া বলিতে পারি। এক মুহূর্ত পূর্বে যাহা শান্ত ছিল, তিনি সেখানে তুমুল তুফান প্রেরণ করেন। অসীম ধৈর্য এবং দক্ষতার সহিত তিনি যে পর্বতমালা রচনা করিয়াছেন, তাহাকে ধূলির মধ্যে বিলীন করিয়া দিতে তিনি বিন্দুমাত্র কুন্ঠিত হন না।

"হাঁ, আমি আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিয়াছি এবং সেখানে যাহা দৃষ্টিতে পডিয়াছে, তাহাতে আমার অন্তর ভয়ে ও বিস্ময়ে ভরিয়া গিয়াছে।

"শুধু ভারতের নয়, ইংলণ্ডেরও নীলাকাশে আমি কৃষ্ণমেঘকে পুঞ্জীভূত হইতে দেখিয়াছি, অবশেষে তাহার আঘাতের অসহনীয় শক্তি দেখিয়া আমি বিস্ময়ে নির্বাক নিস্পন্দ হইয়া গিয়াছি। ইতিহাস শুধু ধীর ও শান্ত প্রগতির সাক্ষ্য দেয় না, সেখানে বহু আশ্চর্য বিপ্লবেরও প্রমাণ আছে, এবং আমার বোধ হয় ইংলণ্ডের ইতিহাস এ বিষয়ে অতুলনীয়। আমার পত্রপ্রেরককে আমি আরও একটি কথা বলিতে চাই যে, মানুষকে আমি শুধু ধীর পদবিক্ষেপে পর্বত লঙ্ঘন করিতে দেখি নাই, হঠাৎ তাহাকে বিদ্যুতের মত দ্রুতবেগে আকাশপ্রমাণ উন্নতির রাজ্যেও পৌঁছিতে দেখিয়াছি।"

শ্রেণীসংগ্রাম সম্বন্ধে গান্ধীজীর অভিমত

বাস্তবিক ভাবিয়া দেখিলে কথাটা খুব সোজা। মানুষের ইতিহাসে যখনই কোনও পরিবর্তন ঘটিয়াছে, যখনই এক শ্রেণীর আয়ত্ত হইতে সমাজের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা অপর কোন শ্রেণীর হাতে গিয়াছে, তখনই বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে খোলাখুলি অথবা প্রচ্ছন্নভাবে সংগ্রাম দেখা গিয়াছে। অতীতে ক্ষমতার হস্তান্তর দ্বন্দ্বের ফলে সাধিত হইয়াছে। ইতিহাসলব্ধ এই অভিজ্ঞতার ফলে মার্ক্স সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে ভবিষ্যতে যতদিন পর্যন্ত জগতের শোষিত শ্রমজীবী শ্রেণীর অধিকারে সমাজের সমস্ত পরিচালনক্ষমতা আসিয়া না পড়ে ততদিন শ্রেণীসংগ্রাম ব্যতীত গত্যন্তর নাই। প্রাকৃতিক কারণবশে একদিন যাহা ঘটিতে বাধ্য, মানুষ বুদ্ধির সাহায্যে সেই পরিণতিকে অল্পকালের মধ্যে সংঘটিত করিয়া শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের মুক্তির দিন আরও নিকটে আনিয়া দিতে পারে। অতএব শ্রমজীবী শ্রেণীর স্বার্থকে যাহারা নিজের স্বার্থ বলিয়া গ্রহণ করে সেই বিপ্লবী ব্যক্তিগণের সতত চেষ্টা হওয়া উচিত, যে অগ্নি জ্বলিবেই, যাহা হয়তো ভাল বাতাসের অভাবে এখন শুধু ধূমায়িত হইতেছে, সম্যক্ বায়ুচালনার দ্বারা তাহাকে ধূম হইতে মুক্ত প্রজ্বলিত অগ্নিশিখায় রূপান্তরিত করা। অতএব যাহারা শ্রেণীসংগ্রামকে বিলম্বিত করে, শোষকশ্রেণীর সহিত শোষিতের সম্পর্ককে সু-বহ করিবার চেষ্টা করে, তাহারা সদিচ্ছা-প্রণোদিত হইলেও কার্যত জগৎ হইতে শোষণপ্রথার সমূহ উচ্ছেদকে আরও পিছাইয়া দেয়। অতএব তাহারা আসলে শ্রমিকের স্বার্থের শত্রু, শ্রমজীবীর মুক্তির অন্তরায় ভিন্ন অপর কিছু নহে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন মার্ক্সপন্থী সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে গান্ধীজীর সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন। কোন কোন মার্ক্সীয় দল গান্ধীজীর সম্পর্কে উল্লিখিত মত প্রকাশ করিয়া থাকিলেও আবার সময়বিশেষে তাঁহাকে শ্রমজীবীর স্বার্থের অতদূর বিরুদ্ধ মনে করেন নাই, তাঁহাদের ধারণা, গান্ধীজী কার্যত কখনও কখনও শ্রমিকের স্বার্থকে পোষণ করিয়াছেন. কখনও বা তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন। উল্লিখিত মার্ক্সীয় সম্প্রদায় গান্ধীজীকে সজ্জন বলিয়া বিবেচনা করিলেও ভ্রান্ত বা বিমূঢ়চিত্ত বলিয়া মনে করেন। গান্ধীজীর প্রভাব জনসাধারণের উপরে অতিশয় প্রগাঢ় দেখিয়া তাঁহারা দুঃখিতও হন। ভারতবর্ষের অশিক্ষিত জনসাধারণ ধর্মসংস্কারের মোহে পড়িয়া গান্ধীজীর মত একজন ফকিরের ভেকধারী মানুষকে অনুসরণ করে, ইহাই তাঁহাদের লজ্জা ও দুঃখের কারণ, অথচ বাস্তব অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহারা গান্ধীজীকে সম্পূর্ণ ফেলিতেও পারেন না। ফলে উল্লিখিত কর্মিগণ গান্ধীজীকে মার্জিত এবং সংশোধিত করিয়া পুরা বিপ্লবীতে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। কেহ বা গান্ধীজীর বিরুদ্ধে সরাসরি কিছু না বলিয়া, জনসাধারণকে ধর্মবুদ্ধির মোহ হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত বিপ্লবী শ্রেণীতে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন।

ভারতের বিভিন্ন মার্ক্সীয় গোষ্ঠীর মধ্যে এইরূপ মতের ইতরবিশেষ দেখা যায়, তাঁহাদের মধ্যে কে খাঁটি মার্ক্সীয় এই লইয়া আবার বাগ্‌বিতণ্ডাও হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের পক্ষে সে সকল তর্কের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া বস্তুবিচার করাই কর্তব্য। গান্ধীজী ইতিহাসের মধ্যে শ্রেণীসংগ্রামের অস্তিত্ব স্বীকার করেন কিনা ইহা প্রথমে জানা দরকার। যদি করেন, তবে তিনি ভবিষ্যতে কাহার জন্য অর্থাৎ কোন্ শ্রেণীর সর্ববিধ মুক্তি চান? দরিদ্র, শোষিত, শ্রমজীবী শ্রেণীর মুক্তি

চাহিলে শ্রেণীসংগ্রামকে তিনি তীব্রতর না করিয়া ধনী এবং শ্রমিকের সম্পর্ককে মধুরতর করিবার ব্যর্থ প্রয়াস কেন করিয়া থাকেন? সংগ্রাম ভিন্ন, শত্রুনিপাতের পথকে পরিহার করিয়া, শ্রমজীবীর পক্ষে মুক্তি কি কখনও সম্ভব? এই সকল প্রশ্নের বিচার হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু প্রশ্নগুলি একে একে অনেকগুলি হইয়া পড়িল, এবং সকলগুলির সম্বন্ধে বর্তমান প্রবন্ধের গণ্ডীর মধ্যে আলোচনা সম্ভবও নয়, উচিতও হইবে না। সেইজন্য অতি সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

প্রথম কথা হইল, গান্ধীজী স্বীকার করেন যে জগতের সর্বত্র শ্রেণীতে শ্রেণীতে স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্নভাবে সংগ্রাম চলিতেছে এবং তাহার ফলে মানুষের মন বিদ্বেষ এবং ভয় অথবা নিষ্ঠুরতার কলুষে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। ইহাতে শোষকই হউক বা শোষিতই হউক কাহারও মনুষ্যত্ব পূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করিতে পারে না। অতএব সমগ্র মানবজাতির স্বার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলা চলে ইহার সম্পূর্ণ নিরাকরণ করিয়া শোষণবিহীন সমসমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলে কাহারও মঙ্গল নাই। কি উপায়ে সেই অবস্থা প্রবর্তন করা যায় তাহা লইয়াই গান্ধীজীর সহিত মার্ক্সবাদিগণের প্রধান প্রভেদ।

আজ সমাজের মধ্যে যে শোষণযন্ত্র কায়েম রহিয়াছে তাহা যে শুধু শোষকদের অধিকারে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বা শাসনশক্তি থাকার ফলে সম্ভব হইয়াছে, তাহা নয়। শোষকদের লোভ এবং নিষ্ঠুরতা ছাড়া শোষিতদের সহযোগিতাও ইহার জন্য আংশিকভাবে দায়ী। দারিদ্র্য এবং ভয়ের বশে, কখনও বা লোভের প্রভাবে পড়িয়া, প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ সহযোগিতার দ্বারা শ্রমজীবিগণও উপরোক্ত উৎপাদনব্যবস্থা এবং তৎসহ শোষণের সম্ভাবনাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। অতএব মুক্তির প্রথম সোপান হইল, বর্তমান শোষণযন্ত্রের সহিত অ-সহযোগ।

কিন্তু 'অসহযোগ কর' বলিলেই তো করা যায় না। আজ ধনতন্ত্রের যন্ত্র শ্রমজীবীকে শোষণ করিতেছে সত্য, কিন্তু গৃহপালিত পশুকে গৃহস্থ যেমন দড়ি দিয়া বাঁধিয়া রাখিলেও খাইতে দেয়, ধনতন্ত্রও তেমনি আজ প্রসাদ দিয়া শ্রমজীবীর জীবনকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। মার্ক্সীয় কর্মিগণ বলেন, ধনতন্ত্রের অধীন উৎপাদনব্যবস্থাকে বিপ্লবের দ্বারা শ্রমজীবীর আয়ত্তে আনিতে হইবে। গান্ধীজীর দৃঢ় মত এই যে, হিংসার পথে সেই বিপ্লব সংসাধিত হইলে সকল শ্রমজীবীর পক্ষে ক্ষমতা লাভ সম্ভব হইবে না, উহা আসিবে শ্রমজীবিগণের প্রতিনিধিকল্প অল্প কিছু লোকের হাতে। যদি সেই প্রতিনিধিদল সমাজের কেন্দ্রীভূত অর্থনৈতিক অথবা রাষ্ট্রীয় শক্তিকে শ্রমজীবীর স্বার্থপুষ্টির উদ্দেশ্যে নিয়োগ করে, তবে ভাল, কিন্তু যদি না করে, তবে তাহাদিগকে নিরুদ্ধ করিবার শক্তি শ্রমজীবীদের হাতে আর থাকে না। কারণ তাহাদের মরাবাঁচা সব তখন নির্ভর করে কেন্দ্রগত শক্তির উপরে।

সেইজন্য গান্ধীজীর বিশ্বাস মুক্তির উপায় হইল কেন্দ্রীভূত সামাজিক শক্তিকে বিকেন্দ্রীকরণের রসের দ্বারা জীর্ণ করা। আঠার দফা গঠনকর্মের সাহায্যে ভারতবর্ষে গান্ধীজী সেই বিকেন্দ্রীকরণ সাধিত করিতে চান। প্রতি দেশে, কাল এবং পাত্র অনুসারে বিকেন্দ্রীকরণের কর্মধারায় বিশেষত্ব দেখা দিবে। সে কথা বাদ দিলেও বলা চলে যে সকল দেশেই বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্য হওয়া উচিত, সমাজের উৎপাদন এবং পরিচালন-ব্যবস্থাকে ঢালিয়া সাজিয়া সাধারণ শ্রমজীবীর আয়ত্তে আনিয়া, জগতের কেন্দ্রীকৃত শোষণশক্তিকে উদাসীনতার দ্বারা পরাস্ত করা। গান্ধীজীর দৃঢ় ধারণা, সম্যক্ উৎসাহ ও কর্মপটুতার দ্বারা গঠনকর্ম পরিচালিত করিলে সাধারণ মানুষের চেষ্টায় জগতের উৎপাদনব্যবস্থার মধ্যে বৃহত্তম বিপ্লব সংসাধিত করা সম্ভব হইবে। গঠনকর্মের দ্বারা ধনতন্ত্রের সঙ্গে

পরোক্ষভাবে যেমন অসহযোগ করা হইবে, তেমনই আবার বিচ্ছিন্নস্বার্থ শ্রমজীবিগণের মধ্যে এই উপায়ে নূতন সহযোগিতার বন্ধনও গড়িয়া তুলিতে হইবে। পরস্পরের মধ্যে অন্নের নূতন বন্ধনই শুধু সৃষ্টি হইবে না, সঙ্গে সঙ্গে সমাজের মধ্যে উৎপাদনব্যবস্থাকে আশ্রয় করিয়া সামাজিক সম্পর্ক এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হইবে যেখানে কেহ অপরের চেয়ে বেশি অধিকার ভোগ করিবার সুযোগ পায় না, সকলে স্বীয় প্রয়োজন অনুসারে ভোগের সামগ্রী লাভ করে এবং স্বীয় ক্ষমতার প্রয়োগ করিয়া সর্বজনের কল্যাণের উদ্দেশ্যে তাহা নিযুক্ত করে। গান্ধীজীর আর্থিক সমতা ও ট্রাস্টীবাদের ইহাই হইল তাৎপর্য।

এখন প্রশ্ন হইল, যাহারা আজ শোষণ করিতেছে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আয়ত্তে থাকার ফলে পরের শ্রমের উপরে যাহারা সুখের আসন রচনা করিয়াছে, তাহারা নির্বিবাদে শ্রমজীবীর স্বার্থপুষ্টির জন্য গঠনকর্ম চলিতে দিবে কেন? গান্ধীজী জানেন, শোষকসম্প্রদায় অলসভাবে বসিয়া থাকিবে না, নিপীড়ন অথবা সংহারকার্যে প্রবৃত্ত হইবে। কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গে মনে করেন, সহজ মানুষের মনে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ শোষককে হিংসার দ্বারা পরাস্ত করিবার যে প্রবৃত্তি জাগরিত হয় তাহার দ্বারা সত্যই হিংসাকে পরাস্ত করা যায় না। আজিকার শোষণযন্ত্র ভাঙিলে নূতন রূপে তাহা আবার আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করিবে। হিংসার দ্বারা হিংসা নির্মূল করিবার চেষ্টা বহুবার সংসারে হইয়াছে, আজ পর্যন্ত সফল হয় নাই। হিংসার দ্বারা বর্তমান কেন্দ্রীভূত উৎপাদনব্যবস্থাকে শ্রমজীবীর একান্ত আয়ত্তে আনিয়া, তাহাকে রূপান্তরিত করিয়া, সমাজে শোষণবিহীন উৎপাদনব্যবস্থা প্রণয়ন করার আদর্শ আজও জগতে সুদূর লক্ষ্যের মতই রহিয়াছে, কবে সেই সুদিন আসিবে কেহ বলিতে পারে না। হিংসা-প্রয়োগের ফলে যে সকল নূতন নূতন সমস্যার উদ্ভব হয়, সেগুলি

এড়াইয়া শোষণবিহীন উৎপাদনব্যবস্থা সৃজনের উদ্দেশ্যেই গান্ধীজী অহিংস সাধনপন্থার কথা বলিয়াছেন। তাহার প্রথম সোপানস্বরূপ গঠনকর্মের সাহায্যে সমসমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টার কথা বলিয়াছি। এখন, গঠনকর্মের বিরুদ্ধে শোষকের প্রবর্তিত ধ্বংসচেষ্টাকে প্রতিহত করিবার জন্য অহিংস উপায় কি? এই উপায়ের মধ্যে গান্ধীজীর মৌলিক দান নিহিত আছে। যথাবিহিত গঠনকর্মের দ্বারা নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ইতিপূর্বে ওয়েনের মত কোন কোন সমাজতান্ত্রিক করিয়াছিলেন। কিন্তু ওয়েনের চেষ্টা বর্তমান উৎপাদনব্যবস্থার আঘাতকে সহিতে পারে নাই। সেই উদ্দেশ্যে সত্যাগ্রহের অস্ত্র উদ্‌ভাবন করিয়া গান্ধীজী সর্বদেশের মানবসমাজের জন্য একটি বিশিষ্ট উপকার সাধন করিয়াছেন।

শ্রমজীবী যখন ধনতন্ত্রের সহিত অসহযোগ করে তখন বর্তমান ধনতন্ত্রের অধিকারিগণ স্বার্থরক্ষার জন্য অসহযোগী সমাজশক্তির উপরে আঘাত করিতে থাকে।

যদি সত্যাগ্রহীর ধৈর্য নিপীড়নের মধ্যেও অটুট থাকে, যদি তাহারা ক্ষণেকের জন্যও শোষকের বিরুদ্ধে আঘাতের খড়্গ উত্তোলন না করে, এমন কি শোষক অনাহারে ক্লিষ্ট হইলে তাহাকে নূতন সমসমাজের উৎপাদনব্যবস্থার মধ্যে মর্যাদার আসন দিতে প্রস্তুত থাকে, তবে প্রতিরোধ সত্ত্বেও সত্যাগ্রহীর অন্তরে শোষকের মনুষ্যত্বের প্রতি যে বিশ্বাস অটল রহিয়াছে, তাহার প্রভাবে শোষকের হৃদয় টলিয়া যায়। মার্ক্সপন্থী যেখানে শাসনের দ্বারা, ভয়প্রয়োগের পথে তাহাকে দমিত করিতে চান, গান্ধী সেখানে ভালবাসার বশে, সম্মানের অস্ত্রপ্রয়োগ করিয়া তাহার আগাছায় পূর্ণ চিত্তভূমিকে পরিচ্ছন্ন করিয়া মনুষ্যত্বের কুসুম প্রস্ফুটিত করিতে চান।

কিন্তু ভালবাসার অর্থ ইহা নয় যে, শোষকের অবলম্বিত

শোষণব্যবস্থাকে সত্যাগ্রহী স্বীকার করিবেন। সে উৎপাদনব্যবস্থাকে ভাঙিতেই হইবে। কিন্তু সত্যাগ্রহের দ্বারা সে কার্য সিদ্ধ হইলে শোষকের অন্তর পরিবর্তিত হওয়ার ফলে হয়তো সে নূতন সমসমাজ গঠনের ব্যাপারে শোষকের সহিত সমধর্মী হইয়া সহযোগিতা করিবে। অন্তত এই পরিণতি সার্থক করাই সত্যাগ্রহীর লক্ষ্য বলিয়া গান্ধীজী বিবেচনা করেন। প্রকৃত সত্যাগ্রহের ফলে শোষকের অন্তরকে যত দ্রুত রূপান্তরিত করা যাইবে, সমসমাজের পূর্ণ প্রতিষ্ঠাও তত দ্রুত সম্ভব হইবে। হিংসার আঘাতে শোষককে ধ্বংস করিলে, সেই হিংসার তমসা পরে বিজয়ী শ্রমজীবীকেও পাইয়া বসে। অন্তরবাসী হিংসার প্রভাব হইতে মুক্তি পাওয়া কঠিন। বিজয়ী শ্রমজীবী নূতন উৎপাদনব্যবস্থাকেও অন্তরস্থিত হিংসার সংস্কারের বশে সম্পূর্ণ শোষণমুক্ত করিতে পারিবে বলিয়া গান্ধীজী মনে করেন না। আর্থিক সমতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য থাকিলেও অন্য কোন প্রচ্ছন্ন আকারে অ-সমতা সমাজে দেখা দিয়া আবার মানবের অকল্যাণ সাধন করিতে পারে।

তাই আপাতত সত্যাগ্রহের পথ দীর্ঘ মনে হইলেও, শোষকের অন্তরকে মঙ্গল আদর্শ অনুযায়ী রূপান্তরিত করিয়া, তাহার নবলব্ধ সহযোগিতার সাহায্যে শোষণবিহীন সমাজব্যবস্থার চেষ্টাকে দূরাহত মনে হইলেও গান্ধীজী এই পথই আশ্রয় করিয়া চলেন। কারণ হিংসার পথে ফলের নিশ্চয়তা নাই, অহিংসার ফল আপাতত বিলম্বিত হইলেও সুস্থির ও স্থায়ী লাভ হয় বলিয়া ইহাই আশ্রয় করা উচিত। "স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ"। গান্ধীজী বলিয়াছিলেন,

> You need not be afraid that the method of non-violence is a slow long-drawn process It is the swiftest the world has seen, for it is the surest .
>
> (*Young India*, 30-4-25, p 153)

ইহাই হইল গান্ধীজীর প্রবর্তিত শোষণবিহীন নূতন সমাজ রচনার কর্মধারা। শ্রেণীসংগ্রামকে তীব্রতর করিয়া নয়, ভয়ের দ্বারা শোষককে পরাস্ত করিয়া নয়, তৎপরিবর্তে গঠনপদ্ধতির সহায়তায়, দৃঢ় সংকল্পের দ্বারা এবং বর্তমান শোষণযন্ত্রের সহিত অসহযোগের কালে তিতিক্ষার দ্বারা শোষকের চিত্তকে পরিবর্তিত করিয়া সত্যাগ্রহী বিপ্লব সংসাধনের চেষ্টা করেন।

শোষকের অন্তরকে যে ভয়ের পরিবর্তে সত্যাগ্রহের দ্বারা কল্যাণের পথে চালিত করা যায়, রাষ্ট্রীয় শক্তি আয়ত্ত হইবার পূর্বেও যে গঠনকর্মের সুকৌশল পরিচালনার দ্বারা নূতন সমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব, এই দুই বিষয়ে গান্ধীজী মার্ক্স-প্রবর্তিত মত হইতে বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া চলেন। গান্ধীজীর প্রবর্তিত **non-resistance**-এর অর্থ **nonviolent resistance**, ইহার মধ্যে ভিক্ষা বা নিবেদনমাত্রের স্থান নাই, ক্লীবত্বের স্থান আদৌ নাই।

গান্ধীজীর প্রদর্শিত শ্রেণীবিলোপের পন্থা মার্ক্স-প্রদর্শিত পন্থা হইতে ভাল অথবা মন্দ, কার্যকরী অথবা নয়, ইহা বিচার করা আমার উদ্দেশ্য নয়। মার্ক্সীয় পন্থার সহিত ইহার মৌলিক প্রভেদ কোথায় তাহা জ্ঞাপন করাই আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু বিষয়টি অতি সংক্ষেপ করিতে গিয়া কতদূর স্পষ্ট হইয়াছে জানি না। আরও একটু স্পষ্ট হইবে এই আশায় গান্ধীজীর দু' তিনটি ক্ষুদ্র উক্তি উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধ সমাপ্ত করিতেছি।

I am essentially a non-violent man, and I believe in war bereft of every trace of violence

(*Harijan*, 14-5-38)

My fundamental difference with Socialists is well

known I believe in conversion of human nature and in striving for it They do not believe in this

(*Harijan*, 27-5-39, p 137)

The world is weary of hate We see the fatigue overcoming the Western nations We see that this song of hate has not benefitted humanity Let it be the privilege of India to turn a new leaf and set a lesson to the world

(*Gandhiji in Indian Villages*, p 166).

গান্ধীজী ও তাঁহার চরকা

কিছুদিন পূর্বে মিঃ পি, স্প্র্যাটের লেখা গান্ধীবাদ সম্বন্ধে একখানি বই পড়িতেছিলাম। বইখানি রচনার জন্য লেখক যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন এবং স্বীয় রাজনৈতিক মতবাদের দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া গান্ধীবাদকে বুঝিবার চেষ্টাও করিয়াছেন। কিন্তু বইখানি পড়িয়া আমার ইহাই মনে হইল যে নিজের সংস্কারকে বৈজ্ঞানিকের মত চেষ্টা করিয়া যদি যথাসম্ভব বর্জন না করা যায় তাহা হইলে হয়তো অপরের মতকে ঠিকমত বোঝা যায় না। কোন মতকে বোঝা এবং তাহার বিচার করা স্বতন্ত্র বস্তু। উদাহরণ স্বরূপ গান্ধীজীর চরকা-প্রসঙ্গের অবতারণা করা যাইতে পারে।

পণ্ডিত জওহরলাল কলকারখানা বিস্তার এবং বিজ্ঞানের সহায়তায় মানুষের ভোগের পরিমাণে উন্নতি সাধনের পক্ষপাতী। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আজিকার দিনে তিনি ভারতবর্ষের অবস্থা সকল দিক হইতে বিবেচনা করিয়া চরকা প্রচলনের সম্বন্ধে উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের দেশে আজ হঠাৎ চেষ্টা করিলেও ইচ্ছামত তাড়াতাড়ি কলকারখানা স্থাপন করা যাইবে বলিয়া তিনি মনে করেন না। উপরন্তু বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে কলকারখানা বৃদ্ধি পাইলে হয়তো ভারতের সকল কর্মঠ মানুষকে কাজও দেওয়া যাইবে না এবং দেশের অর্থ-নৈতিক ক্ষমতাও উত্তরোত্তর ধনীশ্রেণীর করায়ত্ত হইয়া পড়িবে বলিয়া তিনি মনে করেন। ইহা জনসাধারণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী কাহারও কাম্য নয় কেননা ধনতন্ত্রের আওতায় কলকারখানার প্রসার ঘটিলে ভারতবর্ষের

সাধারণ মানুষ যে তিমিরে হয়তো সেই তিমিরেই থাকিয়া যাইবে। মিঃ স্প্যাটও তাঁহার বইএ একথা বলিয়াছেন যে, অনাহার-নিবারণের জন্য ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায় চরকা চালানো যাইতে পারে। যেখানে মানুষকে আর কোন কাজ দেওয়া যাইতেছে না সেখানে অন্তত কিছু কাজ দিয়া তাহাদের বাঁচাইয়া রাখার চেষ্টা নিশ্চয়ই ভাল। কিন্তু প্রশ্ন হইল, ইহার দ্বারা কি ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান শেষ পর্যন্ত হওয়া সম্ভব? নানাদিক হইতে বিষয়টি বিচার করিয়া তিনি শেষ পর্যন্ত বলিয়াছেন যে, গান্ধীজী চাকার উপরে এত বেশি জোর কেন দেন তাহা বোঝা গেল না।

এই তো গেল যাঁহারা কলকারখানায় বিশ্বাস করেন অথচ অবস্থা-বিপাকে চরকা চালাইতেও রাজি হইয়াছেন তাঁহাদের কথা। অপর পক্ষে গান্ধীজীর মতবাদ স্বীকার করেন এবং হয়তো চরকা-প্রচারের জন্য চেষ্টাও করিতেছেন এমন এক শ্রেণীর কর্মীও আমাদের দেশে আছেন। তাঁহাদের মধ্যে আবার কেহ কেহ মনে করেন, গান্ধীবাদকে দৃঢভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এমন কিছু কর্মী চাই যাঁহারা বৎসরে লক্ষ গজ করিয়া সুতা নিয়মিতভাবে কাটিবেন। আজ যেখানে একজন বা দুইজন চরকায় অনুরাগী আছেন, সেখানে তাহ হইলে অল্পকালের মধ্যে আরও অনেকে হইবেন, এবং শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমন দাঁড়াইবে যে ভারতবর্ষ হইতে শুধু চরকার সহায়তায় আমরা বিদেশী বস্ত্র বর্জন করিয়াই ক্ষান্ত হইব না, শেষে এমন কি স্বদেশী মিলের তৈয়ারি কাপড় পর্যন্ত সম্পূর্ণ বর্জন করিতে সমর্থ হইব।

অথচ গান্ধীজীর লেখার মধ্যে এমন প্রমাণ যথেষ্ট আছে যে তিনি চরকাকে এই জাতীয় মারণাস্ত্র বলিয়া কল্পনা করেন নাই। চরকা বলিতে তিনি কি বোঝেন এবং কেনই বা চরকার প্রতি তাঁহার

ঐকান্তিক প্রীতি, সে-কথাটি আমাদের হৃদয়ঙ্গম করা দরকার। সত্যই কি গান্ধীজী চরকার সাহায্যে দেশের গরিব লোকদের মুখে কেবল দু'মুঠা অন্ন জোগাইতে চান, না ইংরেজ ও বোম্বাইএর কলওয়ালাদের মুখের অন্ন কাড়িয়া লইতে চান, অথবা তাঁহার কল্পনায় আর কিছু আছে, ইহা আমাদের জানিতে হইবে।

ভালই হউক আর মন্দই হউক, গান্ধীজীর প্রভাব ভারতবর্ষের রাজনীতিক্ষেত্রে কম নয়। বুদ্ধিমান কোন কোন বন্ধুর কাছে শুনিয়াছি যে ভারতবর্ষের লোক আজও গুরুবাদে বিশ্বাস করে বলিয়া এবং ভেল্কির দ্বারা স্বরাজলাভের আশা পোষণ করে বলিয়া গান্ধীজীকে মানে। যতদিন না তাহারা এই মানসিক দাসত্ব হইতে মুক্ত হইতেছে ততদিন আমাদের উদ্ধার নাই। অর্থাৎ, সোজা কথা, গান্ধীবাদের উচ্ছেদের প্রয়োজন আছে। কিন্তু উচ্ছেদ সাধন করিতে হইলেও যে-বস্তুকে আমরা ধ্বংস করিতে চাই তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান সঞ্চয় করিতে হয়, নয়তো আমাদের সদিচ্ছা অনেক সময়ে ফলবতী হয় না। এই সকল দিক বিবেচনা করিয়া মনে হইয়াছে গান্ধীজী চরকা বলিতে ঠিক কি বোঝেন, এবং গান্ধীবাদের মধ্যে চরকার স্থান কোথায় সে-সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন আছে। আমরা গান্ধীবাদকে মানি আর নাই মানি, তাহার সম্বন্ধে মুক্ত বিচার সকল সময়েই প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিকের মত সে-সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ এবং জ্ঞান আহরণের পর মানা না মানার প্রশ্ন উঠিতে পারে, তাহার পূর্বে নয়।

কিছুদিন পূর্বে শিল্পী যামিনী রায় মহাশয়ের সঙ্গে ছবির সম্বন্ধে কথা হইতেছিল। নূতন শিল্পীরা অনেক সময়ে ছবির বর্ণবিন্যাসে ভুল করিয়া বসেন। হয়তো বিষয়বস্তু এমন যে সেখানে স্তিমিত রঙ ব্যবহার

করাই সংগত। অথচ তরুণ শিল্পী হয়তো সে-বিষয়ে লক্ষ্য না রাখিয়া নানাবিধ উজ্জ্বল চড়া রঙের সমাবেশ করিয়া বসেন। যামিনীবাবু প্রসঙ্গক্রমে বলিলেন, এরূপ অবস্থায় গুরুস্থানীয় শিল্পী চিত্রের শুধু একটি জায়গায় তুলি দিয়া মোটা একপ্রস্থ রঙ লাগাইয়া দেন এবং শিক্ষার্থীকে বলেন, এইবার তুমি উহার সহিত সংগতি রাখিয়া অবশিষ্ট রঙগুলি সংশোধন করিয়া লও। গুরু শুধু মূলমন্ত্রের মত একটি নির্দেশ দেন, অবশিষ্ট কাজ শিষ্যকে নিজে করিয়া লইতে হয়।

গান্ধীজীর চরকা সম্বন্ধেও আমার অনেক সময়ে এই কথাটি মনে হইয়াছে। তাঁহার চরকা বর্তমান সভ্যতার দোষকে সামান্য বিপুকর্ম করিবার ব্যবস্থা নয়, তাঁহার চরকাকে বর্তমান সভ্যতা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি সমগ্র সভ্যতা এবং সমগ্র জীবনধারার মূলমন্ত্রের মত ধরা যাইতে পারে। মিঃ স্প্র্যাট চরকাকে যেমনভাবে দারিদ্র্য-রোগের উপশমের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করার কথা বলিয়াছেন, গান্ধীজীর নিকট তাহা চরকার সপক্ষে প্রধান যুক্তি নয়। কোন কোন চরকা-বিশ্বাসী কর্মী লক্ষ লক্ষ গজ সুতার সাহায্যে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশী বস্ত্র বহিষ্কারের বিষয়ে যেমন উৎসাহিত হন, গান্ধীজী ঠিক তেমনটি হন না বলিয়াই আমার বিশ্বাস। গান্ধীজীর নিকট চরকা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জীবনধারার প্রতীক। সেই জীবনধারার সঙ্গে বিজ্ঞান, এমন কি কলকব্জার অনিবার্য বিরোধ নাই।

বহুদিন পূর্বে গান্ধীজীর মনে একটি ধারণা নৈতিক বিচার এবং অভিজ্ঞতার ফলে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল যে, কোনও মানুষের পক্ষেই অপরের শ্রমের উপর নির্ভর করা উচিত নয়। সকল মানুষকেই জীবন ধারণের জন্য অন্ন এবং বস্ত্রের উপর নির্ভর করিতে হয়। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় কেহ বুদ্ধি বেচিয়া সেই অর্থ সংগ্রহ করে এবং অপরের

শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত অন্নবস্ত্র ক্রয় করিয়া থাকে, কেহ বা অন্য কিছু বিক্রয় করে। মূল কথা হইল বর্তমান জগতে অনেকে পরের শ্রমের উপরে নির্ভর করিয়া রহিয়াছে, এবং যাহারা স্বীয় শ্রমোৎপাদিত পদার্থের দ্বারা অপরের জীবনকে পোষণ করে, তাহারাও যে স্বেচ্ছায় সানন্দচিত্তে উপরওয়ালাদের বাঁচাইয়া রাখিয়াছে তাহা সকল ক্ষেত্রে সত্য নহে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমাজে ধনবণ্টনের দুর্ব্যবস্থার প্রভাবে, দারিদ্র্যের নিপীড়নে, অথবা শারীরিক শাসনের ভয়ে, শ্রমজীবিগণ নিজের শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন পদার্থ স্বীয় ভোগের জন্য সঞ্চয় করিতে পারে না। ইহার প্রতিকারের নানা উপায় আছে। কিন্তু প্রধান ও সর্বপ্রথম প্রয়োজন হইল, যাঁহারা বুঝিয়াছেন যে আমরা অপরের অনিচ্ছাদত্ত বিত্তের প্রসাদে বাঁচিয়া আছি, সিন্দবাদ নাবিকের স্কন্ধে যে বৃদ্ধ ভর করিয়া বসিয়াছিল, তাহার মত শ্রমজীবীদের স্কন্ধের অবলম্বন ত্যাগ করিয়া প্রথমে মাটির পৃথিবীতে তাঁহাদিগকে স্বেচ্ছায় নামিয়া আসিতে হইবে। টলস্টয় এবং রাস্কিনের লেখা পড়িয়াই গান্ধীজী প্রথমে অর্থনীতির এই মৌলিক সত্যের বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন।

বর্তমান সভ্যতার পরিবর্তে গান্ধীজী যে সভ্যতার কল্পনা করেন সেখানে ব্রাহ্মণই হউক, ক্ষত্রিয়ই হউক অথবা বৈশ্যই হউক, কেহ শরীর-যজ্ঞের দায় হইতে মুক্ত থাকিবে না। প্রত্যেককে স্বীয় শরীরের বল-প্রয়োগের দ্বারা অন্ন হউক অথবা বস্ত্র হউক, নিজের ব্যবহারের উপযোগী বা সমপরিমাণ পদার্থ সমাজের জন্য সৃষ্টি করিতে হইবে। তবে কি বুদ্ধিধর্মী লোকের স্থান নাই? শিক্ষকের, শিল্পীর, সংগীতজ্ঞের স্থান সে-সমাজে হইবে না? গান্ধীজী মনে করেন, সকলের বিশেষ বিশেষ গুণের আদর ভবিষ্যৎ সমাজে নিশ্চয়ই করা হইবে। কিন্তু সেই গুণের জন্য তাঁহারা শরীরশ্রমের দায় হইতে মুক্তি পাইবেন কেন? বিশেষ গুণের জন্য

তাঁহাদের ভাগ্যে সম্মানলাভ হইবে, অন্তরেও স্বধর্ম পালনের দ্বারা তাঁহারা আনন্দলাভ করিবেন, কিন্তু প্রকৃতি সর্বমানবের উপর পরিশ্রমের যে-দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন, তাহা হইতে কাহারও নিষ্কৃতি নাই। যদি নিতান্তই শিক্ষক, শিল্পী বা অপর কোন বিশেষজ্ঞ শরীরশ্রমের উপযোগী সময় বা অবসর না পান, তবে স্বীয় কর্মের জন্য তাঁহার পক্ষে সাধারণ মজুরের যে পরিমাণ অর্থের উপর অধিকার জন্মায় তদপেক্ষা অধিক বেতনের দাবি জন্মিবে না। সমাজে সকলের আয় সমান হওয়া উচিত।

চরকা সেই সভ্যতার কেন্দ্রস্থল অধিকার করিয়া আছে। সেইজন্য গান্ধীজী ১৯৪০ সালে গান্ধী-সেবা-সংঘের বার্ষিক অধিবেশনে সভ্যগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন,

If Gandhism means simply mechanically turning the charkha, it deserves to be destroyed Millions of women used in the past to spin regularly, but they were immersed in slavery I would, therefore, repeat again that, even if you spin all the twentyfour hours mechanically, it will not do We have to spin intelligently and with a full consciousness of all the implications of spinning Then it will brighten your intellect, strengthen your mind and heart, and take you more and more towards the goal (*Harijan*, 2-3-40).

অর্থাৎ যামিনীবাবু শিল্পের ভুল ছবির উপরে যে গুরুর এক প্রস্থ রঙ দেওয়ার গল্প বলিয়াছিলেন, গান্ধীজীর পক্ষে চরকা বর্তমান সভ্যতার উপরে সেই রকম রঙের একটি পোঁছ। ইহার সঙ্গে সংগতি রাখিতে হইলে, জীবনের অপরাপর সকল ব্যাপারকেই ঢালিয়া সাজিতে হয়।

কিন্তু ইহাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, বর্তমান যন্ত্রসভ্যতার পরিবর্তে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতাকে ফিরাইয়া আনাই গান্ধীজীর লক্ষ্য নয়। প্রাচীন ভারতেও যথেষ্ট ধনবৈষম্য ছিল, সামাজিক অত্যাচার ছিল। চরকাও ছিল, কিন্তু তাহার দ্বারা মানুষ মুক্তিলাভ করে নাই। গান্ধীজী যে-সভ্যতা গড়িতে চান তাহার আভাস পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। তাহা যে পুরাতন সভ্যতা হইতে স্বতন্ত্র ইহা স্বীকার করেন বলিয়া গান্ধীজী লিখিয়াছিলেন,

Mediaeval times may have been bad, but I am not prepared to condemn things simply because they are mediaeval. The spinning wheel is undoubtedly mediaeval, but seems to have come to stay. Though the article is the same it has become a symbol of freedom and unity as at one time, after the advent of the East India Company, it had become the symbol of slavery. Modern India has found in it a deeper and truer meaning than our forefathers had dreamt of. Even so, if the handicrafts were once symbols of factory labour, may they now be symbols and vehicles of education in the fullest and truest sense of the term. (*Harijan*, 16-10-37)

যদি চরকার বিরুদ্ধে আপত্তি করিতে হয় তাহা হইলে সম্যক্ বিচারের দ্বারা উপরোক্ত সমগ্র জীবনধারাটি কেন ভাল নয়, অথবা বাস্তবজীবনে কার্যত তাহাকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব কিনা তাহাই আমাদিগকে দেখিতে হইবে। গান্ধীজী যাহা বলেন নাই বা ভাবেন নাই, সেরূপ কাল্পনিক যুক্তি খণ্ডন করা বৃথাচর্চার মত হইয়া দাঁড়ায়। আজ হয়তো ভারতের

সম্মুখে এবং জগতের সমক্ষেও এমন দিন আসিয়াছে যখন স্থির হইয়া আমাদের বিচার করা আবশ্যক, গান্ধীজীর প্রদর্শিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও তৎসহ সমাজে বিরোধের মীমাংসা করিবার জন্য সত্যাগ্রহের উপায় ভিন্ন মানুষের মুক্তির অপর কোনও উপায় আছে কিনা। কিন্তু সেই বিচারের পূর্বে কষ্ট করিয়া গান্ধীজীর মতবাদের সম্বন্ধে যথাযথ তথ্য আহরণ করা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে একান্ত প্রয়োজন।

সমালোচনা

FREEDOM AND CULTURE BY JOHN DEWEY, Pp. 170
ENDS AND MEANS BY ALDOUS HUXLEY, Pp. 336

"ঘরের কথা"র সম্পাদক মহাশয় দু'খানি বই সমালোচনা করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু বিপদ হইল বই দু'খানিই মহা মহা পণ্ডিতের লেখা, আর পণ্ডিতদের লেখা তো ঘরের লোকের কাছে সব সময়ে পরিবেশন করাও চলে না। হয়তো তাঁহারা যা বলেন তাহা অতি সোজা কথা, কিন্তু বলিবার ধরণ এমন যে চোখকাণ ধাঁধিয়া যায়। তবু পণ্ডিতদের কথা আমাদের শুনিতে হয়, কেননা সমুদ্রে অনেক খুঁজিতে খুঁজিতে যেমন মণিমুক্তা মেলে, পণ্ডিতদের আলোচনার মধ্যেও আমরা তেমনি অমূল্য সম্পদ খুঁজিয়া পাইতে পারি।

আজ জগৎময় যুদ্ধ বাধিয়াছে। তাহার আঁচ আমাদের গায়েও লাগিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইউরোপের অধিবাসীরা তো কয়েক বৎসর ধরিয়া যুদ্ধবিগ্রহ ভোগ করিয়া চলিয়াছে। কিসের জন্য এই যুদ্ধ, কেন লোকে পরস্পরকে হত্যা করিতে ছোটে, এই সব কথা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আমাদের ভাবিতেই হয়। যাঁহারা রাজ্য চালান, যাঁহারা কামান বন্দুকে সাজাইয়া সৈন্যগণকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠান, যাঁহারা এরোপ্লেনে বোমা ভরিয়া অন্য দেশের উপর তাহা বর্ষণ করিবার জন্য মানুষকে শিক্ষা দেন তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলে নানা রকম কথা শোনা যায়।

মুসোলিনী কিংবা হিটলার হয়তো বলিবেন "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা"

অর্থাৎ যাহারা অপরকে হত্যা করিবার মত শক্তি রাখে তাহারাই জগতের জমিদারী ভোগ করিবে। আবার ইংলণ্ড বা আমেরিকার রাজশক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিবেন, আমরা যুদ্ধ করিয়া হিটলাররাক্ষসকে বধ করিতে চাই, তবেই জগতে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে। তাই এত যুদ্ধের আয়োজন। অপরপক্ষে রুশের নেতা ষ্টালিনকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি হয়তো বলিবেন যে, মানবসমাজে যাহারা পরের শ্রমের উপর নির্ভর করে তাহারা এই সংহারলীলার মধ্যে ধ্বংস হইয়া যাইবে। বাকি থাকিবে জগতের শ্রমিক দল। তখন তাহাদের একাধিপত্য স্থাপন হইবে, নূতন মানবসমাজ রচনার ব্যবস্থা হইবে, যেখানে ভেদাভেদ নাই এবং যেখানে কেহ পরকে শোষণ করিয়া নিজের জীবনযাপন করে না। যুদ্ধ খারাপ, কিন্তু মানবসমাজকে মুক্ত করিতে হইলে একটি মহাযুদ্ধের প্রয়োজন আছে। এমনই ভাবে নানা মুনিব নানা মত বিশ্বের হাটে আজ শুনিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে কে যে ঠিক কথা বলিতেছেন তাহা বলা শক্ত। বিচার করিব কেমন করিয়া? তাই নানা জনের মত অন্তত শুনিতে হয়, তাহার পর নিজের জ্ঞানবুদ্ধি ও সংস্কার অনুসারে ভালমন্দ বিবেচনা করিয়া কাজে প্রবৃত্ত হইতে হয়।

জন ডিউই আমেরিকার একজন মস্তবড পণ্ডিত, হাক্সলে বিলাতের একজন বিখ্যাত লেখক। দু'জনেই চিন্তাশীল ব্যক্তি এবং যুদ্ধের সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত বিচার করিয়া দেখিয়াছেন। তাঁহাদের দু'জনেই অবশেষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে যুদ্ধের দ্বারা যুদ্ধ বন্ধ করা যায় না। ভগবান বুদ্ধ বহুদিন পূর্বে বলিয়াছিলেন—

ইহ-জগতে শত্রুতা দ্বারা শত্রুতা কখনই দমন করা যায় না, অক্রোধের দ্বারাই ইহাকে দমন করা যায়। ইহাই চিরন্তন সত্য। হাক্সলে এবং ডিউই উভয়েই যেন এইরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন।

তাঁহারা দু'জনে পাঁচশ' পাতা ভরিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহা তো দু'পাতায় বলা চলে না, তবে তাঁহাদের কথার সারমর্ম এই।

গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা মানে প্রতি মানুষ স্বীয় জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে, অপরের অকল্যাণ না করিয়া, জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবে। ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ গণতন্ত্রের আদর্শ। হিটলারের জার্মানিতে মানুষকে এমন-ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে যে তাহারা জগতের অন্য মানুষকে সংহার করিতে এতটুকুও কুণ্ঠিত হয় না। আবার জার্মানির সেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য ইংলণ্ড এবং আমেরিকার সেনাকেও সেই রকমই শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। শুধু তাহারা নয়, দেশবাসী সকলেই যেন ভালমন্দ বিচার না করিয়া সেনাধ্যক্ষের নির্দেশমত চলে, শত্রুপক্ষকে সংহার করে অথবা দেশে যুদ্ধের মালমশলা তৈয়ারি করে, এইরূপ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। গণতন্ত্রবাদী দেশও আজ যুদ্ধের চাপে ফ্যাসিষ্ট-পন্থী দেশের মত হইয়া উঠিয়াছে, নয়তো তাহারা ফ্যাসিজমের ধ্বংস সাধন করিতে পারিবে না।

ডিউই প্রশ্ন করিতেছেন, এ কেমন কথা? যে গণতন্ত্রকে তুমি প্রতিষ্ঠা করিতে চাও, যুদ্ধের সময়ে তাহাকে সমূলে বিনাশ করিতেছ, আবার ভবিষ্যতে তাহাকে কেমন করিয়া প্রতিষ্ঠা করিবে? মানুষের স্বাধীন চিন্তার সব বীজ নষ্ট করিতেছ, যুদ্ধের অন্তে তোমার হুকুম পাইলেই অমনি মানুষের শুভ বুদ্ধির ফুল ফুটিয়া উঠিবে? তাই তিনি বলেন স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে তাহার উপায়ও স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সুরে বাঁধা হওয়া চাই। ফ্রিডাম এণ্ড কালচার নামক বইখানিতে মার্ক্সবাদের দীর্ঘ সমালোচনার পর তিনি এই মতে উপনীত হইয়াছেন যে আমাদের জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে প্রতি মুহূর্তে মানুষকে মানুষ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, যে বিপক্ষ তাহাকে বোঝাইতে হইবে,

অবিরত লোকশিক্ষার চেষ্টা করিতে হইবে, তবেই সত্য গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে।

হাক্সলেরও মত তাই। তিনিও বলেন যুদ্ধের দ্বারা কোনও আদর্শকে জগতে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। অবিরত লোকশিক্ষার চেষ্টা, শুভ আদর্শের স্থাপনা, আমাদের ক্ষুদ্র জীবনে করিতে হইবে। তাহারই সঞ্চিত ফলে মানবসমাজের পরিবর্তন সাধিত হইতে পারে।

বাংলা দেশে পূর্বকালে লালন শাহ নামে এক ফকির ছিলেন। তিনি বলিতেন, আমার সাই যে ফুল ফোটাইতে চান, তাহার জন্য ফুলে জল দিতে হয়। ফুল তাড়াতাড়ি ফোটে না বলিয়া কি তাহাকে তলোয়ারের ঘা দিলে সে ফুটিবে, না ফুলগাছের গোড়ায় ঘি ঢালিলে কোন ফল হইবে? ফুলের চাবায় জলই চাই, মাটির রস তাহার শিকড়ের ভিতর দিয়া না গেলে ফুল কখনও ফুটিবে না।

বিদেশের যে দুইজন মনীষীর কথা আলোচনা করা হইল, তাহাদেরও এই মত। কেমনভাবে শিক্ষার দ্বারা মানুষের মনকে স্বাধীনতার উপযোগী করিতে হইবে তাহার কথা হাক্সলে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। ডিউইর বই তত্ত্ববিচারে পূর্ণ। যাঁহাদের সময় আছে, তর্ক-বিতর্ক ভালবাসেন, তাঁহাদের বই দু'খানি পড়িয়া দেখিতে বলি।

মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে কথোপকথন

১৯৩৪ সালের নভেম্বর মাসে আমরা কয়েক বন্ধু ওয়ার্ধাতে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে কথোপকথনের সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম। দুইদিন বৈকালে প্রায় দেড় ঘণ্টা করিয়া কথা হইয়াছিল। ওয়ার্ধা হইতে ফিরিয়া কথোপকথনের একটি রিপোর্ট মহাত্মাজীর কাছে পাঠানো হয়। তিনি অল্পদিন হইল তাহা খুব ভাল করিয়া সংশোধনের পর ফেরৎ পাঠাইয়াছেন। মূল রিপোর্ট অক্টোবর মাসের 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। উপস্থিত তাহার অনুবাদ প্রকাশ করা গেল।

অনুবাদে আমি বাঙালী পাঠকের সুবিধার জন্য কিছু স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছি। কোথাও দুই তিনটি বাক্যকে এক করিতে হইয়াছে, কোথাও বা একটি বাক্যকে সুবোধ্য করিবার জন্য পৃথক দুই তিনটি করিতে হইয়াছে। মহাত্মাজীর ভাবের যাহাতে কোনও বিকৃতি না ঘটে, তাঁহার কথার 'ওজন যথাযথ' বজায় থাকে, সেই দিকেই আমি বেশি দৃষ্টি দিয়াছি।

আশা করি বাঙালী পাঠক ইহার দ্বারা উপকৃত হইবেন। কেননা, বর্তমান কথোপকথনকে মহাত্মা গান্ধীর রাষ্ট্রনৈতিক এবং সামাজিক মতামতের সার বলা যাইতে পারে।

প্রথম প্রশ্ন

গ্রামের লোকের অবস্থা খুব খারাপ হইয়াছে, এবং সে অবস্থা ভাল করা দরকার। কিন্তু কেন গ্রামের অবস্থা ভাল করা যাইতেছে না তাহার দুইটি বড় কারণ আছে বলিয়া আমাদের মনে হয়।

(ক) গ্রামের লোকেরা একসঙ্গে কাজ করিতে পারে না। কেহ তাহাদের উপর অত্যাচার করিলেও তাহারা একজোটে বাধা দিতে পারে না।

(খ) চাষী ও মজুরদের প্রাণে বাঁচিয়া থাকার ইচ্ছাই যেন নাই। যাহারা জমির মালিক, যাহাদের টাকার বল আছে, তাহারা সকলে চাষীদের দাবাইয়া রাখিয়াছে। ফলে চাষীরা কখনও মাথা তুলিতে পারে না, চেষ্টার দ্বারা অবস্থা যে ফেরানো যায় ইহাও জানে না। আমরা নিজে লেখাপড়া শিখিয়াও চাষীদের কিছু শিখাই না, চাষীরা সেইজন্য মনে কোন দিন বল পায় না। এই সকল নানা কারণে গ্রামের লোকে মনমরা হইয়া আছে। বাঁচিয়া থাকিয়াও তাহারা যেন মরিয়া আছে।

গ্রামের যখন এমন অবস্থা তখন আমাদের কর্তব্য কি? গ্রামে খাদির কাজ করিতে গিয়া বা অন্য কোনও কাজ করিতে গিয়া আমরা কোন্ লক্ষ্য সামনে রাখিব? গ্রামের লোকের মধ্যে যতক্ষণ না মনের বল ফিরিয়া আসে, ততক্ষণ বাহির হইতে শত চেষ্টা করিলেও তাহাদের অবস্থা বরাবরের জন্য ভাল হইতে পারে না।

আমাদের প্রশ্ন হইল গ্রামে খাদির কাজে বসিয়া আমরা কি শুধু গরিবের মুখে দুইমুঠা অন্ন দিয়াই খুশি থাকিব না সেই সঙ্গে তাহাদের ভিতর আবার ভালবাসা ও ঐক্য ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিব? ঐক্য ও সহযোগিতার শিক্ষা বড়, না—গ্রামের লোককে উপস্থিত দু'মুঠা খাইতে দেওয়া বড় কাজ? ঐক্য ও সহযোগিতা না হইলে আমরা কেমন করিয়া রাষ্ট্রশক্তি আয়ত্ত করিব?

প্রথম উত্তর

খাদির কাজ এবং রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের জন্য শিক্ষা সম্পূর্ণ আলাদা রাখিতে হইবে। দু'টিকে এক করিলে চলিবে না। খাদির উদ্দেশ্য

মানবের কল্যাণ সাধন করা। কিন্তু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এই কল্যাণের কাজ সার্থকভাবে করিলে আমরা প্রচণ্ড রাষ্ট্রশক্তি লাভ করিতে পারিব।

একটি উদাহরণ দিয়া কথাটি পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। 'স্যালভেশন আরমি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে। তাহার উদ্দেশ্য হইল মানুষকে ধর্ম শিক্ষা দেওয়া, ভগবানের কথা লোককে শুনানো ও শিখানো। কিন্তু তাহারা ভগবানের কথা না বলিয়া লোকের রোজগারের চেষ্টাই বেশি করে। যাহারা দরিদ্র ও খাইতে পায় না তাহাদের কাছে অন্নই ভগবান এ কথা আমরা যেন সর্বদা মনে রাখি। খাদি প্রচারের দ্বারা আমরা লোকের মুখে যেন অন্ন দিতে পারি। আজ দেশের লোক অত্যন্ত অলস ও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। যদি খাদি প্রচারের ফলে সেই আলস্য খানিক কমানো যায়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে দেশের লোক আমাদের কথা শুনিবে। গবর্মেণ্ট আর যাহাই করুক না কেন গ্রামবাসী যাহাতে অন্তত একমুঠা খাইয়া বাঁচিয়া থাকে সেদিকে দৃষ্টি রাখে। আমরা যদি দেশের লোকের জন্য অন্তত কিছু অন্নের সংস্থান করিতে না পারি তবে তাহারা গবর্মেণ্টের কথা না শুনিয়া আমাদের কথা কেন শুনিবে? আমরা সেইজন্য নূতনভাবে তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিব। নিজের চেষ্টায় আমরা সবাই মিলিয়া কত বড় বড় কাজ করিতে পারি তাহা যদি দেখানো যায়, গ্রামের লোকে আমাদের কথায় বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিবে।

খাদির ভিতর দিয়া এইরূপ শিক্ষা দেওয়া সম্ভব বলিয়া আমার বিশ্বাস। কিন্তু খাদির কাজ করিবার সময়ে তাহার রাষ্ট্রনৈতিক ফলাফল কি হইবে তাহা ভাবিবার দরকার নাই। আমাদের লক্ষ্য থাকিবে শুধু অর্থনৈতিক কল্যাণ করা, গ্রামবাসীদের মুখে দুইমুঠা অন্ন দেওয়া।

কিন্তু রাষ্ট্রীয় জীবনে তাহার ফল ফলিতে বাধ্য। তাহা কেহ রোধ করিতে পারিবে না এবং সেজন্য কাহারও ভয় পাইবার কারণও নাই।

প্রশ্ন

খাদি প্রচারের ভিতর দিয়া আমরা গ্রামবাসীদের মধ্যে যে সহযোগিতা বা ঐক্য গড়িবার চেষ্টা করিতেছি অন্য উপায়ে কি তাহা আরও ভালভাবে এবং আরও তাড়াতাড়ি করা যায় না? ধরুন, গ্রামে যদি মহাজনদের বিরুদ্ধে সুদ কমানোর জন্য আন্দোলন করা হয়, অথবা জমিদারের কাছে চাষীর মজুরির হার বাড়ানোর চেষ্টা হয়, তাহা হইলে কি গ্রামবাসীদের আরও সহজে সঙ্ঘবদ্ধ করা যায় না? যদি আমাদের সংশয় আসে এই ধরণের কাজ করিব না খাদির কাজ করিব তখন আমাদের কর্তব্য কি? ধরুন, গ্রামে খাদি প্রচারের জন্য আমরা একটি বড় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিলাম। এমন সময়ে জমিদার বা মহাজনের সঙ্গে গ্রামের চাষীদের বিবাদ বাধিয়া গেল। তখন আমরা খাদির কাজকেই আঁকড়াইয়া থাকিব না খাদির কাজকে সর্বস্বান্ত করিয়া প্রজাদের মধ্যে আন্দোলন চালাইব? অবশ্য যদি আমাদের মনে হয় যে প্রজা আন্দোলনের ফলে ঐক্যের ভাব আরও শীঘ্র দেশে আনা যাইবে।

উত্তর

আপনি আপনার প্রশ্নের শেষে একটি প্রকাণ্ড 'যদি' যোগ করিয়া দিয়াছেন। অহিংসার দ্বারা স্বরাজলাভের জন্য যে ধরণের সঙ্ঘভাব দরকার তাহা আপনার কথিত প্রজা আন্দোলনের ফলে বেশি আসিবে

না খাদি প্রচারের দ্বারা আসিবে, তাহা আমি জানি না। কিন্তু যদি আপনার কথা মানিয়া লই, অর্থাৎ প্রজা আন্দোলনই এ কার্যের জন্য বেশি উপযোগী হয় তাহা হইলে আপনাকে তাহাই চালাইতে হইবে। ফলে খাদির কাজ নষ্ট হয় হউক।

কিন্তু আমি অহিংস আন্দোলন অনেক দিন ধরিয়া চালাইতেছি। সেই অভিজ্ঞতার ফলে আমি আপনাকে ওপথে যাইতে নিষেধ করিব। অহিংসার পথে যে ধরণের সাত্বিক বলের প্রয়োজন তাহা সত্যকার খাদি প্রচারের দ্বারা যেমন হইবার সম্ভাবনা আপনার কথিত উপায়ের দ্বারা তেমন নয়।

আমরা স্বরাজলাভের জন্য অহিংসার পথ ধরিয়াছি। যদি কর্মীরা ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় নানা অজুহাতে খণ্ডযুদ্ধে লিপ্ত হন তবে প্রয়োজনের সময়ে সমস্ত ভারতবর্ষের লোককে একযোগে কাজ করানো যাইবে না। একই উদ্দেশ্যে যদি ভারতের সর্বত্র লোকে সঙ্ঘবদ্ধ হয় তাহা হইলে একজোটে কাজ করিবার সময়ে তাহারা সফল হইবে।

ভারতবর্ষের মত এমন বিশাল দেশে অহিংসভাবে আইন-অমান্য করিবার আগে লোককে অনেক নূতন শিক্ষা দিতে হইবে। মানুষ গড়িতে শিখিলে তবে ভাঙিতে পারে। খাদি প্রচারের দ্বারা আমরা গ্রামবাসীদের এই শিক্ষা দিই, কেমনভাবে নিজেদের সমবেত চেষ্টায় বস্ত্রের সংস্থান করা যায় এবং প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা যায়। এইরূপ প্রতিষ্ঠান গড়িতে শিখিলে তবে মানুষ অহিংসভাবে বিরুদ্ধ প্রতিষ্ঠানকে ভাঙিতেও শিখিবে। সেইজন্য আমি সকল কর্মীকে এই কথা বলিব যে তাঁহারা যেন গ্রামে গ্রামে বিভিন্ন অজুহাতে খণ্ডযুদ্ধ না বাধাইয়া বরং সমস্ত শক্তি ও চিন্তা খাদিপ্রচারের জন্য নিয়োজিত করেন। প্রকৃত খাদির কাজ হইলে গ্রামবাসীদের মনে যে সঙ্ঘভাব ও আত্মনির্ভরশীলতা

গড়িয়া উঠিবে তাহা অহিংস-অসহযোগের দ্বারা স্বরাজলাভের ব্যাপারে সহায় হইবে।

দেশের লোক যত পরিশ্রম করে তাহার উচিত মূল্য পায় না। সেজন্য তাহাদের মনে ন্যায্য ক্রোধ হয়। আমরা যদি পিকেটিং করিয়া বিদেশী-বর্জনের চেষ্টা করি তাহা হইলে লোকের মনের সেই সুপ্ত ক্রোধ জ্বলিয়া উঠিবে, ভাল করিয়া বিদেশী-বর্জন হইবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু মনের রাগকে শাসনে রাখিয়া যদি আমরা অহিংসার পথ গ্রহণ করি, ঠিকমত খাদির কাজ চালাইতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বিদেশী-বর্জনে সমর্থ হইব, অথচ হিংসাবাদের দরুণ যে সকল অশান্তি ঘটে তাহাও ভোগ করিতে হইবে না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন

একজন লোকের মনে কি প্রেমের ভাব পুরাপুরি থাকিলে তাহার সম্পত্তির উপর লোভ থাকিতে পারে? কাহারও মনে সম্পত্তির উপর টান থাকিলে কি সে মানবজাতিকে পুরাপুরি ভালবাসিতে পারে, তাহাদের দুঃখ বুঝিতে পারে?

দ্বিতীয় উত্তর

না, তাহা হয় না। প্রেম ও সম্পত্তিতে লোভ বিরুদ্ধ জিনিষ, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন সম্বন্ধই নাই। আমাদের সব চেয়ে বড় সম্পত্তি হইল, এই দেহ। এই দেহটিকে সুখে রাখিবার জন্য আমাদের কতই না চেষ্টা করিতে হয়। মানবজাতির প্রতি প্রেমের বশে মানুষের

সেবার জন্য এই শরীরকেও বলি দিবার জন্য যখন আমরা প্রস্তুত হই তখনই প্রেম আমাদের জীবনে পূর্ণতা লাভ করে।

কিন্তু সাধারণ জীবনে এত প্রেম সম্ভব নয়। মানুষ যতদিন বাঁচিয়া থাকে, ততদিন শরীরের প্রতি তাহার মমতা থাকে এবং সে পূর্ণ প্রেম জীবনে ধারণ করিতে পারে না, নিজের প্রতি একটু টান থাকিয়াই যায়। তবু তাহাকে দিনের পর দিন সেই প্রেমের মাত্রা বাড়াইতে হয়, মানুষকে আরও ভালবাসিবার চেষ্টা করিতে হয়, মানবজাতির সেবার জন্য নিজের সর্বস্ব ঢালিয়া দিতে হয়।

প্রশ্ন

যদি তাই হয়, তবে আপনি ধনীদের কেন বলেন যে তাহারা এই কথা ভাবুক যে দেশের সর্বসাধারণের ধন তাহাদের কাছে গচ্ছিত আছে? নিজের রোজগারের টাকাকে কি লোক সত্যই সর্বসাধারণের টাকা বলিয়া ভাবিতে পারে? ধনীদের ন্যাসী হইবার শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া দেশের গবর্মেণ্টের হাতে জমা দিলে কি ভাল হয় না? যদি আমরা এমন গবর্মেণ্ট গড়িয়া তুলিতে পারি যাহা সত্যসত্যই দেশের সর্বসাধারণের গড়া জিনিষ এবং যাহার একমাত্র কাজ হইবে সাধারণের স্বার্থরক্ষা করা, তবে তেমন গবর্মেণ্টের হাতে সব সম্পত্তি ধরিয়া দিতে দোষ কি?

উত্তর

যাহাদের টাকা আছে, তাহাদের আমি এই কথা বলিয়া থাকি যে তাহাদের সঞ্চিত টাকার যথার্থ মালিক দেশের গরিবেরা, তাহারা যেন

সেই বুঝিয়া টাকা খরচ করে। অবশ্য আপনি বলিতে পারেন যে, ন্যাসবাদ বা উপনিধিবাদ সত্যসত্যই কাজে পরিণত হইতে পারে না, কেহ খাঁটি ন্যাসীর ভাব মনে আনিতে পারে না (you may say that trusteeship is a legal fiction)। কিন্তু যদি ধনীরা সর্বদা এই ভাব মনে পোষণ করে তাহা হইলে জগতের অনেক দুঃখ লাঘব হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। আমার ধারণা, এই উপায়ের দ্বারা মানুষে মানুষে ভেদকে যতদূর কমানো যায় অন্য কোন উপায়ে তাহা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন

প্রেম ও অহিংসা এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার যদি বিরুদ্ধ জিনিষ হয় তবে আপনি মাঝে মাঝে সেই অধিকারের সপক্ষে কথা বলেন কেন ?

উত্তর

যাহারা টাকা রোজগার করে অথচ স্বেচ্ছায় মানুষের সেবায় তাহা ব্যবহার করে না, তাহাদের প্রতি করুণার বশে (it is concession to those who earn money) আমাকে সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকারকে সহ্য করিতে হয়।

প্রশ্ন

তাই যদি হয় তবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি তুলিয়া দিয়া শুধু রাষ্ট্রকে সম্পত্তির মালিক করিতে দোষ কি ? সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকার থাকিলে মানবজাতিকে যত দুঃখভোগ করিতে হয়, শুধু রাষ্ট্রের অধিকার থাকিলে তো তাহার চেয়ে কম দুঃখ ভোগ করিতে হইবে ?

উত্তর

সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকার অপেক্ষা রাষ্ট্রের অধিকার ভাল (it is better than private ownership)। কিন্তু এক হিসাবে দু'টাই খারাপ, কেননা দুইএর মূলেই হিংসার ভাব রহিয়াছে। অহিংসার ভাব পূর্ণ হইলে কোনও সম্পত্তিতে আসক্তি থাকিতে পারে না।

কিন্তু রাষ্ট্রের অধিকার বাড়ানোয় এক বিপত্তি আছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির পিছনে যে হিংসার ভাব আছে তাহার চেয়ে রাষ্ট্রের হিংসাভাব আরও ক্ষতিকর। কেননা রাষ্ট্রের মধ্যে হিংসার বল আরও সুব্যবস্থিত ও পুঞ্জীভূত হইয়া থাকে। মানুষের আত্মা আছে কিন্তু রাষ্ট্রযন্ত্রের তাহা নাই। সেইজন্য মানুষকে বদলানো যায় কিন্তু রাষ্ট্রকে অহিংস করা যায় না, হিংসা বাদ দিয়া রাষ্ট্র থাকিতেই পারে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে জগৎ হইতে রাষ্ট্রবল প্রয়োগের দ্বারা যদি ধনতন্ত্রবাদকে দূর করাও যায়, তাহা হইলেও মানুষ হিংসার কবল হইতে কিছুতেই নিষ্কৃতি পাইবে না। ধনতন্ত্রবাদ ধ্বংস হইতে পারে, কিন্তু হিংসাবাদের ফলে মানুষে মানুষে ভেদ থাকিয়াই যাইবে। অহিংসার দ্বারা যদি ধনতন্ত্রকে নষ্ট করা যায় তাহা হইলে আরও ভাল হয়। সেইজন্য আমি উপনিধিবাদের প্রচার করিয়া থাকি।

প্রশ্ন

আচ্ছা, একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। ধরুন, আমাদের দেশে একজন বিখ্যাত চিত্রকর মারা গেলেন। তাঁহার ছেলে যদি পিতার ছবিগুলি যা তা' করিয়া নষ্ট করেন, তাহাতে তো সারা দেশের পক্ষে ক্ষতি। যদি আপনার ধারণা হয় যে ছেলেটি কোনদিন পিতার আঁকা ছবিগুলি দেশের সম্পত্তি ভাবিয়া বাঁচাইয়া রাখিবে না, তাহার মনে ন্যাসীর ভাব

আসিবে না, তাহা হইলে কি আপনি গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ঐ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা সমর্থন করিবেন না?

উত্তর

হাঁ, একথা আমায় স্বীকার করিতে হইবে যে গবর্মেণ্ট সে ক্ষেত্রে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া লইবে। এবং এমন বাজেয়াপ্ত করা অন্যায় নয়, অবশ্য রাষ্ট্র যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ না করে। যদি লোকে স্বেচ্ছায় ন্যাসীর ধর্ম পালন করে, তাহা হইলে সব চেয়ে ভাল হয়। কিন্তু যদি তাহা না হয়, তবে গবর্মেণ্টের দ্বারা যথাসম্ভব কম বল প্রয়োগ করিয়া ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা উচিত। এইজন্যই বিলাতে গোলটেবিল বৈঠকে আমি বলিয়াছিলাম যে, ভারতবর্ষে সমস্ত সম্পত্তির অধিকারকে তন্ন তন্ন করিয়া যাচাই করা উচিত। যেখানে প্রয়োজন সেখানে বাজেয়াপ্ত করিয়া সম্পত্তি রাষ্ট্রের অধীনে আনিতে হইবে, এবং তাহার জন্য ন্যায়সঙ্গত মনে হইলে ক্ষতিপূরণ করা হইবে, নচেৎ হইবে না।

ব্যক্তিগতভাবে আমি রাষ্ট্রের হাতে অধিক ক্ষমতা দেওয়ার পক্ষপাতী নই। ন্যাসীর ভাব যদি বৃদ্ধি পায়, তবে সব চেয়ে ভাল হয়। কিন্তু যদি সম্পত্তি রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে বাজেয়াপ্ত করা ভিন্ন উপায় না থাকে, তবে আমি তাহা সমর্থন করিব। কেবল গবর্মেণ্ট যাহাতে অযথা ক্ষমতা প্রয়োগ না করে এবিষয়ে যেন আমাদের দৃষ্টি থাকে।

তৃতীয় প্রশ্ন

সাম্যবাদীরা মনে করেন যে, মানুষ অভ্যাসের দাস। সেইজন্য তাঁহারা এমন এক সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা গড়িতে চান যাহার মধ্যে

একজন মানুষ অপর জনকে খাটাইয়া লাভের ভাগ নিতে পারিবে না। পরের খাটুনির উপরে কেহ নিজের সুখের আসন গড়িতে পারিবে না। তাহাদের বিশ্বাস, এই রকম সামাজিক সংস্থান জোরজার করিয়া একবার চালু করিয়া দিতে পারিলে মানুষের দুঃখের অনেক লাঘব হইবে।

আপনি কি মনে করেন যে মানুষ অভ্যাসের দাস নয়, সে নিজের ইচ্ছার বশে স্বাধীনভাবে সব কাজ করিয়া থাকে? মানুষের জীবনে অভ্যাস অপেক্ষা ইচ্ছাশক্তির জোর বেশি বলিয়াই কি নূতন সমাজ-বিধান গড়ার চেয়ে আপনি আত্মশুদ্ধির উপরে বেশি জোর দেন? তাহাতে কি দুঃখ কমিবে বলিয়া আপনার বিশ্বাস?

তৃতীয় উত্তর

অবশ্য আমি স্বীকার করি যে মানুষের জীবনে অভ্যাসের বল বেশি। কিন্তু আমার ধারণা অভ্যাসের দাস হওয়া অপেক্ষা ইচ্ছাশক্তির জোর বাড়ানো ভাল। আর আমার ইহাও বিশ্বাস যে, ইচ্ছাশক্তির বলে মানুষ শ্রমচৌর্যকে (exploitation) যতদূর কমাইতে পারে, অন্য কোন উপায়ে তাহা সম্ভব নয়।

রাষ্ট্রের ক্ষমতা বাড়ানোকে আমি বিশেষ ভয় করি। রাষ্ট্র জোর করিয়া শ্রমচৌর্য বন্ধ করিতে সমর্থ হইলেও ব্যক্তির স্বাধীনতাকে এমন-ভাবে খর্ব করে যে তাহা মানবজাতির পক্ষে যথেষ্ট অনিষ্টকর। মানবের উন্নতির মূল হইল ব্যক্তিস্বাধীনতা। শ্রমচৌর্য বন্ধ করিতে গিয়া যদি তাহার সম্পূর্ণ বিলোপসাধন ঘটে, তবে একটির জায়গায় আর একটি দুঃখ আসিবে বলিয়া আমার মনে হয়।

অনেক মানুষের ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে তাহারা শ্রমচৌর্য বন্ধ করিয়া নিজের জীবনকে মানবজাতির সেবায় নিয়োগ করিয়াছে। কিন্তু

এমন একটি রাষ্ট্রের কথাও জানি না যাহা সত্যসত্যই দরিদ্র জনগণের জন্য চালানো হইয়া থাকে।

প্রশ্ন

আচ্ছা, আপনি উপনিবিষ্টের কথা বলিতে গিয়া যে সব লোকের দৃষ্টান্ত দেন, তাঁহারা কি গরিবের প্রতি প্রেমবশত স্বেচ্ছায় ন্যাসী হইয়াছেন, না আপনার প্রভাবে পড়িয়া হইয়াছেন? আমাদের মনে হয় প্রেমের চেয়ে আপনার প্রভাবই এজন্য বেশি দায়ী। আপনার মত লোক সংসারে কদাচিৎ আসেন। অতএব সব পরশ্রমজীবীদের যদি ন্যাসী করিতে হয়, আর সেজন্য আপনার মত সদ্‌গুরুর অপেক্ষা রাখিতে হয়, তাহা হইলে সংসারের দুঃখ কবে দূর হইবে? তাহার চেয়ে কি কোনও স্থায়ী রাষ্ট্রশাসন অথবা সমাজবিধানের দ্বারা শ্রমচৌর্য বন্ধ করা ভাল নয়?

উত্তর

আমার নিজের কথা ছাড়িয়া দিন। কিন্তু আপনার মনে রাখা উচিত যে জগতে যত মহাপুরুষ আসিয়াছেন তাঁহাদের শিক্ষা মৃত্যুর পরেও অনেকদিন জগতে চলিয়া থাকে। মোহম্মদ বুদ্ধ অথবা যীশুখ্রীষ্ট জগৎকে যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কতক অংশ সনাতন অর্থাৎ সব সময়ে সকল দেশেই প্রয়োগ করা চলে। কিন্তু সেই শিক্ষার সঙ্গে তাহারা প্রত্যেকে যে সময়ে জন্মিয়াছিলেন সেই সময়ের উপযোগী কতকগুলি শিক্ষাও দিয়া গিয়াছেন। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সেসব অস্থায়ী শিক্ষার প্রয়োজন আর নাই। আমাদের বিপদ হইল যে আমরা তাঁহাদের স্থায়ী শিক্ষার সঙ্গে অস্থায়ী শিক্ষাকেও বাঁচাইয়া রাখিতে চাই। সেই-জন্য জগতে এত সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ হয়।

সে কথা বাদ দিলেও আপনি বুঝিতে পারিবেন যে মহাপুরুষদের শিক্ষা বহুদিন যাবৎ বর্তমান থাকে। সেইজন্য আমি সমাজ-ব্যবস্থা অপেক্ষা আত্মশুদ্ধির উপরে বেশি জোর দিই।

তবে আমি যে কোনও সামাজিক বিধিব্যবস্থা অথবা সংস্থানকে পছন্দ করি না, তাহা নহে। রাষ্ট্র এমন একটি সংস্থান যাহা মূলত রাজসিক বলের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেইজন্য তাহার বিরুদ্ধে আমার আপত্তি। কিন্তু যদি মানুষে স্বাধীনভাবে (voluntary organisation) প্রতিষ্ঠান গড়ে, তাহাকে আমি খুবই ভাল বলিব। সে-রকম প্রতিষ্ঠানের তো প্রয়োজন খুবই আছে।

চতুর্থ প্রশ্ন

আপনি কি রকম সামাজিক ব্যবস্থা পছন্দ করেন? আপনার সামাজিক আদর্শ কি?

চতুর্থ উত্তর

আমার ধারণা প্রত্যেক মানুষ জন্মাবধি কতকগুলি বৃত্তির অধিকারী হয়। তাহা ছাড়া প্রত্যেকের শক্তিরও সীমা থাকে। সকলে সব কাজ সমানভাবে করিতে পারে না। কাহার কোন্ বিষয়ে ক্ষমতা আছে, কাহার বৃত্তি ও শক্তির সীমা কি, তাহা বিচার করিয়া প্রাচীন ভারতে বর্ণব্যবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। বর্ণব্যবস্থার দ্বারা ব্যক্তিবিশেষের শক্তির সীমা অনুসারে তাহাদের জীবনযাপনের ধারা নির্দিষ্ট হইত। ফলে পরস্পরের মধ্যে অন্যায় প্রতিযোগিতা হইতে পারিত না। বর্ণধর্মে মানুষে-মানুষে বৃত্তির ভেদ স্বীকার করা হইলেও, উঁচু-নীচু ভেদ ছিল

না। সেইজন্য লোকে নিজের শ্রমের উপযুক্ত মূল্য পাইত এবং সমাজে অযথা প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা উৎপীড়নের সৃষ্টি হইত না। পরবর্তীকালে বর্ণধর্মের ব্যভিচার হইয়াছে, বর্ণব্যবস্থার মধ্যে গ্লানি ঢুকিয়াছে।

আমার বিশ্বাস যে আমরা যদি আদর্শ সমাজ গড়িতে চাই, তবে বর্ণধর্মের মধ্যে যে গূঢ় সত্য রহিয়াছে তাহাকে মানিতেই হইবে, এবং সমাজসংস্থানকে তাহার সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া লইতে হইবে।

প্রশ্ন

আপনি কি স্বীকার করেন না যে প্রাচীন ভারতে বর্ণে-বর্ণে উঁচু-নীচু ভেদ ছিল, এবং উচ্চবর্ণের লোকে অপর সকলের চেয়ে সামাজিক সুখ ও সুবিধা বেশি ভোগ করিত?

উত্তর

ইতিহাসের দৃষ্টিতে সে কথা হয়তো সত্য। কিন্তু যদি কোনও সত্যের ভুল প্রয়োগ হয়, অথবা সত্যটিকে বুঝিতে ভুল হইয়া থাকে, তবে সেজন্য সেই সত্যকে কখন দায়ী করা উচিত নয়। বর্ণধর্মের মধ্যে যে সত্য নিহিত আছে, তাহা আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে পূর্বপুরুষদের নিকট হইতে পাইয়াছি। এখন আমাদের নিজের চেষ্টায় সেই সত্যকে আরও পূর্ণ আরও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে।

বর্ণধর্মের দ্বারা কোন্ মানুষের কি কর্তব্য তাহাই নিরূপিত হয়। নিজের কর্তব্য পালন করিলে, তবে মানুষ সমাজের কাছে কতকগুলি অধিকার দাবি করিতে পারে। কর্তব্যপালন না করিলে অধিকার জন্মায় না। বর্তমান জগতে এমন একটা অভ্যাস দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে দাম না

দিয়াই লোকে অধিকার দাবি করে, এমন কি জোর করিয়া তাহা আদায় করিবার চেষ্টা করে।

প্রশ্ন

আপনি যদি বর্ণাশ্রম পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিতে চান তবে সংগ্রামের দ্বারা কি তাড়াতাড়ি ভারতবর্ষে তাহা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়?

উত্তর

এ প্রশ্নই ওঠে না। কাহার কি কর্তব্য তাহা নির্ধারণ করা এবং সেই কর্তব্যপালনের সুযোগ দেওয়া জোরের কাজ নয়। মানুষ নিজের বৃত্তি অনুযায়ী কর্তব্য পালন করিয়া অধিকার লাভ করে। যেখানে কর্তব্য পালন না করিয়া অধিকার লাভের চেষ্টা হয় সেখানেই বলের প্রয়োজন হয়।

পঞ্চম প্রশ্ন

আপনি যে সকল মতামত দিলেন সেগুলি আপনার ব্যক্তিগত মত। আপনার জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে আপনি এই সকল জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের সকলের অভিজ্ঞতা যেমন সীমাবদ্ধ, জ্ঞানও তেমনই। অপর সকলের মত আপনার সত্যের দৃষ্টিও আংশিক এবং অসম্পূর্ণ। এক্ষেত্রে আমরা নিজের লব্ধ সত্যটুকু অসম্পূর্ণ জানিয়া যদি নিজের কাছেই রাখি, প্রচার না করি, তাহা হইলে কি ভাল হয় না?

পঞ্চম উত্তর

সত্যের প্রচার নিরোধ করিবার চেষ্টা করিলেও আপনি তাহা পারিবেন না। আমাদের জীবন যদি অন্তরের সত্যের শাসনে চালিত হয়, তবে তাহার দ্বারাই সত্যের প্রচার হইতে থাকিবে। সত্য স্বভাবত বৃদ্ধিশীল। সূর্য যেমন নিজের আলো লুকাইয়া রাখিতে পারে না সত্যের আলোও তেমনিভাবে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে।

গঠনকর্মপদ্ধতি

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ বিরচিত

কিছুদিন পূর্বে 'কমলাকান্তের দপ্তর' পড়িতেছিলাম। পড়িতেছিলাম, কমলাকান্ত দেখিলেন বঙ্গ-প্রতিমা অতল জলে নিমজ্জিত হইয়া গেল, কমলাকান্ত আকুল চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

"দেখিতে দেখিতে আর দেখিলাম না—সেই অনন্তকাল-সমুদ্রে সেই প্রতিমা ডুবিল। অন্ধকারে সেই তরঙ্গসংকুল জলরাশি ব্যাপিল, জল-কল্লোলে বিশ্বসংসার পূরিল। তখন যুক্তকরে, সজল নয়নে, ডাকিতে লাগিলাম, উঠ মা হিরণ্ময়ি বঙ্গভূমি! উঠ মা! এবার সুসন্তান হইব, সৎপথে চলিব—তোমার মুখ রাখিব। একা রোদন করিতেছি, কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু গেল মা! উঠ উঠ, উঠ মা বঙ্গজননি!"

আজ মনে হইতেছে, কমলাকান্তের আকুল চীৎকারের দিন শেষ হইয়াছে। মনে হইতেছে, আজ যেন সেই দুঃস্বপ্নের অবসান হইতে চলিয়াছে, কে যেন বলিতেছে যে, সেই উত্তাল জল দুই ভাগ করিয়া নিমজ্জিত বঙ্গ-প্রতিমা আবার ভাসিয়া উঠিবে, দশদিক আলোয় ঝলমল করিতে থাকিবে, আমরা আবার সম্মিলিত কণ্ঠে বজ্রস্বরে বলিতে পারিব, অবলা কেন মা এত বলে!

ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতবিভেদ ও বঙ্গভঙ্গের যে গভীর ছায়া আমাদের উপর ঝুলিতেছিল তাহার অবসান হয় নাই। বস্তুত তাহা হওয়া সম্ভব ছিল না, কেননা সাম্রাজ্যবাদ স্বেচ্ছায় ভাল পথে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিবে, ইহা ইতিহাসে লেখে না।

কিন্তু তবু বলিব, সেই ঘন অন্ধকারের ছায়া আমাদের উপর

পড়িতে থাকিলেও আলোর সন্ধান পাইতেছি। সে আলো সরকারী মহল হইতে আসিতেছে না, সে আলো জাগ্রত জনশক্তির বিচ্ছুরিত তেজে জ্বলিয়া উঠিতেছে।

ইহা রোমাঞ্চকর কল্পনা বা সুখস্বপ্ন নহে, চারিপাশে উদ্দাম জনসমুদ্রের যে গভীর কলরোল শুনিতেছি তাহাতে বোঝা যাইতেছে যে, এই তরঙ্গ থামাইবার নহে। দিকে দিকে মুক্তির আহ্বান পৌঁছিয়াছে, সেই আহ্বানে জনসাধারণ ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছে, তাহাদের আর সুবোধ বালকের মত ঘরে ফেরানো যাইবে না। আইনের ভয়, রক্তচক্ষুর ভয়, এমন কি প্রাণের ভয়ও তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। চীনে, ইন্দোনেশিয়ায়, ভারতবর্ষে, এমন কি সেদিন কলিকাতার রাজপথে তরুণ ছাত্রেরা সে কথা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করিয়া দিয়াছে।

অথচ ভয় এবং সম্ভ্রমই হইল রাজ্যশাসনের ভিত্তি, বিশেষত পরের দেশ শাসনের তাহাই হইল গোড়ার কথা। রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'র রাজা সর্বদা জালের আড়ালে থাকিত, লোকে তাহাকে দেখিলে তাহার মহিমা খর্ব হইয়া যাইবে। তেমনই সাম্রাজ্যবাদের মজাই এই যে, তাহার সম্ভ্রমটাই সর্বস্ব, প্রথম যুগে তাহার যে ক্ষমতা থাকে, শেষে বনেদীবংশের মত তাহা অন্তঃসারশূন্য হইয়া যায়। বাহিরে যে পরিমাণ মর্যাদা থাকে ভিতরে সে পরিমাণ ক্ষমতা থাকে না।

অবশ্য সাম্রাজ্যবাদ তাহার অন্তিম দিনের দিকে আগাইয়া চলিলেও এখনও একেবারে শক্তিহীন হইয়া পড়ে নাই। সেইজন্য যেখানে সম্ভব, সে তাহার মরণকামড় দিতে ত্রুটি করিতেছে না। বর্মা-বিজয়ের পর আবার তাহাদের পুরাতন অবস্থায় ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা হইতেছে, জাভায় ব্রিটিশ কামান জাহাজ এরোপ্লেন জাভাবাসীদের দেশপ্রেমের চরম মূল্য আদায় করিতেছে, যাহারা ভারতের স্বাধীনতার জন্য ভারতের

ভিতরে ও বাহিরে লড়াই করিয়াছিল তাহাদের শাস্তি দিতেছে, আর তাহাদের মুক্তিকামী নিরীহ ছাত্রদের নবযৌবনের স্বপ্নকে গুলির আঘাতে ভাঙিয়া কলিকাতার রাজপথ রক্তরঞ্জিত করিয়াছে।

কিন্তু এ কথা নিশ্চিত যে, এই উত্তাল তরঙ্গকে ফেরানো যাইবে না। পণ্ডিত নেহরু তাঁহার বিচারকালে একবার বলিয়াছিলেন যে, বর্তমান ক্ষেত্রে তিনি যে আসামী হইয়াছেন তাহার অর্থ দাঁড়ায়—আজ ব্রিটিশ সরকার সমস্ত ভারতবর্ষকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাইতে চাহেন। কিন্তু ভারতের মুক্তিপিপাসু কোটি কোটি নরনারীকে এইভাবে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাইবার চেষ্টায় সফল হওয়া মদগর্বিত সাম্রাজ্যবাদের পক্ষেও সম্ভব নহে। তাহার কারণ বর্তমান আইন-আদালতই আর সর্বোচ্চ শক্তির আধার নয়, স্বাধীনতা ও সুখশান্তির যে আদিম আকাঙ্ক্ষা জনমনকে উদ্বেল করিয়া তুলিতেছে ইতিহাস তাহারই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, ভবিষ্যৎ সেইভাবেই গড়িয়া উঠিবে।

সেইজন্যই আমাদের বিশেষভাবে চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে। এক দিকে যেমন জনশক্তি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, তেমনই অন্য দিকে ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে এমন এক যুগসন্ধি উপস্থিত, যে সময় স্বেচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ভারতত্যাগ করিতেই হইবে। কিন্তু তাহার পূর্বে আমাদের দুই দিক দিয়া প্রস্তুত হইতে হইবে।

প্রথমত সাম্রাজ্যবাদ এখনও যায় নাই। তাহার সম্পূর্ণ ধ্বংসের জন্য এই উদ্বেল জনশক্তিকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিচালিত করিয়া শেষ আঘাত হানিতে হইবে, সেজন্য প্রস্তুত হইবার প্রয়োজন হইয়াছে। কিন্তু ইহাও আর বড সমস্যা নহে। পণ্ডিত নেহরু কিছুদিন পূর্বে কলিকাতায় সিনেট হলে বলিয়াছেন যে, ইতিহাসের পটভূমিকায় দেখিতে গেলে ব্রিটিশ

সাম্রাজ্যবাদ ইতিমধ্যেই শেষ হইয়া গিয়াছে, যদিও বাহ্যত তাহা এখনও ঠিক আছে। ইহা আমাদের সব চেয়ে বড় সাম্প্রতিক সমস্যা হইতে পারে, কিন্তু এখন তাহার পরের কথাও ভাবিবার সময় আসিয়াছে। ভবিষ্যতে আমরা কিভাবে রাষ্ট্রগঠন করিব তাহার কাঠামোটা মোটামুটি পরিষ্কার হওয়া দরকার, সেই ভবিষ্যতের রাষ্ট্রের সাধনা শুরু করিবার সময় আসিয়াছে।

এই কারণে আমাদের জাতীয় জীবনে আমরা এতকাল যে উপায়ে যে দৃষ্টিভঙ্গিতে সাধনা ও সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছি, তাহা আর ভবিষ্যতে চলিবে কিনা, সে সম্বন্ধে চিন্তা জাগিয়াছে। আমাদের জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, আমাদের কর্মধারা দ্বিবিধ খাতে প্রবাহিত হইয়াছে। যখন আমাদের জাতীয়তাবোধ প্রথম জাগরিত হইল, তখন আমরা এক দিকে বিদেশী আক্রমণের হাত হইতে নিজেদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষা করিতে ব্যাকুল হইলাম। অন্য দিকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে আরম্ভ করিলাম, যাহাতে তাহারা সাম্রাজ্যবাদের গর্বে আমাদের দেশকে অপমান ও উপেক্ষা না করিতে পারে।

স্বদেশী যুগে রবীন্দ্রনাথের রচনায় যে মন্ত্র ঝংকৃত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা এই। তিনি লিখিয়াছেন, "ইংরেজের সহিত সংঘর্ষ আমাদের অন্তরে যে একটি উত্তাপ সঞ্চার করিয়া দিয়াছে তদ্দ্বারা আমাদের মুমূর্ষু জীবনীশক্তি পুনরায় সচেতন হইয়া উঠিতেছে। আমাদের অন্তরের মধ্যে আমাদের যে সমস্ত বিশেষ ক্ষমতা অন্ধ ও জড়বৎ হইয়া অবস্থান করিতেছিল তাহারা নতুন আলোকে পুনরায় আপনাকে চিনিতে পারিতেছে ··দীর্ঘ প্রলয়রাত্রির অবসানে অরুণোদয়ে যেন আমরা, আমাদেরই দেশ আবিষ্কার করিতে বাহির হইয়াছি আমাদের মনে যে

একটা ধিক্কারের প্রতিঘাত উপস্থিত হইয়াছে তাহাতেই আমাদিগকে আমাদের নিজেদের দিকে পুনরায় সবলে নিক্ষেপ করিয়াছে।"

সেইজন্য সরকারের সহিত আমাদের যেটুকু সম্পর্ক, তাহা বিরোধের সম্পর্ক, তাহা সংগ্রামের ও সংঘর্ষের সম্পর্ক, সে সম্পর্ক নেতিমূলক। আমরা তোমাদের চাই না, তোমাদের রাজ্যশাসন-সুশৃঙ্খলা চাই না, তোমাদের দয়াদাক্ষিণ্য চাই না—এই না-না-রবই প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিয়াছে। আর আমাদের শক্তিবৃদ্ধি হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা শুধু মৌখিক তর্জনগর্জন না করিয়া অসহযোগ ও আন্দোলন করিয়া সেই প্রতিবাদকে বেশ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছি এবং অনেকাংশে সফল হইয়াছি। আজ জনসমুদ্র এমন জোয়ারের বেগে টলমল করিতেছে যে, আমাদের নেতারাও সংযমের উপদেশ দিতে বাধ্য হইতেছেন।

অপর দিকে আমরা যাহা চাই, তাহার সঙ্গে সরকারের কোন সম্পর্ক ছিল না। সরকার দুই-একটা বাঁধ করিয়াছেন, কি রাস্তা প্রস্তুত করাইয়াছেন, ইহা তো গরু মারিয়া জুতাদান। সুতরাং আমরা যাহা চাই, তাহা সরকারকে বাদ দিয়াই গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছি, চেষ্টা করিয়াছি যাহাতে আমাদের আহত ক্ষত-বিক্ষত সমাজশরীরে নিজেরাই প্রলেপ দিতে পারি, সেই শরীরকে পুষ্ট ও শক্তিমান করিয়া তুলিতে পারি।

স্বদেশী সমাজের মূল কথা ইহাই। রবীন্দ্রনাথ সেদিন এই কথাটাই বলিতে চাহিয়াছিলেন যে, রাষ্ট্রশাসনের কর্তা যিনিই হোন-না কেন, আমাদের মর্মস্থল আমাদের সমাজে এবং সেই সমাজকে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারিলে যিনিই রাজা হোন-না কেন, আমাদের কিছু যায় আসে না।

স্বদেশী আমলের পর আমাদের সমাজগঠন এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে বহু পরিবর্তন ঘটিয়াছে সত্য, কিন্তু মূল কাঠামোকে আমরা এখনও অতিক্রম করিয়া যাইতে পারি নাই। এক দিকে আমরা এখনও বলিতেছি, চাই না এবং তাহা আরও সজোরে সবলে বলিতেছি, যাহা এতদিন স্পষ্টত বলিতে পারি নাই আজ তাহাই সতেজ উদাত্ত কণ্ঠে বলিতেছি, কুইট ইণ্ডিয়া। তেমনই অন্য দিকে আমাদের যাহা প্রয়োজন তাহা রাষ্ট্রকে বাদ দিয়াই গড়িবার চেষ্টা করিয়াছি, আমাদের গঠনমূলক কার্য-পদ্ধতির মধ্যে রাষ্ট্রের স্থান একেবারেই নাই।

এই মনোভঙ্গি আমরা আজও এড়াইতে পারি নাই, পারা সম্ভব নহে, কারণ এ দেশের রাষ্ট্র আমাদের রাষ্ট্র নহে। সেইজন্য এখন পর্যন্ত আমরা গঠনমূলক কার্যে স্বাবলম্বী হইবার চেষ্টা করিতেছি। যদি রাষ্ট্রের সাহায্য তাহাতে মেলে, ভাল, কিন্তু রাষ্ট্রের উপর প্রত্যাশা করিয়া আমাদের কোন পরিকল্পনা নাই। এমন কি, অনেক সময় এমনও ঘটিয়াছে যে, রাষ্ট্রের সাহায্য মিলিলেও আমরা তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছি, আমাদের ভাইবোনের রক্তে কলঙ্কিত হাত হইতে দান গ্রহণ করিতে আমরা পারি নাই।

স্বদেশী আমলে ভাবাবেগের বন্যায় যাহার বীজটি মাত্র ভাসিয়া আসিয়াছিল, ক্রমে পলি পড়িতে সেই বীজটি ধীরে ধীরে বহু রূপে বহু দিকে পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে। সেই যে সে-সময় কে যেন আমাদের সবলে নিজেদের দিকে নিক্ষেপ করিয়াছিল, সেই দিন হইতে আমরা গঠনমূলক কার্যে নিজেদের উপরই নির্ভর করিতে শিখিলাম। স্বদেশী আমলে আন্দোলন মধ্যবিত্ত সমাজকে অতিক্রম করিয়া সমাজের সমস্ত স্তরে পরিব্যাপ্ত হয় নাই। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সেই গোমুখী-ধারায় নানা জলপ্রবাহ মিশিয়া এখন তাহা প্রবল জলস্রোতে পরিণত হইয়া সাগরের

উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছে, তাহার মেঘনাদ সাগরের গর্জনের মতই শোনাইতেছে।

আমাদের এই জয়যাত্রার পথপ্রদর্শক মহাত্মা গান্ধী। তাঁহার মধ্যে বর্তমান অবস্থার স্বরটি যেরূপ নিখুঁতভাবে প্রতিরণন তুলিয়াছে, তাহা আর কখনও দেখা যায় নাই। সেইজন্য তাঁহার আন্দোলন যেমন জগতে এক অপূর্ব বিস্ময়, তাঁহার গঠনমূলক কার্যপদ্ধতিও জগতে এক অপূর্ব বস্তু। তাঁহার আন্দোলনের অপূর্ব দীপ্তির মূলে আছে অত্যন্ত গোড়ার কথাটা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে বলা। এ জগতে সর্বদা রফা করিয়া চলিতে হয়, সত্যের সঙ্গে মিথ্যার খাদ মিশাল দিয়া চলিতে হয়, ইহাই জাগতিক নিয়ম। সেখানে যদি কেহ বলিয়া বসে যে, আমি নিছক সত্য ছাড়া কিছু বলিব না, তাহা হইলে সমস্ত জগৎ বিস্মিত ও ভীত হইয়া পড়ে। দিনের আলো যেমন প্রবাদবাক্যের পেঁচা সহিতে পারে না, তেমনই এই সত্যের দীপ্তি সহ্য করা সাধারণ জগতের পক্ষে সম্ভব নহে। আমাদের শাস্ত্রে বলে, সদা সত্য কথা বলিবে, অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাচরণ হইতেছে, সেখানে অনাহূতভাবে স্বয়ং অগ্রসর হইয়াও সত্য কথা বলিবে। এমন কথা শাস্ত্রে বলে নাই যে, মিথ্যা কথা কহিও না। তাহা হইলে তাহা শুধু বারণ হইত, আদেশ হইত না। কিন্তু সদা সত্য কথা বলিবে— ইহা আদেশ, সুতরাং আগ বাড়াইয়াও, অপ্রীতিভাজন হইয়াও সত্য বলিতে হইবে। যে লোক অত্যন্ত মামুলি অথচ অত্যন্ত কঠিন এই নীতিবাক্যটাকে কাজে পরিণত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া দাঁড়াইল, লোকে দুই-চারিদিন তাহাকে উপহাস করিবার চেষ্টা করিবে, কিন্তু তাহা দুই-চারিদিনের বেশি নহে। মামুলি বলিয়াই তাহার অসাধারণ তেজে সকলে স্তম্ভিত হইয়া যায়। যাহা অত্যন্ত elemental তাহা অত্যন্ত elemental বলিয়াই অসম্ভব শক্তিশালী।

কিন্তু সকল elemental সত্যের তেজ সমান নয়। ক্ষুধায় আহার দরকার, ইহা একটি মৌলিক সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া বাঘ যদি বলিয়া বসে যে, সে জঙ্গলের সমস্ত পশুই মারিয়া ফেলিবে—তাহা মৌলিকও বটে সত্যও বটে, কিন্তু তাহার তেজ তবু বেশি হইবে না। অবশ্য যে বাঘ মারিবার পূর্বে বৈষ্ণবী বিনয় করে না, সোজাসুজি মারিতে আসে, সে তাহার স্পর্ধার জোরে আমাদের সম্ভ্রম উদ্রেক করে বটে, কিন্তু প্রীতির উদ্রেক করে না। আমরা সেই জন্যই অনেক সময় বৈষ্ণবী-ব্যাঘ্র অ্যাটলি সাহেব অপেক্ষা নিছক চার্চিল সাহেবকে বেশি সম্ভ্রম করি, কিন্তু প্রীতির দাবি কেহই করিতে পারে না।

কিন্তু যদি এমন কোনও মৌলিক সত্য দেখা যায়, যাহা শুধু মৌলিক সত্য নয়, তাহার মূল ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত, অহিংসায় প্রতিষ্ঠিত, তাহা হইলে তাহার তেজ কেহই সহ্য করিতে পারে না। আমি তোমার উপর অত্যাচার করিব—এ কথাও যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমি অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদ করিব—এই সত্যের জোর অপরটির চেয়ে বহু সহস্রগুণ বেশি।

সেইজন্য যখন গান্ধীজী বলিলেন যে, যে আইনে আমার দেশ পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইতেছে, সে আইনের রাজশক্তি থাকিতে পারে বটে, কিন্তু সে আইন আইন নয়, তখন সমস্ত দেশ অবাক্ বিস্ময়ে ভাবিল, এই সহজ কথাটা এমন স্পষ্টভাবে তো কেহই বলিতে পারে নাই! গান্ধীজী যখন লবণ আইন অমান্য করিবার জন্য ডাণ্ডীর পথে যাত্রা করিলেন, তখন সমস্ত দেশের আত্মা উদ্বেল হইয়া উঠিল। এমন যাত্রা ইতিপূর্বে কেহ করে নাই। গান্ধীজী যখন বলিলেন যে, আলাপ-আলোচনা আবার কি করিব, তোমরা এ দেশ ছাড়িয়া না গেলে এই ক্লেদপঙ্কের ও শোষণের অবসান হইবে না, তখন অনেকে হাঁ-হাঁ

করিয়া উঠিলেন যে, জাপানের সহায়তা করা হইবে, কিন্তু দেখিতে দেখিতে 'কুইট ইণ্ডিয়া' মহামন্ত্র এশিয়াময় ছড়াইয়া গেল, সমস্ত দেশ উথল হইয়া উঠিল, কেননা এইটা সব চেয়ে সহজ এবং সত্য বলিয়াই তো এতদিন এই কথাটা কেহ বলিতে সাহস করে নাই। ইহার মধ্যে রাগ নাই. ক্ষোভ নাই, ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষ নাই, জাপানীদের প্রতি প্রীতি নাই, কোনও ব্যক্তিগত প্রশ্ন নাই, এ হইল বিশুদ্ধ সত্যকে অহিংসার মধ্য দিয়া কার্যে আচরণ করা, ইহার বিরোধিতা করিবার ক্ষমতা কাহার আছে।

সেইজন্যই এ আন্দোলন ভারতবর্ষেই নূতন নয়, জগতে নূতন। কিন্তু গান্ধীজীর গঠনমূলক কর্মপন্থাও কম বিপ্লবী নহে। তীব্রতম সংঘর্ষের মধ্যেও যে প্রেম গান্ধীজী সঞ্চারিত করিতে পারিয়াছেন, সে প্রেম যে আরও বহুগুণে তাঁহার গঠনকার্যে প্রবাহিত হইবে ইহা স্বাভাবিক। সেইজন্য যেখানেই তিনি গঠনমূলক কার্যের কথা বলিয়াছেন সেখানেই তিনি বলিয়াছেন যে, বাধ্য হইয়া অধিকার দানের বদলে স্বেচ্ছায় দানই তাঁহার কাম্য, class-struggleএর পরিবর্তে trusteeship-এর থিয়োরিতেই তিনি দৃঢ়বিশ্বাসী।

এই স্বপ্ন এ জগতে কোন দিন সফল হইবে কিনা সন্দেহ। তাহার কারণ মানবপ্রকৃতি সে রকম নয়। ইতিহাসের শিক্ষা হইতেছে, মানুষ তীব্র সংঘর্ষ ছাড়া তাহার স্বার্থ ছাড়ে না, তাহা তাহার স্বভাব-বিরুদ্ধ। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় তত্ত্ব হিসাবে বিশ্বাস না করিলেও আমরা কৌশল হিসাবে ইহা গ্রহণ করিয়াছি, কেননা যখন সমস্ত শক্তি বহিঃ-শত্রুর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতে হইতেছে, তখন ভিতরে একতার দরকার। কিন্তু গান্ধীজীর কথা তাহা নহে। যাহা আমাদের policy, তাহা তাঁহার creed।

কিন্তু তাঁহার গঠনমূলক কার্যক্রমের ইহাও সব চেয়ে বড কথা নহে। ইহার সব চেয়ে বড কথা হইল, কেন ইহা policy হিসাবেও আমরা গ্রহণ করিলাম? আলোচনা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, দেশের বর্তমান অবস্থায় ইহার চেয়ে সুবিধার কার্যক্রম আর হইতে পারিত না,—ইহার মূল আমাদের দেশের অন্তরে নিহিত। কথাটি ভাল করিয়া বোঝা দরকার।

গান্ধীজী তাঁহার গঠনমূলক কার্যের আঠারোটি দফা নির্দেশ করিয়াছেন। দফাগুলি এইরূপ :—(১) সাম্প্রদায়িক ঐক্য (২) ছুৎমার্গ পরিহার (৩) মাদকতা বর্জন (৪) খাদি (৫) অন্যান্য গ্রাম-শিল্প (৬) গ্রামের স্বাস্থ্য (৭) নূতন বা বুনিয়াদী শিক্ষা (৮) বয়স্কদের শিক্ষা (৯) মহিলা-সমাজের উন্নতি (১০) স্বাস্থ্য ও শরীররক্ষা-সম্বন্ধীয় জ্ঞান (১১) রাষ্ট্রভাষা প্রচার (১২) মাতৃভাষা প্রীতি (১৩) অর্থনৈতিক সাম্যপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা (১৪) কিষাণ (১৫) মজুর (১৬) আদিবাসী (১৭) কুষ্ঠ চিকিৎসা (১৮) ছাত্র।

এই আঠারো দফাকে কয়েকটি দলে সংহত করা যায়। (ক) প্রথমত, সামাজিক সংস্কার—সাম্প্রদায়িক ঐক্য, ছুৎমার্গ পরিহার, মাদকতা বর্জন ও মহিলা-সমাজের উন্নতি ইহার মধ্যে পড়ে, (খ) দ্বিতীয়ত, স্বাস্থ্য—৬ এবং ১০ নং দফা ইহার মধ্যে পড়ে, (গ) শিক্ষা—ইহার মধ্যে ৭, ৮, ১১ এবং ১২ নং দফাকে আনিতে পারা যায়, (ঘ) আর্থিক ব্যবস্থা—ইহার মধ্যে ৪, ৫ এবং ১৩ নং দফা আসিয়া পড়ে। মোটামুটি বলিতে পারা যায় যে, এই কর্ম-পদ্ধতির মধ্যে সামাজিক সংস্কার, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং আর্থিক ব্যবস্থা—এই কয়টি বিষয়ের উপর ঝোঁক পড়িয়াছে।

ইহার প্রত্যেকটি লইয়া বিস্তৃত আলোচনা করিব না। মোটামুটি ইহার দৃষ্টিভঙ্গিটাই আমাদের বিবেচ্য। যেমন, শিক্ষার কথাটা ধরা যাক। শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক সময় অনেক বড বড় কথাই শোনা যায়। গান্ধীজী

সেসব কর্ণসুখকর কথা গ্রাহ্যও করেন নাই। তিনি এমন এক বুনিয়াদী শিক্ষার অবতারণা করিলেন, যাহাতে 'শিক্ষাতেই শিক্ষার শেষ'—এই মতাবলম্বীরা আঁতকাইয়া উঠিবেন, বলিবেন, শিক্ষার মস্তকচর্বণ হইল। কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনাতেই আমরা এ যুগে প্রথম দেখিতে পাইতেছি যে, তাহাতে আমাদের সামাজিক পটভূমিকার এবং সমাজের দাবির সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি আছে এবং সেই সঙ্গে শিক্ষা-ব্যবস্থার আর্থিক দিকটিরও অতি সহজে সমাধানের বন্দোবস্ত আছে।* সার্জেন্ট-পরিকল্পনার দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক ইহার উল্টা। কোথায় কতগুলি বাড়ি হইবে, কত মাহিনা হইবে, ইহা আজও আমাদের প্রধানতম সমস্যা নহে। সার্জেন্ট-পরিকল্পনার পিছনে যেন এই ধারণাই আছে যে, যত টাকাই লাগুক না কেন সরকারী রাজস্বখানা হইতে সে টাকা আসিবে। অবশ্য যেদিন আমাদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা আসিবে, সেদিন আমরা শুধু লম্বাচওড়া হিসাবের কথাই ভাবিব না, সেই সঙ্গে কতরকম শিক্ষার কথা ভাবিব, নানাবিধ বিজ্ঞানশিক্ষার কথা ভাবিব, শিল্পশিক্ষার কথা ভাবিব, চারুকলার কথা ভাবিব। কিন্তু যতদিন তাহার উপযুক্ত পরিবেশ না ঘটিতেছে, ততদিন অকারণ বড় বড় কথা ভাবিয়া লাভ কি? গান্ধীজীর পরিকল্পনায় ঠিক এই সব বড় বড় কথাই নাই। এখন সব চেয়ে বড় সমস্যা হইল, কি উপায়ে গ্রামের ছেলেদের অল্প খরচে লেখাপড়া এবং হাতের কাজ শিখাইয়া মানুষ করা যায়। গ্রামের ছেলেরা কি করিয়া পাঠ্যাবস্থাতেই অর্থসংগ্রহ করিয়া ভবিষ্যৎ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারে এবং এই মিছামিছি শেক্স্পীয়র বেকনের লাইন মুখস্থ না করিয়া আমাদের বর্তমান সামাজিক অবস্থায় সংসারের দাবি ও শিক্ষার

---

* এ বিষয়ে পৌষ, ১৩৫২ সালের 'প্রবাসী'তে "শিক্ষা সংস্কার" প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি।

প্রয়োজনের চমৎকার সমন্বয় ঘটাইতে পারে তাহার পথনির্দেশ—তাঁহার পরিকল্পনায় আছে। ইহাতে একাধারে শুধু যে প্রকৃত মানুষ গড়িবার ব্যবস্থাই হইল তাহা নহে, সে ব্যবস্থার জন্য রাষ্ট্রের শরণাপন্ন হইতে হইল না।

তেমনই অন্য ব্যাপারেও এইরকম খুব সহজ অথচ অত্যন্ত সুস্থ এবং দৃঢ় মনোভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। যথা, খাদি। গান্ধীজী বলিয়াছেন, "the Khadi mentality means decentralization of the production and distribution of the necessaries of life"। গান্ধীজী শুধু রাজনৈতিক প্রতীক হিসাবেই খাদিকে সীমাবদ্ধ রাখেন নাই, তিনি ইহাকে একটি অর্থনৈতিক কার্যক্রমের অঙ্গীভূত করিয়া জীবিকার উপায় হিসাবেও দেখিয়াছেন। তাঁহার ভাষায় "It means a wholesale swadeshi mentality, a determination to find all the necessaries of life in India, and that too through the labour and intellect of the villagers. That means a reversal of the existing process." আমরা আজকাল যে ছবি দেখিয়া থাকি, এখানে সে ছবি নাই। আজকাল আমরা কি চাই? আমরা চাই, এক দিকে বড় বড় শহর, বড় বড় কলকারখানা গড়িয়া উঠুক, তাহার মালিক ব্যক্তিবিশেষ না হইয়া রাষ্ট্র হউক, চাষী-মজুরের কষ্ট হইলে রাষ্ট্র তাহাদের সাহায্যে আসুক। কিন্তু খাদি-পরিকল্পনা তাহা নহে। গান্ধীজী স্পষ্টতই বলিতেছেন যে, ইহা বর্তমান ব্যবস্থার বিপরীত,—গান্ধীজীরই কথায় "That is to say that, instead of half a dozen cities of India and Great Britain living on the exploitation and the ruin of the 700,000 villages of India, the latter will be largely self-

contained, and will voluntarily serve the cities of India and even the outside world in so far as it benefits both the parties."

রাষ্ট্রকে বাদ দিয়া এইভাবে আমাদের অভাবমোচনের চেষ্টাই কুটিরশিল্প-প্রতিষ্ঠার কথায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। এমন কি আর্থিক সাম্য প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন গান্ধীজী দেখিয়াছেন, সেখানেও তিনি বলিয়াছেন, ইহা স্বেচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত হইবে, সরকারী আইন করিয়া ট্যাক্স বসাইয়া তাহা করিতে হইবে না।

গান্ধীজী স্পষ্টতই বলিয়াছেন যে, এই সমস্ত ব্যাপার ছোট নহে, রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত তাহা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এ দুইটি একই জিনিষের দুই দিক। গান্ধীজীর অনবদ্য ভাষায় বলিতে গেলে "Many people do many things, big and small, without connecting them with non-violence or independence. They have then their limited value as expected. The same man appearing as a civilian may be of no consequence, but appearing in his capacity as General he is a big personage, holding the lives of millions at his mercy. Similarly the Charkha in the hands of a poor widow brings a paltry pice to her. In the hands of a Jawaharlal it is an instrument of India's freedom ·· For, my handling of Civil Disobedience without the constructive programme will be like a paralysed hand attempting to lift a spoon···" অর্থাৎ আমরা এখন যে সামাজিক রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থায় আছি, তাহাতে যদি রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে

সরকারের সহিত আমাদের সম্বন্ধ সংঘর্ষমূলক থাকে, সেখানে যদি আমাদের না-না-না ছাড়া অন্য কিছু বলিবার না থাকে, তাহা হইলে যেখানে কিছু গড়িতে হইবে, যেখানে কিছু হাঁ বলিতে হইবে, সেখানে আমাদের স্বাবলম্বী হইতে হইবে এবং এমন পরিকল্পনা করিতে হইবে, যাহাতে আমাদের সমাজের মর্মস্থলে আবার রস গিয়া পৌঁছায় এবং আমাদের সমাজ রাষ্ট্র-নিরপেক্ষভাবে নূতন সঞ্জীবিত হইতে পারে। সংঘর্ষে শক্তি ব্যয় করিতে হইলে এইভাবে অন্য দিকে আমাদের শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে। সেই কারণেই গান্ধীজীর পরিকল্পনায় গঠনমূলক কার্যক্রম এবং আন্দোলন পৃথক নহে, একই জিনিষের দুইটি দিক।

পূর্বে বলিয়াছি, দেশের বর্তমান অবস্থায় ইহা অপেক্ষা অদ্ভুত এবং আশ্চর্য কার্যক্রম আর হইতে পারে না। যে সময় রাষ্ট্র আমাদের নহে, যে সময় আমাদের তনু মন প্রাণ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে, সে সময় গান্ধীজী এমন একটি কার্যক্রম উপস্থিত করিলেন, যে কার্যক্রম রাষ্ট্রকে বাদ দিয়া চলিয়াছে অথচ আমাদের বর্তমান অবস্থায় যাহা এখনই কাজে পরিণত করা যায়। শুধু তাহাই নহে, ইহা কাজে পরিণত করিলে বর্তমান সমাজের মর্মস্থলে সঞ্জীবন রস প্রবেশ করাইতে পারা যায়, বস্তুত ও দুইটি আনুষঙ্গিক। একাধারে এতগুলি কাজ করিতে পারে—এ রকম কার্যক্রম আর দেখা যায় নাই।

কিন্তু তথাপি একটা বৃহৎ প্রশ্ন আমাদের সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। বর্তমান মুহূর্তে জগৎ যেখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং সংগ্রাম করিতে করিতে আমরা যেখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, সে সময় আমাদের উপলব্ধি হইতেছে যে স্বেচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক ইংরেজকে ক্ষমতা হস্তান্তর করিতেই হইবে, তাহা আজই হউক বা দুই দিন পরেই হউক। পূর্বেই বলিয়াছি যে, সেদিন পণ্ডিত জওহরলালও বলিয়াছেন যে, ব্রিটিশ-বিতাড়ন

এখন তাহার মনে ছোট সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে, ব্রিটিশ-বিতাড়নের পর কি হইবে সে সম্বন্ধে ভাবিবার সময় আসিয়াছে। ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবে তাহা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

ব্রিটিশ-বিতাড়নের পর কি হইবে, সে সম্বন্ধে চিন্তা করুন, তাহা লইয়া আলোচনা করা আপাতত আমাদের উদ্দেশ্য নহে। কেবল একটি কথা বলিব। এ পর্যন্ত আমাদের গতি ও বিকাশের যে প্যাটার্ন ছিল, তাহা একেবারেই বদলাইয়া যাইবে। এ পর্যন্ত আমাদের সকল কার্যাকার্যের একটি কথা ছিল এই যে, আমাদের রাষ্ট্র আমাদের ছিল না. সেইজন্য আমরা বিরোধের বেলায় রাষ্ট্রকে স্মরণ করিয়াছি, বিকাশের বেলা নহে। সরকারকে শত্রুভাবে উপাসনা করিয়াছি, মিত্রের সন্ধান করিয়াছি আমাদের সমাজে—আমাদের গ্রামে। কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তর হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমস্তই বদলাইয়া যাইবে, উপাসনাপদ্ধতিও বদলাইয়া যাইবে। সুতরাং প্রশ্ন জাগিতেছে, যখন রাষ্ট্র আমাদের হইবে, তখনও কি আমরা রাষ্ট্রকে শত্রুভাবে উপাসনা করিব? তখন যে সমাজ, যে ঐতিহাসিক অবস্থা আসিবে, তাহাতে বর্তমান গঠনক্রম কি সম্পূর্ণ সমাজবিচ্যুত এবং অর্থহীন হইয়া দাঁড়াইবে না?

এই প্রশ্ন উপস্থাপিত করিবার কারণ এই যে, ইহা আর ভবিষ্যতের কথা নয়, বর্তমানের সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে বা দাঁড়াইবে। সম্পূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর হইতে এখনও কিছু দেরি আছে বটে, কিন্তু আংশিক ক্ষমতা হস্তান্তর শুরু হইয়া গিয়াছে এবং শীঘ্রই তাহা আরও হইবে। ফলে প্রদেশগুলিতে তো বটেই, কেন্দ্রেও কংগ্রেসকে মন্ত্রীত্ব গ্রহণের দায়িত্ব লইতে হইতে পারে।

সেই সঙ্গে অন্য দিকটাও বিবেচ্য। ঠিক এই সময়েই আমাদের দেশের উপর দিয়া যুদ্ধের যে ঝড় বহিয়া গিয়াছে এবং তাহার বিষনিশ্বাসে

দেশ যেরূপ মরুভূমি হইয়া গিয়াছে, তাহা পূর্বে হয় নাই। এই অবসন্ন শোষণক্লিষ্ট নিষ্পিষ্ট দেশের পুনর্গঠনের দরকার এখন যেরূপ তীব্র হইয়া উঠিয়াছে, পূর্বে সেরূপ হইয়াছে কিনা সন্দেহ। সুতরাং এখন প্রশ্ন দাঁড়াইতেছে এই: এক দিকে দেশ হাহাকার করিতেছে, অন্য দিকে যতই সীমাবদ্ধ হউক না কেন রাষ্ট্রক্ষমতা (এবং অর্থ ও রাষ্ট্রযন্ত্র) হাতে আসিতেছে—এ অবস্থায় রাষ্ট্রের সহায়তা আমরা করিব কিনা, রাষ্ট্রের উপাসনা আমরা করিব কিনা?

ইহার উত্তরে সকলেই অবশ্য বলিবেন, যতদিন আমাদের হাতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা না আসে, ততদিন আমরা রাষ্ট্রের উপাসনা ততটুকু করিতে পারি, যতটুকু করিলে আমরা চরম সংগ্রামের জন্য সঞ্চিত শক্তি ক্ষয় না করিয়াও দেশের সেবা করিতে পারি। ঠিক কথা, কিন্তু আমার প্রশ্ন তাহা নহে। যতদিন সম্পূর্ণ ক্ষমতা না হাতে আসে, ততদিন ছোট লাভের মোহে বড়কে ভুলিলে নিশ্চয়ই চলিবে না। কিন্তু যেখানে সেরূপ কোনও বিপদ নাই, সেখানে কি হইবে?

আসল কথা, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাইতে হইবে কিনা? আমাদের সংগ্রাম এবং আমাদের গঠনক্রম যে মূল কাঠামোর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সেই কাঠামোটাই যখন অন্যরূপ হইতেছে, তখন আমাদের বিরোধ ও বিকাশের সমস্ত সমস্যাটাই অন্য আকার ধারণ করিবে। এতদিন যাহাকে শত্রুভাবে উপাসনা করিলাম, আজ যখন তাহাকে মিত্র ও সহায়ভাবে পাইব, তখন আমাদের কার্যক্রম কি হইবে?

গত অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'র প্রারম্ভিক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত নির্মলকুমার বসু লিখিয়াছেন, 'গান্ধীজী বলিবেন ঠিক কথা। কিন্তু ধনোৎপাদনের উপাদানও অবশেষে রাষ্ট্রের অধিকারে থাকার চেয়ে আমি পঞ্চায়েতের অধিকারে রাখার পক্ষপাতী। রাষ্ট্র এবং পঞ্চায়েতের মূলে

যে প্রভেদ আমি দেখিতে পাই, তাহা বলিতেছি। পঞ্চায়েতের হাতে মানুষ শুভবুদ্ধির বশবর্তী হইয়া ক্ষমতা সঁপিয়া দেয়, শাসন করার অস্ত্র তাহার যৎসামান্য থাকে, মানুষকে রাজি করাইয়াই পঞ্চায়েত বেশির ভাগ কাজ আদায় করে। কিন্তু রাষ্ট্রের পীড়নের ক্ষমতা অসীম। যাঁহারা রাষ্ট্র পরিচালনা করেন, তাঁহারা নিপীড়ন করিয়া বা শাসনের ভয় দেখাইয়াই কাজ হাঁসিল করিয়া লন। এই নিপীড়নেই আমার বিশেষ আপত্তি। যে কেন্দ্রীকরণ অসমান শক্তিপুঞ্জের মধ্যে নিপীড়নের সাহায্যে গড়িয়া উঠে, তাহার চেয়ে ভয়াবহ বস্তু আর কিছু নাই। বিকেন্দ্রীকরণের রস দিয়াই তাহাকে জীর্ণ করিয়া মঙ্গলজনক পদার্থে পরিণত করা সম্ভব।"

এইখানেই আমার প্রশ্ন। যদি ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইবার পরও রাষ্ট্র ও সমাজে পার্থক্য বজায় রাখিতে হইল, তবে আর কি ক্ষমতা হস্তান্তর হইল? বিকেন্দ্রীকরণে আপত্তি করিতেছি না। কিন্তু যদি কেন্দ্রীকরণেই আপত্তি থাকে, তাহা হইলে এমন রাষ্ট্র গঠিত হউক না কেন যাহার মধ্যে কেন্দ্রীকরণ থাকিবে না, যাহা বিকেন্দ্রীকরণের ভিত্তিতেই গড়িয়া উঠিবে। কিন্তু যখন আমাদের রাষ্ট্র গড়িবার সম্পূর্ণ অধিকার আমাদের হাতে আসিবে, তখনও রাষ্ট্রকে মনের মত না গড়িয়া রাষ্ট্রের যাহা হয় হউক বলিয়া আমরা কাজের যন্ত্র স্বরূপে আর একটা পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গড়িতে বসিব?

আসলে ইহা কি আমাদের পুরাতন সংস্কারেরই জের নয়? আমরা চিরদিন রাষ্ট্রকে সন্দেহের চোখে দেখিতে অভ্যস্ত, এতদিন পর্যন্ত গঠনকর্মে রাষ্ট্রযন্ত্রকে বিশ্বাস না করিয়া আলাদা একটি যন্ত্র গড়িবারই চেষ্টা করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু এখন রাষ্ট্রযন্ত্রকেই জনসাধারণের অধীনে রাখিতে আমরা সমর্থ হইব, রাষ্ট্রব্যবস্থা এমন করিয়া করিতে পারিব যে, কেন্দ্রীকরণ ও নিপীড়ন তাহার মধ্যে স্থান পাইবে না, তখন আমরা মনে প্রাণে

রাষ্ট্রযন্ত্রকেই সুচারু করিবার চেষ্টা না করিয়া তাহার পাশাপাশি আবার একটি আলাদা ব্যবস্থায় শক্তির অপচয় করিব কেন ?

একটা দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করিতেছি। এখনও আমাদের হাতে পূর্ণ ক্ষমতা আসে নাই। প্রাদেশিক মন্ত্রীমণ্ডলীর হাতে যে ক্ষমতা আসিয়াছে, তাহা নিতান্তই সীমাবদ্ধ। এই অবস্থারই কথা ধরা যাক। বাংলা দেশে কংগ্রেস-মন্ত্রীসভা হইল, সে সময় দেশের পুনর্গঠনের জন্য তাঁহারা কিছু টাকাকড়ি পাইলেন। এ সময় যদি আমরা গঠনমূলক কর্মের সীমানা আমাদের বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে সীমাবদ্ধ রাখি, তাহা হইলে ফল কি হইবে ? এক দিকে আমরা চাঁদা ও ব্যক্তিগত সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া আমাদের কর্মের সীমানা অত্যন্তই সীমাবদ্ধ রাখিব, অন্য দিকে কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল নিঃস্বার্থ কর্মীদের সহায়তার বদলে মমতাহীন কর্মচারীদের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইবেন।

ইহার উত্তরে বলা চলে, কেন, এ ক্ষেত্রে কংগ্রেসকর্মীরা সরকারের সহায়তা করিলেই তো গোল মিটিয়া যায়। ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোঝা যায় যে, ঐভাবে গোল মেটানো সম্ভব নয়। ইহা যদি কোনও সাময়িক বা স্থানীয় প্রশ্ন হইত (যেমন বন্যা, ভূমিকম্প) তাহা হইলে ঐ কথা বলা চলিত। কিন্তু যেখানে সমস্ত দেশের স্বার্থ জড়িত এবং প্রশ্নটাও সাময়িক নহে, সেখানে আলাদা হইয়া থাকার অর্থ হইল—সমস্ত দেশের লোকের নিকট হইতে আলাদা হইয়া থাকা। অর্থাৎ সমস্ত দেশের লোক যে যন্ত্র স্থাপন করিল, কংগ্রেসকর্মীরা তাহা হইতে বিচ্যুত হইয়া রহিয়া নিজেদের একটি প্রতিষ্ঠান করিবার চেষ্টা করিলেন।

যদি ইহা ঘটে, তবে কংগ্রেসের প্রাথমিক উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। এ কথা আজ দৃঢ়ভাবে বুঝিবার সময় আসিয়াছে যে, ভবিষ্যৎকালে আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেই হইবে, দুই নৌকায় পা দেওয়া চলিবে

না। যদি বুঝি, ক্ষমতা আমাদের হাতে আসে নাই, তাহা হইলে এখনকার সংগ্রাম আরও তীব্রতর করিব, তখনকার গঠনকর্ম আরও দৃঢ়তর করিব। কিন্তু যদি বুঝি, ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইয়াছে, তখন সমস্ত রাষ্ট্রযন্ত্র দেশসেবায় না লাগাইয়া আলাদা প্রতিষ্ঠান গড়িব, এ কথা স্ববিরোধী কথা।

এই কথাটার উপলব্ধি হইয়াছে বলিয়াই জাতীয়-পরিকল্পনা কমিটি যে ধরণের পরিকল্পনা করিতেছেন, তাহার মধ্যে রাষ্ট্রভীতি নাই, রাষ্ট্রকে খাটাইবার চেষ্টা আছে। যে যুগ শেষ হইয়া যাইতেছে গান্ধীজীর গঠনকর্ম তাহার প্রতিচ্ছবি হইলেও যে যুগ আসিতেছে তাহার গোড়ার কথাটা যদি অন্য হয়, তবে তাহার কার্যক্রমের গোড়ার কথাটাও অন্য হইবে। গান্ধীজীর গঠনক্রম এবং জওহরলালের গঠনক্রমের মধ্যে সেইজন্য যুগান্তরের আভাস আছে, আগেরটি যেখানে আসিয়া থামিয়াছে পরেরটি তাহার পর হইতে আরম্ভ হইয়াছে, মধ্যে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির বদল হইয়াছে এইরূপ একটা অদৃশ্য assumption রহিয়াছে।

বিব্রত বিপন্ন বাংলা দেশের পক্ষে এই প্রশ্ন আজ সেইজন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা দেশে লোভ ও অকল্যাণের ঝড় বহিয়া গিয়াছে, তাহার পুনর্গঠনের প্রয়োজন খুবই বেশি। রিলিফের নামে কি অপব্যয় হয়, সে অভিজ্ঞতা দুর্ভিক্ষের সময় আমাদের ভালভাবেই হইয়াছে। সুতরাং পুনর্গঠনের পরিকল্পনার সময় বাস্তব ও বলিষ্ঠ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়াই চলিতে হইবে, যাহাতে পরিকল্পনাটি আমাদের অভাব-অভিযোগ বাস্তবিকই দূর করিতে পারে। কিন্তু যদি সমাজের প্রতিবেশের সহিত পরিকল্পনার সামঞ্জস্য না থাকে, তবে সে পরিকল্পনা সফল হইতে পারে না। আমরা যে সমাজে প্রবেশ করিতেছি, আমাদের গঠনকর্মক্রম তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই নির্ধারণ করিতে হইবে। বাংলা দেশ,

বিশেষত বাংলার ছাত্রেরা, সেদিনও নিঃশঙ্কচিত্তে তাহাদের বক্ষোরক্তে প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, সংগ্রামের বেলায় তাহারা কাহারও পিছনে পড়িয়া নাই, গঠনকর্মেও তাহারা পিছাইয়া পড়িবে না ইহা নিশ্চিত। কিন্তু কি ভাবে কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করিলে এই অমিত যৌবনতেজ অকারণে ব্যয়িত হইবে না তাহা চিন্তা করার সময় আসিয়াছে, কেননা কোনও কার্যক্রমই তাহার সমাজকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না এবং সেখানে ভুল করিলে শক্তিক্ষয় অনিবার্য। আমরা যে যুগসন্ধিতে উপস্থিত, সে সময় ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া এমন একটি কর্মক্রম নির্ধারিত হউক যাহাতে—বাংলার বুকফাটা তৃষ্ণায় যেন শুধু কয়েকবিন্দু বারিবর্ষণ না হয়, তাহার তৃষ্ণা সম্পূর্ণ মিটে।

অহিংস বিপ্লব

মৌলিক প্রশ্ন

শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সিংহ আষাঢ় মাসের 'শনিবারের চিঠি'তে গঠনকর্ম সম্পর্কে একটি অতিশয় সঙ্গত প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। ভারতবর্ষে আজ জনসাধারণ এবং শাসক-সম্প্রদায়ের মধ্যে সংগ্রাম চলিয়াছে। এই সংগ্রাম কখনও তীব্র আকার ধারণ করে, কখনও বা মন্দীভূত অবস্থায় চলিতে থাকে। আজ হয়তো সাময়িক প্রয়োজনে গান্ধীজীর উপদেশমত আমরা ভারতবর্ষের উৎপাদন-ব্যবস্থাকে কেন্দ্রীয় শাসনের আয়ত্ত হইতে মুক্ত করিবার জন্য টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিতে পারি, অর্থাৎ গ্রামগুলি যাহাতে খাওয়াপরার ব্যাপারে যথাসম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়, লড়াইয়ের তাগিদে হয়তো বা সে অবস্থা প্রতিষ্ঠা করিতেও পারি। কিন্তু প্রশ্ন হইল, যুদ্ধ যখন শেষ হইবে, অর্থাৎ জনসাধারণের পক্ষে জয়লাভ ঘটিবে, যখন চাষী-মজুরগণের স্বার্থপোষণই রাষ্ট্রের একমাত্র লক্ষ্য হইবে, তখনও কি বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থা জীয়াইয়া রাখার প্রয়োজন আছে? অর্থাৎ ভবিষ্যতেও কি রাষ্ট্র হইতে স্বতন্ত্র কতকগুলি জনপ্রতিষ্ঠানের দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক জীবনকে পরিচালিত করিবার হেতু আছে?

প্রশ্নটি উত্থাপন-প্রসঙ্গে লেখক বলিয়াছেন, যদি তখনও সেরূপ ব্যবস্থা কায়েম থাকে তবে বুঝিতে হইবে, গান্ধীজীর মতানুসারে রাষ্ট্র এবং জনস্বার্থের মধ্যে ঐক্য কোনদিনই সম্ভব নয়। কিন্তু কংগ্রেস যে সময়ে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সময়ে গ্রামের পুনর্গঠনের জন্য, গঠনকর্ম প্রসারের জন্য, মন্ত্রীবৃন্দ রাষ্ট্রশক্তির প্রভাব প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হন

নাই। অতএব ভবিষ্যৎ ভারতেও জনস্বার্থের পুষ্টিসাধনের জন্য রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োগ আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক এবং সমীচীন হইবে এবং যুদ্ধকালে জনস্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে যে সকল প্রতিষ্ঠান গড়া হইয়াছিল, সেগুলি অপ্রয়োজনীয় হওয়াই স্বাভাবিক হইবে অথবা সেগুলি রাষ্ট্রের বিভাগ হিসাবে রূপান্তরিত হইবে।

বর্তমানে আলোচনাটি উত্থাপন করা অতিশয় সমীচীন হইয়াছে। প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিকও বটে। ইহার সংক্ষেপে সমাধান সম্ভব হইবে না ভাবিয়া একটু গোড়া হইতেই আলোচনা আরম্ভ করিব। আশা করি ধৈর্যশীল পাঠক তজ্জন্য ত্রুটি মার্জনা করিবেন।

মূলত প্রশ্নটি হইল, অহিংস সমাজব্যবস্থায় সমাজের নিয়ন্ত্রণভার রাষ্ট্রের উপরে কতখানি নির্ভর করিবে, তাহা লইয়া।

ভারতবর্ষের গ্রাম অথবা প্রদেশগুলি এক সময়ে মোটামুটি খাওয়াপরার ব্যাপারে দূরদেশের উপরে বিশেষ নির্ভর করিত না। তখন জীবনধারণের মত প্রয়োজনীয় দ্রব্য গ্রাম বা গ্রামের কাছাকাছি উৎপন্ন হইত, শখের জিনিষ অথবা মূল্যবান প্রয়োজনীয় সামগ্রী, যাহা নিত্য খরিদ করিবার আবশ্যকতা হয় না, তাহা দূরের হাট বা মেলা অথবা কোন শহর হইতে আমদানি হইত। এই ব্যবস্থার মধ্যে কতকগুলি সুবিধা এবং কতকগুলি অসুবিধাও ছিল। সুবিধার মধ্যে, দেশে রাজার পর রাজা শাসন করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু গ্রামবাসীর জীবন রাজতন্ত্রের পরিবর্তনে অল্পবিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত বা ধ্বংস হয় নাই, আবার অল্পদিনের মধ্যে গ্রাম্য অর্থনৈতিক জীবনের ভারকেন্দ্র স্থিরত্ব লাভ করিয়াছে। অসুবিধার মধ্যে দুইটি প্রধান। কোন প্রদেশে দুর্ভিক্ষ বা মহামারী উপস্থিত হইলে অন্য প্রদেশ হইতে দ্রুত পর্যাপ্ত পরিমাণ রসদ আমদানি করা সম্ভব হইত না, চলাচলের ব্যবস্থা অধিক

বিকেন্দ্রীকরণের ফলে অতদূর উন্নতিলাভ করে নাই। দ্বিতীয়ত, ভারতের কোন অংশ বিদেশীর দ্বারা আক্রান্ত হইলে সমগ্র ভারতের পক্ষে এক হইয়া হঠাৎ শত্রুকে প্রতিহত করাও সম্ভব হইত না। আর্থিক জীবনে ছাড়া ছাড়া ভাব কায়েম হইয়া ছিল, এবং হয়তো অংশত সেই কারণে মধ্যযুগে মুসলিম শক্তি অথবা অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজী ধনতন্ত্রের প্রসারকেও ভারতবাসী সম্মিলিত বাহুবলের দ্বারা প্রতিহত করিতে সমর্থ হয় নাই।

ধনতন্ত্রের প্রসারের ফলে আজ ভারতবর্ষের আর্থিক জীবন এবং উৎপাদনব্যবস্থা এমনভাবে ঢালিয়া সাজা হইয়াছে, যাহার ফলে কোনও গ্রাম বা কোনও প্রদেশ, অথবা সমাজের মধ্যে কোনও শ্রেণী, এমন কি সমগ্র ভারতবর্ষ, আজ যাহা উৎপাদন করে শুধু তাহা ব্যবহার করিয়া সুখে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারে না। বোম্বাই বা মধ্যপ্রদেশে অপর্যাপ্ত তুলা উৎপন্ন হয়, বাংলায় কিছু ধান ও প্রচুর পাট হয়। কিন্তু বোম্বাই অথবা বাংলায় তুলা বা পাট যদি যথাসময়ে বিক্রয় না হয় তবে মানুষের দুর্গতির আর সীমা থাকে না। বাংলার চাষ অথবা বোম্বাইয়ের চাষী, কিংবা কলিকাতার পাটকলের কুলি এবং বোম্বাই ও নাগপুরের কাপড়কলের মজুরের পক্ষে আজ ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইলে স্বীয় শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যের উপরে নির্ভর করিয়া প্রাণধারণ সম্ভব নয়। যদি সেই সব মালের বিনিময়ে ব্যবহার্য জিনিষ পাওয়া না যায়, চলাচলে ও ব্যবসায়ে বাধাবিঘ্ন ঘটে, তবে অন্নবস্ত্রের অভাবে চাষী এবং মজুরকে সর্বত্র বিকল হইয়া পড়িতে হয়। যে মুষ্টিমেয় শাসক-সম্প্রদায় আজ ব্যবসা-বাণিজ্যের কলকাঠি নিজের আয়ত্তে রাখিয়াছে, তাহার পক্ষে অন্নবস্ত্রের অভাবে দেশের জনসাধারণকে কাবু করা কিছুই কঠিন অথবা অসম্ভব হয় না।

ইহা হইতে মুক্তির দুইটি উপায় হইতে পারে। যদি ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের চাষীমজুর কোনও এক দ্রুত বিদ্রোহের ফলে রাষ্ট্রশক্তি দখল করিয়া উৎপাদনব্যবস্থার উপরে অধিকার বিস্তার করিতে পারে, অর্থাৎ বর্তমান শাসকসম্প্রদায় অন্নবস্ত্রের অভাবে তাহাদিগকে কাবু করিবার পূর্বেই যদি চাষীমজুররাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তো গান্ধী-প্রদর্শিত আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণের কোন প্রয়োজনই হয় না। ভারতবর্ষের মধ্যে সেইজন্য এমন এক শ্রেণীর বিপ্লবী আছেন যাঁহারা মনে করেন, শাসকবর্গকে পরাস্ত করিবার জন্য ধনতন্ত্রের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে যে উৎপাদনব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা নষ্ট করিবার আবশ্যকতা নাই, চাষীমজুরকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া, মাঝে মাঝে খণ্ডযুদ্ধে লিপ্ত করিয়া তাহাদের প্রতিরোধ-ক্ষমতাকে সুসংহত করিতে এবং অবশেষে কোনও ঐতিহাসিক সুযোগের সন্ধিক্ষণে সম্মিলিত চেষ্টায় বিপুল আক্রমণের দ্বারা রাষ্ট্রশক্তি, অর্থাৎ সমাজের আর্থিক এবং রাজনৈতিক জীবনের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানকে চাষীমজুরের করায়ত্ত করিবার আয়োজন করিতে হইবে।

যাঁহারা বিপ্লবের, অর্থাৎ জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির জন্য উপরোক্ত পন্থা অবলম্বন করেন, তাহাদের সঙ্গে আমার কোনও কলহ থাকিতে পারে না। কিন্তু আমার বক্তব্য হইল এই যে, গান্ধীজী জনসাধারণের মুক্তির জন্য, অর্থাৎ সমাজের উৎপাদন এবং নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে উৎপাদকবৃন্দের করায়ত্ত করিবার জন্য যে বিপ্লব-প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহা উপরোক্ত প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বর্তমান আলোচনার সুযোগ লাভ করিয়া, সেই প্রণালীর বিশেষত্ব কোথায়, আমি তাহাই প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিব। প্রসঙ্গক্রমে হিংস এবং অহিংস সংগ্রামকৌশলের মধ্যে প্রভেদ কি, আদর্শ অহিংস

সমাজে বিকেন্দ্রীকরণের মাত্রা কতদূর বাঞ্ছনীয়, এ সকল বিষয়েও কিছু কিছু কথা উঠিবে। সমগ্র আলোচনা শেষ হইলে, তাহারই মধ্য দিয়া হয়তো সমাজ এবং রাষ্ট্রের সম্পর্ক সম্বন্ধে যে মৌলিক প্রশ্নের অবতারণা করা হইয়াছে, সে বিষয়ে আমার বক্তব্য স্পষ্ট করিয়া তুলিতে পারিব।

প্রথমেই বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, হিংসাকে আমি ঘৃণ্য পদার্থ বলিয়া বিবেচনা করি না। মানবসমাজের পটপরিবর্তনের সময়ে ইতিহাসে বারংবার হিংসার বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। যখন কোনও শ্রেণীবিশেষের অত্যাচার নানা কারণে অসহনীয় হয় তখন নিপীড়িত শ্রেণী মুক্তিলাভের আশায় মত্ত হইয়া হিংসার অস্ত্র ধারণ করে। কিন্তু ইতিহাস পর্যালোচনার ফলেই মনে হইতেছে যে, হিংসার দ্বারা সমাজের ধনোৎপাদক চাষীমজুর শ্রেণীর পক্ষে আকাঙ্ক্ষিত মুক্তিলাভ হয়তো সম্ভব হইবে না। হিংসার অস্ত্রে এমন কতকগুলি ত্রুটি আছে, যাহার ফলে সেই মুক্তির আশা এবং সমগ্র মানবজাতির কল্যাণচেষ্টা বারংবার পরাস্ত হইয়া যাইবে। সেইজন্য হিংসার প্রতিক্রিয়া মানবশিশুর মধ্যে 'স্বাভাবিক' হইলেও অহিংসার অস্ত্রের উপরেই আমার আস্থা দিন দিন গাঢ়তর হইতেছে।

ভারী জিনিস মাধ্যাকর্ষণের বশে মাটিতে পড়িয়া যাওয়া 'স্বাভাবিক', কিন্তু তাহার সহিত প্রকৃতির মধ্যে এমন আরও কতকগুলি গুণ বা অবস্থার ধর্ম আছে যেগুলি আয়ত্তের ফলে মানুষ আজ স্বচ্ছন্দে বায়ু অপেক্ষা গুরুভার এরোপ্লেন লইয়া আকাশে হেলায় বিচরণ করিতেছে। পূর্বে কেহ এরোপ্লেন নির্মাণ করে নাই বলিয়া বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকগণ হাল ছাড়িয়া দেন নাই। সমাজজীবনে পরিবর্তন সাধনের ব্যাপারেও তেমনই যাহা কিছু সহজে ঘটে, প্রাচীনকাল হইতে ঘটিয়া আসিতেছে, তাহাকেই আশ্রয় করিয়া থাকিব কেন? যদি মনে হয়, প্রচলিত পরিবর্তন-সম্পাদনের ব্যবস্থার মধ্যে ত্রুটি রহিয়াছে, অথবা ব্যক্তির

ক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্যে আরও উন্নত এবং ফলপ্রদ উপায়ের উদ্ভব হইয়াছে, তবে সমষ্টির বেলাতেই বা অপেক্ষাকৃত অধিক কার্যকরী এবং নির্দোষ উপায় উদ্ভাবনের জন্য কেন চেষ্টা করা হইবে না? যদি বহুবার বিফলতা আমাদিগকে আক্রমণ করে, তবু সর্বোত্তম প্রণালী অনুসন্ধান বা উদ্‌ভাবনের চেষ্টায় যেন আমরা কখনও নিরুৎসাহ না হই। সফল হইলে আমরা এরোপ্লেনের মত বিস্ময়কর বস্তুই হয়তো সৃষ্টি করিতে পারিব, যাহা আপাতদৃষ্টিতে 'স্বাভাবিক' নিয়মের বা অভিজ্ঞতার ব্যতিক্রম বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু যাহা বস্তুত 'স্বভাব' অথবা মানবপ্রকৃতি এবং মানবসমাজের সম্বন্ধে সূক্ষ্মতর এবং সত্যতর জ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত।

গান্ধীজীর সত্যাগ্রহপদ্ধতিকে আমি সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এইরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লবাত্মক আবিষ্কার বলিয়াই বিবেচনা করি। সেই সত্যাগ্রহ অথবা অহিংস বিপ্লবপন্থার স্বরূপ কি, অর্থাৎ তাহার বৈশিষ্ট্য কোথায়, তাহা এইবার নিবেদন করিবার চেষ্টা করিব।

বিভিন্ন বিপ্লবপন্থায় জনসাধারণ তথা পার্টির স্থান এবং স্বরূপ

গণতন্ত্রের আলোচনা-প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছিল। যাহারা সমাজের জীবনকে পরিচালিত করে, তাহারা উৎপাদকশ্রেণীর তুলনায় সংখ্যায় অল্প হইলেও জনসমাজের জীয়নকাঠি মরণকাঠির কেন্দ্রস্বরূপ রাষ্ট্রশক্তিকে আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছে। অবশ্য সেই শক্তি তাহারা স্বীয় শ্রেণীর স্বার্থপুষ্টির জন্য নিয়োজিত করে, কিন্তু রাষ্ট্র যে নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রীয় শক্তির আধার হইয়া আছে ইহা অস্বীকার করিবার কারণ নাই। সেই ক্ষমতাসম্পন্ন শাসকবৃন্দকে যদি দ্রুত পরাস্ত করিতে হয়, তবে তাহাদের শক্তির কেন্দ্র কোথায়, অর্থাৎ সেই শ্রেণীর মধ্যে

শক্তির ভারকেন্দ্র কোন্ উপশ্রেণীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, কাহার মধ্যে বিপ্লবী সম্ভাবনা সমধিক বর্তমান, আক্রমণের সন্ধিক্ষণ কখন উপস্থিত হইবে তাহা বিচার করিবার, এবং উৎপাদকশ্রেণীর শক্তি এবং আক্রমণকে তদনুযায়ী পরিচালিত করিবার জন্য কিছু বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন আছে, অন্যথা চাষীমজুরের দুঃখবোধ এবং বিদ্রোহের সম্ভাবনা বর্তমান থাকিলেও জয়ের আশা সুদূরপরাহত হইয়া পড়ে। মার্ক্সপন্থী যাবতীয় মনীষিবৃন্দ সেইজন্য বলিয়াছেন, চাষীমজুরকে পরিচালিত করিবার জন্য, তাহাদের অন্তরস্থ বিদ্রোহের বহ্নিকে সংহত এবং পুঞ্জীভূত ও সার্থক করিবার জন্য বিপ্লবে দক্ষ এক সুসংবদ্ধ পার্টির একান্ত প্রয়োজন। শুনিয়াছি, মার্ক্সের নিজের নাকি ধারণা ছিল যে ঐতিহাসিক প্রয়োজনে নিপীড়িত জনসাধারণের মধ্য হইতেই উপযোগী নেতৃত্বের আবির্ভাব হইবে। পরবর্তী কালে ঐতিহাসিক এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলে লেনিন অনুভব করেন, বিপ্লব পরিচালনার জন্য সুনিয়ন্ত্রিত পার্টি একান্ত প্রয়োজন। আজ মার্ক্সবাদী সকলেই বোধ হয় নিরপেক্ষভাবে পার্টির প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের মতে পার্টির অভাবে ধূর্ত শক্তিশালী এবং সুসংবদ্ধ ধনতান্ত্রিক শক্তির নাগপাশ হইতে জগতে জনসাধারণের মুক্তি সম্ভব নয়।

গান্ধীজী কিন্তু মনে করেন, যদি সশস্ত্র বিপ্লবের সার্থকতা পার্টির উপরে একান্তভাবে নির্ভর করে, তবে বিপ্লবের অন্তে যখন ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটিবে, যখন বর্তমান শাসকশ্রেণীর অধিকার হইতে দণ্ডশক্তি বিচ্যুত হইবে, তখন সেই শক্তি পার্টির অধিকারে কেন্দ্রীভূত হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। বিপ্লবে যাহারা অস্ত্রচালনায় দক্ষতা অর্জন করিয়াছে বা গুরু দায়িত্বের ভার বহিয়াছে, সেই শ্রেণী বা সংঘ প্রধানত দণ্ডশক্তির অধিকারী হইবে। মার্ক্সপন্থী গান্ধীজীর সঙ্গে সহমত হইয়া বলিবেন, নিশ্চয়ই, ক্ষমতা তো পার্টির হাতে আসিবেই। কিন্তু পার্টি সে ক্ষমতা

জনসাধারণের প্রতিনিধিস্বরূপ অধিকার করিয়া থাকিবে, এবং সেই ক্ষমতার সুনিপুণ প্রয়োগের দ্বারা প্রতিবিপ্লবের সকল চেষ্টাকে ব্যর্থ করিবে। জগৎসমাজে সর্বত্র ধনতন্ত্রের বিষদাঁত ভাঙিয়া গেলে দণ্ডশক্তির উপরে আর নির্ভর করিবার প্রয়োজন হইবে না। উৎপাদকশ্রেণী ধীরে ধীরে শিক্ষিত এবং সংঘবদ্ধ হইয়া উঠিলে, সকল প্রতিবিপ্লবী শক্তির অবসান ঘটিলে, নিরঙ্কুশভাবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সময় আসিবে। তখন পার্টির দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্রের আর প্রয়োজনীয়তা থাকিবে না, রাষ্ট্র ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে নিশ্চিহ্ন হইবে। তখন সমাজের পরিচালনভার দণ্ডশক্তির উপরে আর নির্ভর করিবে না, তৎপরিবর্তে মানুষ নিজের সুবিধামত, স্বেচ্ছাধীন নানা নূতন প্রতিষ্ঠান রচনা করিয়া সমাজ এবং ব্যক্তির কল্যাণের ভিত্তি সুদৃঢ় করিবে।

কিন্তু একটি প্রশ্ন থাকিয়াই যায়, দণ্ডশক্তিপ্রয়োগে সুনিপুণ সেই পার্টি যে নিরবচ্ছিন্নভাবে স্বার্থবুদ্ধি পরিহার করিয়া জনসাধারণের প্রতিনিধিস্বরূপ আচরণ করিবে, ইহার স্থিরতা কোথায়? রুশিয়ার বর্তমান ইতিহাসের আলোচনা করিলে এ সম্বন্ধে বিশেষ ভরসা পাওয়া যায় না। বিপ্লবের পরবর্তী কালে সেখানে যাহা ঘটিয়াছে তাহার সম্পর্কে কেহ বলেন, ট্রটস্কি ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, আবার কাহারও মতে ষ্টালিনই বিপ্লবকে পথচ্যুত করিয়াছেন। সে তর্ক ছাড়িয়া দিলেও আমরা দেখিতে পাই, রুশদেশে পুরাতন শাসনতন্ত্রের উচ্ছেদসাধন করিয়া যে বীর ত্যাগী কর্মিবৃন্দ সমাজতন্ত্র স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে অন্তত অনেকের পক্ষে পথভ্রষ্ট হওয়া অসম্ভব হয় নাই। আর প্রগতিশীল কর্মিবৃন্দেরই সদা জয় হইবে, ইহারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? জার্মানি, স্পেন প্রভৃতি দেশে তাহার ব্যতিক্রমের ইতিহাস অপরিচিত নয়।

এই সকল কারণে গান্ধীজী এমন একটি কর্মপন্থা উদ্ভাবন করিবার চেষ্টা করেন, যাহার মধ্যে শত্রুকে নিপীড়নশক্তির দ্বারা পরাস্ত না করিয়া মানুষ স্বীয় সদ্গুণের বলে জয়লাভ করিতে পারে। অর্থাৎ দণ্ডশক্তি এবং দণ্ডশক্তির প্রয়োগে সুনিপুণ পার্টির পরিচালনার উপরে নির্ভর না করিয়া জনসাধারণ স্বীয় সহনশক্তি, দৃঢ়তা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের উপরেই বেশি নির্ভর করিবে। বিপ্লবের সাফল্য প্রধানত এরূপ শক্তির উপরে নির্ভর করিলে সংগ্রামের অন্তে ক্ষমতাও প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণের আয়ত্তে আসা সম্ভব হয়, এবং উত্তরকালে ক্ষমতার কোনও অপপ্রয়োগ ঘটিলে জনসাধারণের পক্ষে স্বীয় অসহযোগের দ্বারা কেন্দ্রীয় কর্মচারিবৃন্দকে সংযত ও আয়ত্তাধীন রাখা সম্ভব হয়। ইহাকেই গান্ধীজী প্রকৃত স্বাধীনতা বা স্বরাজ আখ্যা দিয়াছেন।

তবে কি বুঝিতে হইবে যে, গান্ধীজী বিপ্লবের সাফল্যের জন্য নেতৃত্বে আদৌ বিশ্বাস করেন না? তাহাই যদি হয়, তবে তিনি কংগ্রেসকে এত শক্তিশালী করিতে চান কেন? কংগ্রেসের নেতৃত্ব বা নির্দেশ ভিন্ন আইন অমান্য নিষেধ করিবারই বা অর্থ কি? সেখানে উত্তর হইল এই যে, পার্টির বা বাহিরের নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা ষোলো আনা স্বীকার করেন না বলিয়া এক আনাও স্বীকার করেন না, ইহা ঠিক। দ্বিতীয়ত তাহার আদর্শ অনুযায়ী নেতৃত্বের ধরণও ভিন্ন হইবে। জনসাধারণের মধ্যে দুঃখের বোধকে জাগ্রত করিবার জন্য, পুরুষকারের দ্বারা সেই দুঃখের নিবৃত্তি ঘটিতে পারে, ইহা শিখাইবার জন্য, ধনতন্ত্রের নাগপাশকে বিকেন্দ্রীকরণের দ্বারা কি ভাবে শিথিল করা যায় তাহা বুঝাইয়া উপযুক্ত সংঘশক্তি এবং লোকায়ত্ত প্রতিষ্ঠান রচনা করিবার জন্য কংগ্রেসের নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। শুধু তাহাই নয়। যখন আইন-অমান্যের আন্দোলন আরম্ভ হইবে, তখন জনসাধারণের পক্ষে পর পর কি কি কর্তব্য

উদয় হইবে, সে সম্বন্ধেও কংগ্রেসকর্মিগণ পূর্বাহ্ণে জনসাধারণকে সঙ্কেত দিয়া রাখিবেন। এবং সকলের চেয়ে বড কথা হইল, শাসকবৃন্দ যখন নিপীডনের ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিবে, তখন সহগুণের অমোঘ বর্ম পরিধান করিয়া তাঁহাদিগকেই জনসমাজের সম্মুখে 'আগে হাঁটার' দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। এই জাতীয় নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করিয়া তাঁহারা শাসনের দ্বারা জনসাধারণকে পরিচালিত করিবেন না, তাহাদিগকে সুকৌশলে যথাসম্ভব গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের মারফৎ আত্মনিয়ন্ত্রণে অভ্যস্ত করিয়া তুলিবেন।

যে পার্টি হিংসার অস্ত্রের উপর নির্ভর করে, তাহাকে জনসমূহের পরিচালন-ব্যাপারেও অল্পবিস্তর হিংসা এবং নিষ্ঠুরতার আশ্রয় লইতে হয়, ইহার দ্বারা জনসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অনেকাংশে সঙ্কুচিত হইয়া যায়। উপরন্তু পার্টির মধ্যে মতানৈক্য ঘটিলে তাহা নিরসনের জন্য হিংসার ব্যবহারও বিচিত্র নয়। ফলে কর্মিগণের মধ্যে স্বাধীন চিন্তাধারা ও বিচারশক্তি এবং কর্মপ্রবৃত্তির স্ফূর্তির পথে যথেষ্ট বাধা জন্মে। কিন্তু গান্ধীজীর বিপ্লবপন্থায় কংগ্রেসের যে নেতৃত্ব তিনি গড়িয়া তুলিতে চান তাহা শাসনশক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়। অর্থাৎ কর্মিগণের মধ্যে মতভেদ ঘটিলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাহার নিরসন করিতে হইবে। বিরুদ্ধ মতের সঙ্গতি সম্ভব না হইলে কংগ্রেসকে সংখ্যাধিক্যের মতানুসারে চালিত করিয়া, অপরকে কংগ্রেসের বাহিরে গিয়া স্বীয় মতানুযায়ী কাজ করিবার স্বাধীনতা দেওয়া হইবে, তাহাকে শাসনের দ্বারা নিশ্চিহ্ন করা হইবে না। জনশক্তির পরিচালনেও উপরোক্ত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিরই প্রয়োগ করা হইবে। এইরূপে গান্ধীজী কংগ্রেসের যে নৈতিক নেতৃত্ব বা 'মর্যাল লীডারশিপ' গড়িয়া তুলিতে চান, তাহার দ্বারা কঠিন পার্টির একচ্ছত্র অধিনায়কত্ব অপেক্ষা ক্ষতির সম্ভাবনা যে অনেক কম, এ বিষয়ে কোনও

সন্দেহ নাই। তদুপরি দণ্ডশক্তির পরিবর্তে সহনশক্তিই যেখানে প্রধান সহায় সেখানে বিজয়লাভ ঘটিলে জনসাধারণের পক্ষে ইহা উপলব্ধি করা সহজ হয় যে, প্রধানত তাহাদেরই দৃঢ়তা এবং সহগুণের ফলে সাফল্যলাভ ঘটিয়াছে, নেতৃস্থানীয় কর্মিবৃন্দের কোন গোপন দক্ষতার ফলে নয়। অর্থাৎ বিপ্লবে এমন কোনও শক্তির প্রয়োজন হয় নাই, যাহা তাহাদের স্বকীয় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির আয়ত্তের বহির্ভূত।

কার্যত উপরোক্ত বিপ্লব সফল হইতে পারে কিনা, অথবা সাধারণ মানুষের পক্ষে অহিংস থাকা সম্ভব কিনা, তাহা আজ আমাদের বিচার্য নহে। গান্ধীজী যে বিপ্লবপন্থার পরিকল্পনা করেন তাহার লক্ষণ নির্দেশ করাই আমার উদ্দেশ্য। মার্ক্সীয় বিপ্লবশাস্ত্রে শুনিয়াছি, এক সময়ে ধারণা ছিল যে, শিল্পে সমুন্নত দেশগুলিতে শিল্পবিস্তারের ফলে সর্বহারা প্রলেট্যারিয়েট-শ্রেণীর সংখ্যাবৃদ্ধির সহিত বিপ্লবের সম্ভাবনাও ঘনায়মান হইবে। কিন্তু উত্তরকালে শাস্ত্রকারগণ নাকি বলিয়াছেন, জগৎজোড়া ধনতন্ত্র-প্রসারের ফলে যখন চীন ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশের মত গোটা দেশকে প্রলেট্যারিয়েটের অবস্থায় অবনমিত করা হয় তাহাদের স্বাভাবিক উন্নতি রোধ করিয়া শিল্পবিদ্যায় পশ্চাৎপদ রাখা হয়, সেরূপ শোষিত কাঁচা-মাল-উৎপাদনকারী দেশেও ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভিযানের আরম্ভ হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। হয়তো ধনতন্ত্রের নাগপাশ সেইখানেই প্রথম ছিন্ন হইতে আরম্ভ করিবে।

গান্ধীজীর বিপ্লবপন্থায় কিন্তু তাঁহার লক্ষ্য হইল, এমন এক কর্ম-কৌশল উদ্ভাবন করা যাহার সার্থকতা সর্বহারা প্রলেট্যারিয়েট-শ্রেণীর সংখ্যাধিক্যের উপরে নির্ভর করিবে না, কিন্তু যাহা দরিদ্র শোষিত জনসাধারণের স্বাধীনতাস্পৃহা এবং সংকল্পের দৃঢ়তার উপরেই প্রধানত নির্ভর করিবে। গান্ধীবাদের বিচারকালে যদি আমরা তাঁহার নিকট ধ্রুবতারার

মত অচঞ্চল এই লক্ষ্যটির সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকি, তবে তিনি কেন হিংসার অস্ত্র পরিহার করেন, গোপনীয়তা সর্বতোভাবে বর্জন করিতে বলেন, উৎপাদন-ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীসাধনের উপদেশ দেন, ইহার সবই তখন একে একে স্পষ্ট হইয়া ওঠে, এবং অহিংস বিপ্লবের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা আমাদের পক্ষে সম্ভব এবং সহজ হয়।

বিকেন্দ্রীকরণের ফলে আত্মশক্তির বিকাশ

গান্ধীজী খাদিকে কেন্দ্রে রাখিয়া গ্রামের যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা গড়িতে চান তাহার বিরুদ্ধে যুক্তি হইল, ধনতন্ত্রের চাপে সেরূপ স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম্যজীবন প্রতিষ্ঠিত করা আজ আর সম্ভব নয়। আর যদি বা কোন প্রকারে সম্ভবও হয়, তাহা হইলে ধনতন্ত্রের উদ্ভবের ফলে সমগ্র জগতে যে শিল্পোন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা হইতে মানুষকে আবার বঞ্চিত করিয়া বর্বর কৃষিপ্রধান যুগে ফিরিয়া যাইতে হয়। তাহা ছাড়া ধনতন্ত্রের লোভনীয় আকর্ষণের নিকট ঐরূপ উৎপাদন-ব্যবস্থার পক্ষে যেমন পরাস্ত হওয়া স্বাভাবিক, উহার সামরিক শক্তির আঘাতের সম্মুখেও তেমনই স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম বা প্রদেশের পক্ষে, এমন কি কোন দেশের পক্ষেই একা আর আত্মরক্ষা করা সম্ভব হইবে না।

প্রথমে, উৎপাদন বিকেন্দ্রীকরণের সপক্ষে যুক্তিবিস্তার করিয়া আমরা পরে একে একে অন্য প্রসঙ্গগুলির বিষয়ে আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

দেশে এমন এক শ্রেণীর কর্মী আছেন, যাঁহারা ভারতবর্ষের গ্রাম-সংগঠনের জন্য বর্তমান অবস্থায় চরকাকে আশ্রয় করিতে আপত্তি করেন না, অথচ বাস্তবিক হয়তো তাঁহারা ভবিষ্যৎ ভারতে কলকারখানার

যথেষ্ট উন্নতি দেখিতে চান। এরূপ কর্মীদের মধ্যে চরকার সপক্ষে একটি যুক্তির প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। ভারতের পল্লী অঞ্চলে অশিক্ষিত দরিদ্র কৃষিজীবীর নিকটে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য লইয়া কাজ করিতে গেলেও দৈনন্দিন জীবনের পক্ষে উপযোগী কোনও অর্থনৈতিক উন্নতির ব্যবস্থা উপলক্ষ করিয়া যাওয়া মন্দ হয় না। সে দিক দিয়া বিবেচনা করিলে চরকা ও খাদি এবং গ্রামোদ্যোগের অন্যান্য যাবতীয় চেষ্টাকে সমর্থন করা যায়। কিন্তু উপরোক্ত মনোভাববিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মিগণ অনেক ক্ষেত্রে গৃহশিল্পের দ্রুত প্রসারের জন্য গ্রামের বাহির হইতে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হন না, কারণ আর্থিক উন্নতিবিধানের দ্বারা বহুসংখ্যক পল্লীবাসীর মধ্যে প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করা তাঁহাদের একটি লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়। পরে তাঁহারা সেই প্রভাব অবলম্বন করিয়া জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক প্রচার এবং সংগ্রামের জন্য সংগঠনের চেষ্টাও করেন।

কিন্তু গান্ধীজী গঠনকর্মের এরূপ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির চেষ্টাকে নিন্দা করিয়া আসিয়াছেন। বিকেন্দ্রীকরণের অর্থ ইহা নহে যে বাহিরের লোকবল, বাহিরের অর্থবলকে আশ্রয় করিয়া যেমন তেমন উপায়ে গ্রামদেশে অন্নবস্ত্রের একটি উৎপাদন-ব্যবস্থাকে খাড়া করা। তাহার চেয়ে বড় কথা হইল, পল্লীবাসীদিগকে আলস্য এবং পরস্পরের সহিত অসহযোগের বিষক্রিয়া হইতে মুক্ত করিয়া স্বীয় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের আয়ত্তে অর্থনৈতিক জীবনকে যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রিত করিবার শিক্ষা দেওয়া। গ্রামের অন্নবস্ত্রের অভাব মিটাইবার চেষ্টায়, গ্রামের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পরিচ্ছন্নতা সম্পাদন করিয়া উন্নত জীবনব্যবস্থা করিবার চেষ্টায় চরিত্রের যে পরিবর্তন সাধিত হইবে, তাহাই গঠনকর্মীর প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।

• যদি কংগ্রেসকর্মিগণের উৎসাহদীপ্ত, বুদ্ধিযুক্ত, অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে

ভারতের দরিদ্রতম পল্লীবাসী এবং অবমানিত সামাজিক শ্রেণীর জীবনে এইরূপ বিপ্লব সাধন করা সম্ভব হয়, তবে বর্তমান ধনতন্ত্রের আক্রমণকে প্রতিরোধ করিবার জন্য আইন-অমান্যের প্রয়োজন হইলে, যদি কেন্দ্রীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ভাঙিয়া যায়, প্রাদেশিক কংগ্রেসের পক্ষেও আন্দোলনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে নির্দেশ দেওয়া সম্ভব না হয়, তাহা হইলে প্রধানত স্বীয় শক্তি এবং পরিচালনক্ষমতার উপরে নির্ভর করিয়া ছোট ছোট গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে অগ্রসর হওয়া কি সম্ভব হইবে না? হয়তো তাহারা স্বীয় বুদ্ধি ও শক্তি অনুসারে ছোটখাট আইন অমান্য হইতে আরম্ভ করিয়া খাজনা-ট্যাক্স বন্ধের আন্দোলন পর্যন্ত কংগ্রেসের পূর্বপ্রদত্ত নির্দেশানুযায়ী চালাইয়া যাইতে সমর্থ হইবে।

অর্থাৎ গান্ধীজী যখন বিকেন্দ্রীকরণের উপদেশ দেন, তাহা শুধু আর্থিক জীবনে উৎপাদনব্যবস্থার মধ্যে আবদ্ধ থাকিবার জন্য নয়, বরং তাহার প্রভাব মানুষের নবলব্ধ সামাজিক শক্তি ও পরিচালনক্ষমতার মধ্যে স্পষ্টত ফুটিয়া উঠুক, ইহাই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা। আর্থিক জীবনে যেমন গান্ধীজী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় আত্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী সত্যাগ্রহের পরিচালনাতেও তিনি তেমনই স্বাবলম্বনের পক্ষপাতী। বিভিন্ন কেন্দ্র মূলত একই নীতি অনুযায়ী অগ্রসর হইবে বটে, কিন্তু প্রত্যেককে স্বীয় শক্তি এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া চলার মাত্রা নিরূপণ করিতে হইবে। সকল নদী সমুদ্রের অভিমুখে ধাবিত হয় সত্য, কিন্তু প্রত্যেককে স্বতন্ত্রভাবে নিজের পথ রচনা করিয়া লইতে হয়। সকলেই আকাশের বারিধারার উপরে শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে, সকল কেন্দ্রকেই মূলনীতির বিষয়ে কংগ্রেসের অধীন থাকিতে হয় সত্য, কিন্তু চলার দায়িত্ব, বিভিন্ন নদীপথের মত, প্রত্যেককে স্বাধীনভাবে স্থির করিয়া লইতে হয়।

বিকেন্দ্রীকরণের দ্বিতীয় যুক্তি ও যুদ্ধ এবং সত্যাগ্রহের মধ্যে ভেদ

বিপ্লবী পাঠক হয়তো বলিবেন, হিংসার যুদ্ধেও তো ক্ষেত্রবিশেষে বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজন হয়। ভারতবর্ষে জনসাধারণের অবস্থা বিবেচনা করিয়া হয়তো অহিংস সংগ্রামেও এরূপ আয়োজন মন্দ নয়। কিন্তু তাহার জন্য এত আড়ম্বর কেন? উৎপাদনব্যবস্থাকে পর্যন্ত বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজন কি? তাহাতে সংগ্রামকে অকারণ বিলম্বিত করা হয়, এবং জনসাধারণের দৃষ্টি এবং উৎসাহ একান্তভাবে সংগ্রামের দ্রুতসিদ্ধির উপরে নিবদ্ধ না থাকিয়া আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণের অপ্রয়োজনীয় চেষ্টার অরণ্যপথে দিশাহারা হইয়া পড়ে, ফলে সংগ্রামেরই ক্ষতি হয়। কয়টা খাদি-কেন্দ্র সত্যাগ্রহের ব্যাপারে অগ্রণী হইয়াছে?

উত্তরে প্রথমেই বলা আবশ্যক যে, গান্ধীজী যে-ধরণের মনোভাব খাদি বা গ্রাম-উদ্যোগ প্রভৃতিকে আশ্রয় করিয়া গড়িতে চান, খাদি-কর্মীর মনে সে-সম্বন্ধে ধারণা অস্পষ্ট থাকায়, অথবা কোন ধারণা না থাকায়, তাঁহারা বাহিরের বাজার অর্থবল লোকবল এবং কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের অতিমাত্রায় নিয়ন্ত্রণের ফলে যথাযথ মনোভাব অধিকাংশ ক্ষেত্রে গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হন নাই। ইহা সত্য বটে। কিন্তু সম্যক্ উদ্দেশ্য লইয়া সম্যক্ চেষ্টার দ্বারা উপযুক্ত মনোভাব এবং তদনুযায়ী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা যায় না, এরূপ সিদ্ধান্তেরও কোন সঙ্গত কারণ নাই।

অতঃপর বিলম্বের প্রশ্ন এবং দ্রুতসিদ্ধিলাভের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। এই প্রসঙ্গে যুদ্ধ এবং সত্যাগ্রহের মধ্যে একটি গুরুতর প্রভেদের বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা নিতান্ত আবশ্যক।

যুদ্ধ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ব্যতিক্রম, এ-বিষয়ে কোন মতভেদ নাই, সে যুদ্ধ জনসাধারণের মুক্তির উদ্দেশ্যেই আরম্ভ হউক, অথবা বিভিন্ন ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতার ফলেই আরম্ভ হউক। ১৯১৪ সালের যুদ্ধ চার বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল, ১৯৩৯ সালের যুদ্ধও ছয় বৎসর যাবৎ চলিল। অথচ উভয় পক্ষের চেষ্টার অন্ত ছিল না, প্রতিপক্ষের উপরে প্রচণ্ডতম আঘাত হানিয়া কত শীঘ্র যুদ্ধের অবসান ঘটানো যায়। সেইজন্য জার্মানির শহরগুলির উপরে বোমা নিক্ষেপের সময়ে জনৈক ইংরেজ ধর্মযাজক, সাধারণ নাগরিকের হত্যাকে অনিবার্য এবং যুদ্ধের আশু সমাপ্তির প্রয়োজনে অপরিহার্য জ্ঞান করিয়া সমর্থনই করিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল, যুদ্ধ এই উপায়ে শীঘ্র শেষ হইলে, চক্রশক্তিবৃন্দ পরাস্ত হইলে, জগতে লোকক্ষয় মোটের উপরে কম হইবে। সেই কারণেই চার্চিল সাহেব যখন জার্মান জাতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, 'We shall bleed and burn them to death', তখন শান্তিকামী, শিক্ষিত জনসাধারণ যুদ্ধের হত্যাকাণ্ডকে মানবের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য অনিবার্য ভাবিয়া চার্চিলের কথায় অন্তরে অন্তরে সায় দিয়াছিল।

মার্ক্সবাদীদের কর্মধারা অনুধাবন করিলেও ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। তাঁহারা মানবসমাজের কল্যাণকামী। জগতে শোষণের অবসান ঘটিয়া সর্বত্র শান্তি বিরাজ করুক ইহাই তাঁহাদের কাম্য। কিন্তু সেই শান্তি দ্রুত আনয়নের চেষ্টায় তাঁহারা যুদ্ধে নিরঙ্কুশ নিষ্ঠুরতা সমর্থন করিয়া থাকেন। যেদিন বার্লিন রুশ-সৈন্যের আক্রমণে ধূলিসাৎ হয়, সেই দিবসকে তো তাহারা মানবজাতির মুক্তির এক সন্ধিক্ষণ বলিয়াই অভিনন্দিত করিয়াছেন।

মানবজাতির যুগযুগান্তব্যাপী শোষণের অবসানচেষ্টার অর্থ বোঝা

যায়। তাহার জন্য অসহিষ্ণুতা একান্ত স্বাভাবিক। কিন্তু সর্বত্র যুদ্ধের দ্রুত পরিসমাপ্তি ঘটাইবার জন্য যে ব্যস্ততা দেখা যায়, তাহার পিছনে আরও একটি ভাব ফুটিয়া উঠে।

মানুষ যখন কোনও প্রয়োজনের বশে পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তখন সেই সংহারলীলায় উভয়পক্ষের উৎপাদনব্যবস্থা এবং ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের স্বাভাবিক জীবন সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হইয়া যায়। অথচ সামাজিক বিবাদ নিষ্পত্তির যদি অপর কোন উপায় জানা না থাকে, বাধ্য হইয়া উভয় পক্ষকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হয়, তখন প্রত্যেকে চেষ্টা করে, কত দ্রুত এই অস্বাভাবিক অবস্থা হইতে মুক্তি পাওয়া যায়, অথচ শত্রুর পরাভবের ফলে, নিজের সুবিধামত এক নিষ্পত্তিতে পৌঁছানো যায়। সেই আশাতেই মানুষ যুদ্ধে উত্তরোত্তর নিষ্ঠুর হইতেছে এবং বিজ্ঞানের সকল সম্পদ সংহারলীলাকে প্রচণ্ডতম করিবার জন্য নিয়োজিত করিতেছে শুধু এই আশায় যে, মারণাস্ত্র যত ব্যাপক ফলপ্রদ এবং অমোঘ হইবে যুদ্ধের ব্যাপ্তিকালকেও তত সংক্ষিপ্ত করা সম্ভব হইবে।

কিন্তু গান্ধীজীর মতে উপরোক্ত পন্থায় জগতের সাধারণ মানুষ কোনদিনই মুক্তির আস্বাদ লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। পূর্বেই বলা হইয়াছে, মারণাস্ত্রের অধিকার এবং দক্ষ প্রয়োগের উপরেই যদি সামাজিক শক্তি নির্ভর করে, তবে সাধারণ নরনারীর পক্ষে সে পথে মুক্তিলাভ করা কি কোনদিন সম্ভব? দ্রুত বিজয়লাভের জন্য মানবসমাজে যে সকল অস্ত্র নির্মিত হইয়াছে, তাহার ফলে ক্ষমতা উত্তরোত্তর সাধারণ মানুষের অধিকার হইতে দূরে সরিয়া যায়, সে খেলায় কোটি কোটি মানুষ দাবার বোড়ে অপেক্ষা উন্নত স্থান কখনও লাভ করিতে পারে না। অতএব দ্রুতসিদ্ধির লোভ মানুষকে পরিহার করিতে হইবে। সংগ্রামের ধরণও

এমন হওয়া আবশ্যক যাহা স্বাভাবিক জীবনের ব্যতিক্রম না হয়, কোটি কোটি জনসাধারণের জীবন যে উৎপাদনব্যবস্থার উপরে নির্ভর করে, তাহাকে যেন বিপর্যস্ত করিতে না পারে।

সেইজন্য গান্ধীজী যখন সত্যাগ্রহ-সংগ্রামের কল্পনা করেন, তাহার পূর্বে উৎপাদনপ্রণালীর বিকেন্দ্রীসাধনের দ্বারা তিনি এমনই লোকায়ত্ত এক জীবনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিতে চান, যাহার সহিত সত্যাগ্রহযুদ্ধের কোনও অসামঞ্জস্য নাই। সেই লোকায়ত্ত উৎপাদনব্যবস্থাকে সর্বাবস্থায় সক্রিয় রাখার চেষ্টা এবং ধনতন্ত্রের নাগপাশ হইতে সংগ্রামের দ্বারা মুক্ত হইবার চেষ্টা ভিন্ন ব্যাপার নয়, উভয়েই এক। অর্থাৎ সত্যাগ্রহের মধ্যে আইন-অমান্য, এবং গঠনকর্মের দ্বারা জীবনে নববিধান প্রতিষ্ঠার চেষ্টা, দুইটিই একমুখী হওয়ার ফলে অহিংস বিপ্লব কোন অবস্থাতেই স্বাভাবিক জীবনের ব্যতিক্রম হয় না। অতএব তাহার দ্রুতনিষ্পত্তিরও কোন প্রয়োজন থাকে না।

গঠনকর্ম এবং আইন-অমান্য বা শান্ত প্রতিরোধকে মুদ্রার এপিঠ ওপিঠের মত অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে সম্পর্কিত মনে করা যায়, দুইয়ের মধ্যে কোনও ব্যবধান পর্যন্ত নাই। দেশের কোটি কোটি জনসাধারণ যদি নবজীবন লাভের জন্য গঠনকর্ম আশ্রয় করে, তাহাকেই গান্ধীজী বর্তমান শোষণমূলক কলুষিত জীবনপদ্ধতির সঙ্গে শ্রেষ্ঠতম অসহযোগ বলিয়া বিবেচনা করিবেন। আর কোটি কোটি জনসাধারণের মধ্যে যদি গঠনকর্মের সম্পর্কে উৎসাহ উৎপন্ন করা না যায়, তাহারা যদি আলস্যে ডুবিয়া থাকে, তবে ক্ষণিকের উৎসাহে শুধু আইন-অমান্যের অস্ত্রাঘাতের দ্বারা ধনতন্ত্রের উচ্ছেদসাধনের চেষ্টাকে গান্ধীজী স্বরাজ লাভের উপায় বলিয়া কদাপি স্বীকার করিবেন না। গান্ধীজী আরও বলিয়াছেন যে, পক্ষাঘাতগ্রস্ত হাত দিয়া যেমন অন্নের গ্রাস মুখে তোলা সম্ভব হয় না,

গঠনকর্ম ব্যতিরেকে আইন-অমান্যের দ্বারাও তেমনই স্বাধীনতা অর্জনের চেষ্টাকে অহিংস উপায়ে অসাধ্য বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।

সত্যাগ্রহ সংগ্রাম অহিংস জীবনপদ্ধতির ব্যতিক্রম না হওয়ার ফলে সত্যাগ্রহীর পক্ষে ব্যস্ততার কোনও কারণ থাকে না, গঠনকর্মের পরিবর্তে আইন-অমান্যকে স্বরাজ লাভের জন্য মুখ্য সাধন বলিয়া বিবেচনা করারও কোনও অর্থ হয় না। যথার্থ বিপ্লব গঠনকর্মের পথেই আসিবে, তাহার বাধা নিরাকরণের জন্য কেবল যতটুকু সংগ্রাম বা আইন-অমান্যের প্রয়োজন। আর যদি এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করা যায়, তবে সত্যাগ্রহীর পক্ষে সমগ্র জীবনব্যাপী চেষ্টাই তো বিপ্লবে রূপান্তরিত হয়, তাহার মধ্যে ব্যস্ততা ও অসহিষ্ণুতার কোন স্থানই থাকে না।

যুদ্ধ এবং সত্যাগ্রহের ভেদ : অহিংস সংগ্রাম বিলম্বিত হইবার অপর কারণ

পাঠক হয়তো বলিবেন, অহিংসার পথে দীর্ঘব্যাপী সাধনা যখন অবশ্যম্ভাবী, তখন অন্য উপায়ের সন্ধানও তো করা যাইতে পারে। সাধারণ মানুষের বিপ্লবেচ্ছা কখনও বহুদিন ধরিয়া তীব্র আকার ধারণ করিয়া থাকে না। অতএব হিংসার অস্ত্র প্রয়োগ করিলে যদি দ্রুত কার্যসিদ্ধি হয়, তবে হিংসার অসুবিধাগুলি সাময়িকভাবে স্বীকার করিয়া লইতে দোষ কি? হিংসার আনুষঙ্গিক দোষগুলি যথাসম্ভব পরিহারের চেষ্টা তো করা যাইতে পারে।

কিন্তু হিংসার বিরুদ্ধে গান্ধীজীর যেমন এক আপত্তি, ইহা ধ্বংসমূলক ও অস্বাভাবিক এবং দ্বিতীয় আপত্তি, ইহার ফলে ক্ষমতা জনসমূহের আয়ত্তে যায় না, তেমনই তৃতীয় একটি গুরুতর আপত্তির কথাও তিনি উত্থাপন করিয়াছেন, যাহা হইতে হিংসার অস্ত্রকে মুক্ত করিবার কোন

উপায় আছে বলিয়া আদৌ মনে হয় না। সেইজন্য হিংসার অস্ত্রকে তিনি সর্বতোভাবে পরিহার্য বলিয়া বিবেচনা করেন।

হিংসার অস্ত্রপ্রয়োগ করিয়া যখন আমরা শোষণমূলক উৎপাদন-ব্যবস্থার উচ্ছেদসাধন করিতে চাই, দণ্ডের দ্বারা প্রতিবিপ্লবকে নির্মূল করিয়া নূতন উৎপাদনব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা করি, তখন বিরুদ্ধ শক্তি আমাদের আঘাতের ফলে উত্তরোত্তর প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া উঠে। বর্তমান শোষকশ্রেণীকে কোনদিনই সবংশে হত্যা করিয়া নির্মূল করা সম্ভব নয়। অতএব ভয়ের বশে তাহাদের প্রতিবিপ্লবী বুদ্ধিকে সঙ্কুচিত রাখাই আমাদের লক্ষ্য হয়, তাহারা যেন পুনরায় সংঘবদ্ধ হইতে না পারে, সেজন্য সতর্কভাবে বহুবিধ আয়োজন বজায় রাখিতে হয়।

কিন্তু বর্তমান শোষণব্যবস্থার জন্য শুধু শাসক-সম্প্রদায়কে দায়ী করা কি ঠিক কাজ? তাহাদের সহিত শোষিত শ্রেণীও, স্বেচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, সহযোগিতা করে বলিয়াই যে বর্তমান শোষণপদ্ধতি কায়েম হইয়া রহিয়াছে এ বিষয়ে কি কোনও সন্দেহের কারণ আছে? সে সহযোগিতা দারিদ্র্যের বশে, ভয়ে বা লোভের বশে দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু তবু ধনতন্ত্রের স্থিতি যে ইহারই উপর নির্ভর করিতেছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। বর্তমান শোষণযন্ত্রের অধিকারিগণ যে পরিবেশের মধ্যে মানুষ হইয়াছে তাহারই প্রভাবে তাহাদের স্বার্থবোধ ক্ষমতালিপ্সা এবং নিষ্ঠুরতা নিরঙ্কুশভাবে বৃদ্ধির সুযোগলাভ করিয়া অস্বাভাবিক আকার ধারণ করিয়াছে, সে পরিবেশ তো আমাদের তামসিকতার দ্বারাই রচিত হইয়াছে। অতএব আমরা যদি অন্তরের তামসিকতা হইতে মুক্ত হই, স্বীয় পরিশ্রম এবং লোভহীন, অনলস চেষ্টার দ্বারা নূতন উৎপাদনপ্রণালী ও নূতন সমাজব্যবস্থা গড়িতে পারি, পুরাতন শোষণব্যবস্থার সঙ্গে নির্ভয়ে সহযোগ ছিন্ন করি, তবে সেই নূতন

মানসিক পরিবেশের প্রভাবে আজিকার শোষক-সম্প্রদায়ের অন্তরেও দ্রুত পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হইবে।

মার্ক্সীয় বিপ্লবপন্থায় শাসক-সম্প্রদায়ের প্রথম পরিবর্তন ভয়ের বশে করার বিধি আছে। পরে যদি শোষক-সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু লোক নূতন সমাজে মানাইয়া চলিতে চায়, তাহাকে পূর্ণ সুযোগ দিবার কথাও আছে। কিন্তু অহিংস-পন্থার বিশেষত্ব হইল ইহা শাসক এবং শোষককে ভয়ে পঙ্গু করিতে চায় না, অহিংস অসহযোগের দ্বারা তাহার হৃদয়ে মনুষ্যত্বের ভাবকে জাগ্রত করিতে চায় এবং নূতন উৎপাদনব্যবস্থা ও সমাজ-সৃজনের ব্যাপারে তাহার পূর্ণ ও সানন্দ সহযোগিতালাভের আশা পোষণ করে। এমন কি পুরাতন উৎপাদনব্যবস্থা ভাঙিবার ব্যাপারে পর্যন্ত তাহাদের সক্রিয় সহযোগিতা লাভের চেষ্টা করে।

তথাকথিত শত্রুর অন্তরে উপযুক্ত পরিবর্তন সাধনের উদ্দেশ্যে সত্যাগ্রহ-সংগ্রামকে বিলম্বিত করিতেও গান্ধীজীর কোন কুণ্ঠা নাই। তিনি বলিয়াছেন, 'আপাতত সত্যাগ্রহের পথ দীর্ঘ বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক ইহা অপেক্ষা দ্রুত পথ আর নাই। কারণ এ পথে সাফল্যলাভের বিষয়ে কোনও সংশয় নাই, অপর সকল পথে কবে যে সাফল্যলাভ ঘটিবে তাহা কেহ বলিতে পারে না।'

মৌলিক প্রশ্নের সম্বন্ধে আলোচনা

সহানুভূতিসম্পন্ন পাঠক হয়তো বলিতে পারেন, আচ্ছা, তর্কের খাতিরে না হয় স্বীকার করিলাম, অহিংস-সংগ্রামের প্রয়োজনে বিকেন্দ্রীকরণ অত্যাবশ্যক। ভারতবর্ষে আজ হিংসাত্মক সংগ্রামের জন্য সংগঠন সম্ভব নয় বলিয়াই হউক, অথবা অহিংস উপায়ের দ্বারা উৎকৃষ্টতর ফললাভের আশা আছে বলিয়াই আমরা আজ কংগ্রেসের পক্ষ হইতে

সাময়িকভাবে অহিংস-পন্থাকেই স্বরাজলাভের উপায়স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু যখন ভারত স্বাধীন হইবে, তখন যুদ্ধের চাপে বিকেন্দ্রীকরণের যে ভারা বাঁধা হইয়াছে, বাড়ি তৈয়ারি শেষ হইলেও কি সেই ভারা বাঁধিয়া রাখিতে হইবে? বস্তুত শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সিংহ মূলত এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। এবার সেই প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা করিব।

শুধু গান্ধীজীর মত নৈরাজ্যবাদী কেন, মার্ক্সবাদী সমাজ-বৈজ্ঞানিক মাত্রে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, রাষ্ট্রের মূল দণ্ডশক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু দণ্ডের দ্বারা মানুষকে চিরকাল পরিচালিত করা কাহারও কাম্য হইতে পারে না। মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশ স্বাধীনতার সূর্যালোকেই সম্ভব, শাসনের অন্ধকার মেঘচ্ছায়ায় কখনও সম্ভব নয়। সেইজন্য মানবসমাজের পূর্ণ কল্যাণ যাঁহাদের কাম্য তাঁহারা এমন এক অবস্থা আনয়নের চেষ্টা করেন, যেখানে দণ্ডমূলক ব্যবস্থা বা প্রতিষ্ঠানের যথাসম্ভব সঙ্কোচসাধন করিয়া স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবে গড়িয়া উঠা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে সামাজিক জীবন পরিচালিত হয়।

সেইরূপ অবস্থায় পৌঁছিবার পূর্বে মার্ক্সীয় বিপ্লবচেষ্টায় একটি বিশেষ লক্ষ্য সাময়িকভাবে দেখা দেয়। বর্তমান কালে সমাজজীবনে এমন কতকগুলি ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে যাহার ফলে স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি যে সকল ভাবের অঙ্কুর প্রত্যেক মানবশিশুর মধ্যে অল্পাধিক মাত্রায় বর্তমান, সেগুলি শ্রেণীবিশেষের মধ্যে অস্বাভাবিক বৃদ্ধির সুযোগ পাইয়া এমন আকার ধারণ করে যে, সমগ্র মানবজাতির জীবনপথ তাহার দ্বারা কণ্টকিত ও বিপন্ন হয়। অতএব মার্ক্সীয় মতে প্রথম প্রয়োজন হইল, সমাজের দণ্ড বা রাষ্ট্রশক্তি করতলগত করিয়া শোষণমূলক সকল প্রতিষ্ঠানের উচ্ছেদসাধন করা এবং প্রতিবিপ্লবের

সকল সম্ভাবনাকে নির্মূল করা। তখনই শুধু শোষণবিহীন সমাজরচনার পথ নিরঙ্কুশ হইতে পারে। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আক্রমণ ও ভিতরে প্রতিবিপ্লবের সম্ভাবনা নিরোধের জন্য রাষ্ট্রের হাতে প্রজার জীবনের উপরে সর্বময় কর্তৃত্বের ভার তুলিয়া দেওয়া উচিত। তখন কি সমাজে, কি উৎপাদন-বৃত্তিতে, এমন কি হয়তো চিন্তার উপরেও নানাবিধ বাঁধন দিতে হয়। কিন্তু যখন বাহিরে ও ভিতরে দুর্যোগ কাটিয়া যায়, সকল দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে সর্বত্র সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় এবং সাম্রাজ্যবাদের সম্পূর্ণ অবসান ঘটে, তখন আর দণ্ডমূলক রাষ্ট্রের প্রয়োজন থাকে না। ক্রমে ক্রমে তাহার কার্যভার দণ্ডের পরিবর্তে সম্মতিমূলক প্রতিষ্ঠানের উপরে অর্পিত হয়, রাষ্ট্রের পরিপূর্ণ ক্ষয় সম্পন্ন হয়। কিন্তু যতদিন বিপদের সম্ভাবনা থাকে, ততদিন রাষ্ট্রের প্রয়োজন এবং সে রাষ্ট্র উৎপাদকশ্রেণীর স্বার্থপুষ্টির জন্য প্রজার জীবনের উপরে সর্বময় কর্তৃত্বের ভার লইতেও পশ্চাৎপদ হয় না।

গান্ধীজী কিন্তু রাষ্ট্রকে কোন সময়েই এরূপ সর্বময় কর্তৃত্ব দিবার পক্ষপাতী নহেন। জনসমূহের সত্যাগ্রহের ফলে ভারতবর্ষ যদি স্বাধীন হয়, তখন ভিতরের ও বাহিরের বাধা অতিক্রম করিবার দায়িত্ব তিনি কেবল রাষ্ট্রের উপরেই অর্পণ করিতে চান না। বরং জাগ্রত জনসাধারণ স্বীয় গণতান্ত্রিক নানাবিধ প্রতিষ্ঠানকে সত্যাগ্রহশক্তির দ্বারা রক্ষা করুক, ইহাই তিনি বেশি করিয়া চাহিবেন।

পাঠক বলিবেন, স্বাধীন ভারতেও তবে কি রাষ্ট্রশক্তি যথাসম্ভব কম প্রয়োগ করা হইবে? অর্থাৎ যতদিন নূতন সমাজরচনার পথে বাধাবিঘ্নের সম্ভাবনা আছে, ততদিন অসহযোগের আয়োজন এবং বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থাকেও চিরস্থায়ী করিয়া রাখিতে হইবে? তবে তো রোগের সমূল বিনাশের ফলে স্বাস্থ্যলাভের কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। মানুষকে

চিরদিনই কলকারখানা এবং শিল্পে বৈজ্ঞানিক উন্নতি পরিহার করিয়া স্বাধীনভাবে ছোট ছোট স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামে বাস করিতে হইবে। এ উপায়ে, সুখের পরিবর্তে স্বাধীনতালাভ ঘটিতে পারে বটে, কিন্তু মার্ক্সীয় কর্মপন্থায় একত্র সুখ এবং স্বাধীনতার যে সমাবেশের সম্ভাবনা আছে, গান্ধীজীর পন্থায় তাহা তো কখনও সম্ভব নয়।

উত্তরে বলিব, গান্ধীজীর পথেও তাহা অনেকদূর পর্যন্ত সম্ভব। কিন্তু কতদূর সম্ভব তাহা বিবেচনা করিবার প্রয়োজন আছে। গান্ধীজী মনে করেন, জনসাধারণ বিকেন্দ্রীকরণের দ্বারা যে লোকায়ত্ত উৎপাদনব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবে তাহার এক উদ্দেশ্য হইবে, কোন অবস্থাতেই যেন তাহাদিগকে অন্নবস্ত্রের অভাবে ক্লেশ পাইতে না হয়। কোন লোভের বশেই যেন তাহারা জীবনের মরণকাঠি জীয়নকাঠি পরহস্তে তুলিয়া না দেয়। কিন্তু এরূপ উৎপাদনব্যবস্থার ফলে শক্তির অপচয় ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। শ্রমলাঘবের উদ্দেশ্যে এবং সমাজের উৎপাদনশক্তি বৃদ্ধি করার জন্য ছোট ছোট কেন্দ্রগুলি প্রয়োজনানুসারে সমবেত হইয়া বড় কলকারখানাও চালাইতে পারে। সে কারখানাগুলি ব্যক্তিগত সম্পত্তি না হইয়া বিভিন্ন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা পরিচালিত হইবে। যদি স্বাধীন কেন্দ্রগুলির অধীন সমবায়মূলক বৃহত্তর প্রতিষ্ঠান দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠানেও পরিণত হয়, তাহাতে গান্ধীজীর আপত্তি নাই। প্রতিষ্ঠানের অবয়ব ক্ষুদ্র হউক বা বৃহৎ হউক, তাহাতে তিনি বিশেষ বিচলিত হন না, তাহার মূল দণ্ড অথবা স্বাধীন সম্মতির উপরে নির্ভর করে কিনা ইহার উপরেই তিনি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। কেহ যদি বলেন, 'বেশ তো, দেশসুদ্ধ লোক যদি রাষ্ট্রেরই হাতে স্বেচ্ছায় সে ভার তুলিয়া দেয় তবে দোষ কি?' গান্ধীজী বলিবেন, 'দোষ কিছু নাই।' কিন্তু তখন আসলে রাষ্ট্র আর দণ্ডশক্তির আধার না হইয়া স্বেচ্ছায় গড়া

প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হইবে, তখন কি আর তাহাকে রাষ্ট্র নাম দেওয়া যায় ?

অর্থাৎ স্বেচ্ছায় কেন্দ্রীকরণে গান্ধীজীর আপত্তি নাই, বাধ্যতামূলক দণ্ডাধীন কেন্দ্রীকরণে তাঁহার আপত্তি। যদি আমরা এইটুকু মনে রাখি তবে বুঝিতে পারিব, ভবিষ্যৎ সমাজে উৎপাদনব্যবস্থাতেই হউক অথবা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনব্যবস্থাতেই হউক, কেন্দ্রীকরণ এবং বিকেন্দ্রীকরণের মাত্রা দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে কম-বেশি হইতে পারে। কেবল, মার্ক্সীয় কর্মধারায় দণ্ডশক্তিমূলক রাষ্ট্রের যে সর্বময় কর্তৃত্ব সাময়িক প্রয়োজনে অত্যাবশ্যক বিবেচিত হয়, গান্ধীজী কোন অবস্থাতেই সে-জাতীয় দণ্ডশক্তির কেন্দ্রীকরণে সম্মতি দিবেন না। বিপ্লবের পরে নহে, বিপ্লবের সম্পাদনকাল হইতেই তিনি লোকায়ত্ত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের উপরে মানুষের জীবন-পরিচালনার সমধিক ভার অর্পণ করিয়া রাষ্ট্রের বা দণ্ডশক্তির ক্ষয়সাধনের ব্যবস্থা করেন। এইখানেই মার্ক্স এবং গান্ধীর কর্মপন্থার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ব্যবধান দেখা যায়।

অতএব দেখা যাইতেছে, গান্ধীজীর বিকেন্দ্রীকরণ শুধু বিপথগামী রাষ্ট্রের শাসন হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে নয়, মানুষের পূর্ণতর বিকাশের জন্যও প্রয়োজন হইতে পারে। গান্ধীর সহিত নৈরাজ্যবাদী ক্রোপট্‌কিন বা থোরো ও টলষ্টয়ের এইখানেই মিল সর্বাপেক্ষা বেশি। তবে টলষ্টয় যেমন রাষ্ট্রকে আদৌ সহ্য করিতে পারিতেন না, গান্ধী ঠিক সেরূপ মত পোষণ করেন না। তিনি নিজেকে practical idealist বা আদর্শবাদী হইলেও বাস্তবধর্মী বলিয়া বিবেচনা করেন। সেইজন্য তাঁহার প্রস্তাবিত সমাজে রাষ্ট্র বর্তমান থাকিলেও ভারকেন্দ্র নিচের দিকে প্রতিষ্ঠিত। থোরোর সহিত সহমত হইয়া সেইজন্য তিনি বলেন, 'সেই রাষ্ট্রই ভাল, যাহার শাসনের দায়িত্ব কম।' আমরা দেখিয়াছি,

কেন্দ্রীকরণ আবশ্যক হইলে তিনি তাহা স্বাধীনভাবে প্রদত্ত সম্মতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত করিতে চান। এবং সেই স্বাধীনতার ভাব অনির্বাণ রাখিবার জন্য অন্নবস্ত্র এবং জীবনের পরিচালনার অনেকখানি ভার তিনি বিকেন্দ্রীকৃত অসংখ্য গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের উপরে ন্যস্ত রাখিতে চান। অহিংস বিপ্লব যে নেতিমূলক নহে, তাহা মুখ্যত গঠনপদ্ধতির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির উপরেই নির্ভর করে, এই মৌলিক তত্ত্বটি আবিষ্কার করিয়া গান্ধীজী অহিংসাকে ভাবরাজ্য হইতে নামাইয়া মাটির রাজ্যে, মানবসমাজের দৈনন্দিন জীবনে, ইহলোকের প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য, তাহার আসন রচনা করিয়াছেন। ইহাই বর্তমান জগতে গান্ধীজীর শ্রেষ্ঠতম দান।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, মনুষ্যত্ববিকাশের বহুবিধ সুযোগ ও সুবিধা দিবার জন্য না হয় গান্ধীজীর অহিংস সমাজ গড়িয়া তোলা হইল। কিন্তু ধনতন্ত্র বা হিংসায় পুষ্ট এবং নিপীড়নের প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন গোষ্ঠির আক্রমণের সম্মুখে কি এরূপ অহিংস খণ্ডীকৃত সমাজব্যবস্থা আত্মরক্ষা করিতে পারিবে? আত্মরক্ষার জন্য তো দণ্ডাধীন কেন্দ্রীকরণের প্রয়োজন আছে। গান্ধীজী ইহার উত্তরে পুনরায় বলিবেন, অহিংস সমাজব্যবস্থাকে সর্ববিধ আক্রমণের বিরুদ্ধে অহিংসার দ্বারাই আত্মরক্ষা করিতে হইবে। মরণের বীর্যের দ্বারা আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না, এই আশঙ্কাতেই মানুষ নিজের মত আরও কয়েকজনের সহিত সম্মিলিত হইয়া শত্রুর নিপাতসাধনের দ্বারা আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। এই তামসিক বুদ্ধিকে আশ্রয় করে বলিয়াই মানবসমাজ আজ পর্যন্ত মুক্তির আশ্বাস পায় নাই। সেই তামসিকতার প্রভাবে, আত্মরক্ষার প্রয়োজনে, দল বাঁধিয়া মানুষ স্বীয় ঐক্যকে বারংবার পরাস্ত করিয়াছে। ধনী-নির্ধন, এক দেশ অন্য দেশ, স্ত্রী-পুরুষ, শত্রু-মিত্র প্রভৃতির মধ্যে অধিকারের তারতম্য স্থাপন করিয়া

মানুষ স্বীয় বুদ্ধির দোষে, অর্থাৎ নিজের কর্মফলের দ্বারা, নিজের দেহকে খণ্ড বিখণ্ডিত করিয়াছে। স্বার্থরক্ষার জন্য সংগ্রামের মধ্যে তাহারই মত একজন মানুষকে শত্রু ভাবিয়া সংহারের চেষ্টা করিয়াছে।

এই অস্বাভাবিক অবস্থা হইতে মানুষ নিজেই যে আশু মুক্তি চায় তাহার প্রমাণ, যুদ্ধকে সে যথাসম্ভব সংকীর্ণ করিতে চায়। যুদ্ধের সময়ে যে বিদ্বেষবিষ উদ্‌গোপিত হয় তাহার ফলে মানুষের অন্তর ক্লিষ্ট হয় বলিয়াই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিলে, জয়ই হউক অথবা পরাজয়ই হউক, মানুষ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিবার চেষ্টা করে।

কিন্তু অন্তরের ভয় যদি বিদূরিত হয়, আত্মবল প্রতিষ্ঠার দ্বারা নিঃশঙ্কভাব লাভ করা যায়, তখন মানুষ সর্বমানবের একত্ব উপলব্ধি করিতে পারে। তখন আর কাহারও বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার প্রয়োজন থাকে না, কেননা বিরুদ্ধ তখন আর কেহ নাই। যে ব্যক্তি তামসিক বুদ্ধিবশত সেই একত্বকে খণ্ডিত করে, সত্যাগ্রহী তাহার হৃদয়ের পরিবর্তনের জন্য শান্ত প্রতিরোধ করেন, নিপীড়নের বা শাসনের, অর্থাৎ ভেদের অস্ত্র কখনও ধারণ করেন না। ইহাই সত্যাগ্রহীর পক্ষে আত্মরক্ষার সর্বোত্তম উপায়, সে অবস্থায় মানবসমগ্রের সহিত তিনি একাত্ম হইয়া থাকেন। এই সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে, সেরূপ সত্যাগ্রহীর প্রভাবে একত্বের বুদ্ধি ক্রমশ মানবসমাজে বিকীর্ণ হইলে, মানুষ যথার্থ মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবে। একত্বের সত্যকে উপলব্ধি ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য গান্ধীজী অহিংসাকে তপস্যা বা সাধনা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

শেষ কথা

শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সিংহ স্বীয় প্রবন্ধে যে সকল প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছেন, অহিংস মতবাদের পক্ষ হইতে যথাসাধ্য তাহার মীমাংসার

চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু দুইটি ক্ষুদ্র প্রশ্ন তিনি প্রসঙ্গক্রমে উত্থাপন করিয়াছেন, সর্বশেষে তাহার সম্পর্কে কিছু বিচার অবশিষ্ট আছে।

আজ ভারতের জাতীয় সংগ্রামের প্রয়োজনে ধনীদিগকে মনে করিতে হইবে যে, তাহার নিকট যে ধন আছে তাহা বস্তুত জাতির সম্পত্তি এবং সেই বস্তু উপনিধি স্বরূপ সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য শুধু তাহার কাছে ন্যস্ত আছে। গান্ধীজী বারংবার ধনীকে এই আদর্শ স্বীকার করিবার জন্য মিনতি জানাইতেছেন। তিনি একথাও বলিয়াছেন যে, শ্রমিককুল অহিংস-অসহযোগের দ্বারা ধনীকে উপনিধিত্বের আদর্শে পরিণত করিবার চেষ্টা করিবে, এবং সেই বিদ্যা বা সত্যাগ্রহের কৌশল নিপীড়িত জনসাধারণকে শেখানোই তাঁহার জীবনের ব্রত। ধনীকে ভয়ে পঙ্গু করিয়া নয়, শান্ত প্রতিরোধের দ্বারা তাহার শুভবুদ্ধিকে জাগ্রত করিয়া কল্যাণের পথে হৃদয়ের পরিবর্তন সাধন করাই নিপীড়িতের লক্ষ্য হইবে।

গান্ধীজীকে এক সময়ে প্রশ্ন করা হইয়াছিল, যদি চেষ্টা সত্ত্বেও ধনী উপনিধিত্বের আদর্শ স্বীকার না করে, তখন কি তাহাকে উত্তরাধিকারসূত্রে লব্ধ সম্পদ নিজের খেয়াল-মত অপব্যয় করিবার স্বাধীনতা দেওয়া হইবে, অথবা রাষ্ট্রীয় আইনের সহায়তায় সেই সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে? গান্ধীজী উত্তরে বলেন, কল্পিত অবস্থায় রাষ্ট্রের পক্ষে প্রয়োজনের অতিরিক্ত দণ্ডশক্তি প্রয়োগ না করিয়া সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করায় দোষ নাই। কিন্তু যদি লোকটি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, অথবা শোষিতের অহিংস অসহযোগের প্রভাবে উক্ত আদর্শ গ্রহণ করে, তবে তিনি বেশি খুশি হন।

এখন প্রশ্ন হইল, ধনী বা মালিক জনসমূহের কল্যাণার্থে উপনিধিবাদ স্বীকার না করিলে রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োগের দ্বারা তাহার সম্পত্তি কাড়িয়া লইবার ব্যবস্থাই যদি থাকে, তবে গান্ধীজীর উপনিধিবাদের আদর্শকে

শুধু ভারতের জাতীয় আন্দোলনে সকল শ্রেণীকে সংগ্রহ করিবার কৌশলমাত্র মনে করা কি ভুল হইবে? ধনীকে আশ্বাস দিয়া তিনি কি শুধু সাময়িক প্রয়োজনসিদ্ধি করিতেছেন না?

গান্ধীজী কিন্তু আদৌ তাহা স্বীকার করেন না। তিনি আর্থিক-সমতাসম্পন্ন নূতন যে সমাজ রচনা করিতে চান, সেখানে সকলে স্বেচ্ছায় স্বীয় সম্পদ সর্বজনের কল্যাণে নিয়োজিত করুক, ইহাই তাঁহার আদর্শ। আজ যদি সমাজের অব্যবস্থার ফলে উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় নানাবিধ উপকরণ কাহারও ব্যক্তিগত অধিকারে থাকে, এমন কি কাহারও যদি বিশেষ কোনও বিদ্যা থাকে, বা শিল্পে বা সমাজের লোকপরিচালনায় ব্যক্তিগত দক্ষতা থাকে, তবে প্রত্যেকে সেই গুণ বা ক্ষমতাকে সকলের প্রয়োজনে ব্যবহার করুক, ইহাই গান্ধীজী চান। প্রত্যেকের মনে করা উচিত, 'আমার যে সম্পদ আছে, তাহা ঘটনাচক্রে আমার নিকট উপনিধির মত সংগৃহীত হইয়াছে, ইহার আসল মালিক সমাজ, কেননা, বহুজনের ও দীর্ঘদিনের চেষ্টার ফলেই ইহা বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে, আমার ব্যক্তিগত দান সে তুলনায় যৎসামান্য। সে দানও আমি সমাজের আশ্রয়ে বাঁচিয়া না থাকিলে করিতে অসমর্থ হইতাম। অতএব বিদ্যাই হউক, দক্ষতাই হউক, অর্থসম্পদই হউক, সমাজের নিজস্ব কোন না কোন সম্পত্তি আমার নিকটে শুধু গচ্ছিত আছে। সেটিকে জনসাধারণের প্রয়োজনে সর্বোত্তমভাবে ব্যবহার করিবার জন্য আমি দায়ী।' এই বোধের জাগরণই উপনিধিবাদের মর্মকথা। অতএব গান্ধীজীর আদর্শমত অহিংস সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইলে তাঁহার উপনিধিবাদের অবসান না ঘটিয়া বরং তাহা পূর্ণতর ও স্পষ্টতররূপে দেখা দিবে।

কিন্তু তবু প্রশ্ন থাকিয়া যায়, সঞ্চিত অর্থ বা উৎপাদনের উপকরণাদির উপরে ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্ব অবস্থাবিশেষে লোপ করায় যখন গান্ধীজীর

সম্মতি আছে, তখন স্বেচ্ছাধীন উপনিধিবাদের কি আর কিছু অবশিষ্ট থাকে? ক্রমে ক্রমে তো সকল ব্যক্তিগত সম্পত্তি সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত হইবে।

ব্যক্তিগতভাবে গান্ধীজী সন্তানের দায়াধিকারে বিশ্বাস করেন না। পুত্রপৌত্রাদিক্রমে অর্থসম্পত্তি ভোগের ব্যবস্থার ফলে সমাজ দুই দিক দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়: যে সম্পদ আসলে সমাজের সম্পত্তি তাহা হইতে সমাজ বঞ্চিত হয়, উপরন্তু বাল্যকাল হইতে ভোগের মধ্যে লালিতপালিত হওয়ার ফলে ধনিসন্তানের মধ্যে যদি বিশেষ কোন গুণ বর্তমান থাকে তাহাও চর্চার অভাবে বিকাশ পায় না, অতএব সেই সম্পদ হইতেও সমাজ বঞ্চিত হয়।

তাহা সত্ত্বেও মানবপ্রকৃতির বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করিয়া গান্ধীজী বলেন, 'যদি কোন লোক যথার্থই উপনিধিবাদ স্বীকার করে, এবং সমাজকে সেই নিধির প্রকৃত মালিক বলিয়া মানে, তবে আমি তাহার পরিচালনাধীনে ধনসম্পদ ছাড়িয়া রাখিতে প্রস্তুত আছি। এমন কি তাহাকে বলিব, পুত্রকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার পর তাহার কার্যকলাপ দেখিয়া তোমার যদি মনে হয়, সেও সমাজের কল্যাণে সেই ধন ব্যবহার করিবে, তবে তাহারই জিম্মায় ধনসম্পদ রাখিয়া যাইও। অন্যথা অর্থসম্পত্তি সাধারণ-ভাণ্ডারে পরিণত করিও।' অর্থাৎ, সমাজে যদি জাগ্রত জনশক্তি বর্তমান থাকে, তবে তাহার ছায়াতলে ভোগের নিমিত্ত ব্যক্তিবিশেষকে উপযুক্ত উত্তরাধিকারী নিয়োগ করিবার অধিকার পর্যন্ত দিতে গান্ধীজী স্বীকৃত আছেন। এই অধিকারও কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইনের অধীন হইবে বলিয়া তিনি সম্প্রতি মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু মানুষ সে অধিকার না চাহিয়া একান্তভাবে নিজের সকল গুণ এবং ক্ষমতা সমাজের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করুক, পুত্রকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া তাহাকে

সমগ্রের কল্যাণার্থে নিবেদন করুক, ব্যক্তিগত সম্পত্তি মিটিয়া যাক, ইহাই হইল গান্ধীজীর অপ্রতিগ্রহের চরম আদর্শ।

সাম্যবাদিগণও অপ্রতিগ্রহের আদর্শই প্রতিষ্ঠা করিতে চান। কেবল তাঁহাদের পথ স্বতন্ত্র। মানুষের বা ব্যক্তিবিশেষের উপর দায়িত্ব না রাখিয়া প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থান্তরের দ্বারা তাঁহারা সকলের কল্যাণের পরিবেশ সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করেন। তবে তাঁহারা যে ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করেন, এরূপ মনে করিবার হেতু নাই, কেবল মানুষের উপরে তাঁহাদের ভরসা কম।

মানুষ এবং প্রতিষ্ঠান, উভয়ের উপরে বিশ্বাস কমবেশি মাত্রায় গান্ধীজী এবং সাম্যবাদীদের মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু পরস্পরের মধ্যে সেই মাত্রার তারতম্য এত অধিক যে, সাম্যবাদ হইতে গান্ধীজীর অহিংস মতবাদকে প্রায় একটি পৃথক মত বলিয়া বর্ণনা করা যায়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হইল, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কংগ্রেসের তত্ত্বাবধানে ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটির মারফত ভারতের আর্থিক জীবনের যে পরিকল্পনা দিয়াছেন, তাহা কি গান্ধীপ্রদর্শিত গঠনকর্ম অপেক্ষা উন্নত, সময়োপযোগী স্বাধীন ভারতের পক্ষে উপযুক্ত ব্যবস্থা নহে? আমরা কি সংস্কারের বশেই ভবিষ্যতের জন্যও বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থাকে বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেছি না?

পণ্ডিত জওহরলাল ভারতবর্ষে আর্থিক পুনর্গঠনের জন্য যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের আয়ত্তাধীনে বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের সহিত দেশের বেকার-সমস্যাকে সর্বতোভাবে দূর করিবার জন্য কুটিরশিল্পেরও যথেষ্ট স্থান আছে। কিন্তু সে ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় যন্ত্রশিল্পের স্থান মুখ্য এবং কুটিরশিল্পের স্থান গৌণ। কুটিরশিল্প বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের পরিপূরকের স্থান লাভ করিয়াছে, তাহার স্বাতন্ত্র্য নাই বলিলেই চলে। পণ্ডিতজীর

বিশ্বাস, এবং বহু খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকও বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে, যদি বর্তমান জগতে ভারতবর্ষকে অপর স্বাধীন দেশের সঙ্গে সমান তালে চলিতে হয়, যদি এদেশে ভোগের মাত্রা যথেষ্ট উন্নত করিতে হয়, সর্বোপরি বর্তমানকালের সমরকৌশল আয়ত্ত করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হয়, তবে স্বাধীন ভারতে যথেষ্ট কেন্দ্রীকরণ অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িবে।

গান্ধীজী কিন্তু এই পদ্ধতিতে আদৌ আস্থাবান নহেন। সে ক্ষেত্রে জনসমূহের অধিকার হইতে আর্থিক জীবন ও তাহা রক্ষা করিবার ক্ষমতা অল্পসংখ্যক লোকের হাতে চলিয়া যাইবে বলিয়া তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস। এ অবস্থাকে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা বলা যাইতে পারে, কিন্তু তিনি ইহাকে জনসাধারণের স্বরাজের আখ্যা দিতে অস্বীকার করিবেন। তাঁহার পরিকল্পিত স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামগুলি স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবে সুপরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিলেও আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ভারকেন্দ্র বিকেন্দ্রীকরণ ও সত্যাগ্রহ-কৌশলের কল্যাণে নীচের দিকেই প্রতিষ্ঠিত থাকিবে।

শহরে কলের জল সরবরাহের জন্য যেমন প্রথমে এক স্থানে সমস্ত জল সংগ্রহ করিয়া তাহার পর প্রতি গৃহস্থের বাড়ী পর্যন্ত সেই জল কলের সাহায্যে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়, পণ্ডিতজীর পরিকল্পনা সেই প্রকারের। কিন্তু যদি মানুষের জীবনকে প্রকৃতির সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে সংযুক্ত রাখিয়া শহরের অস্বাভাবিক ঘনবসতি হইতে মুক্ত করিয়া নূতন ধরণের সুস্থ গ্রাম রচনা করা যায়, গান্ধীজীর পরিকল্পনা তাহার মত হইবে। সেখানে প্রতি গৃহস্থের বাড়ীতে কূপ, অথবা হয়তো পল্লীতে পল্লীতে জলাশয়ের ব্যবস্থা থাকিবে। জলের ব্যাপারে মানুষ স্বাবলম্বী হইবে। কিন্তু জল তো আবদ্ধ হওয়ার ফলে দূষিতও হইতে পারে। সেই সঙ্কীর্ণতাপ্রসূত দোষ দূর করার জন্য নিকটে নদী থাকিলে, এক

গ্রামের লোক অপর গ্রামের লোকের সহিত সহযোগিতা করিবে, এক দেশের লোক অপর দেশের লোকের সহিত প্রয়োজনানুসারে সংঘবদ্ধ হইবে, এবং নদীর জলকে নিয়ন্ত্রিত, শাসিত অথবা খালের পথে পরিচালিত করিয়া মাঠের উর্বরাশক্তি বাড়াইবার চেষ্টা করিবে, পুষ্করিণীকে নূতন বর্ষার জলে ভরিয়া মাছে পূর্ণ করিবার, গ্রামকে পরিচ্ছন্ন করিবার চেষ্টা করিবে। এইরূপ সমবেত সংঘশক্তির দ্বারা মানুষ জীবনের মানকে ও ভোগের মাত্রাকে আবশ্যকমত উন্নততর ও পূর্ণতর করিবার চেষ্টা করিবে।

পণ্ডিতজী এবং গান্ধীজীর পরিকল্পনার মধ্যে, জল সরবরাহের জন্য যে দুই ব্যবস্থার বর্ণনা করা হইল, তাহার মধ্যে যে প্রভেদ আছে, সেইরূপ প্রভেদ বর্তমান। একটিতে শক্তির ভারকেন্দ্র রাষ্ট্রের মধ্যে ন্যস্ত, অপরটিতে প্রয়োজনানুসারে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিলেও সর্ববিধ শক্তির ভারকেন্দ্র সমাজের নীচের দিকেই প্রতিষ্ঠিত রাখার চেষ্টা হয়। উভয় পরিকল্পনার মধ্যে প্রভেদ এত বেশি যে উহাদিগকে ভিন্নধর্মী বলিয়া স্বীকার করাই ভাল।

ইহার মধ্যে কোন্‌টি অপেক্ষাকৃত ভাল কোন্‌টি মন্দ তাহা বিচার করিবার অভিপ্রায় আমার নাই। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ যদি স্পষ্ট হইয়া থাকে, তবেই আমি নিজের শ্রমকে সার্থক বলিয়া বিবেচনা করিব।